# সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন ২০১২

সেমিনার বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com

# সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন
# ২০১২

সম্পাদনায়

ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া

সেমিনার বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com

# সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন
# ২০১২

**প্রকাশনায়**
সেমিনার বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, ফ্যাক্স : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেলস্ এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com
ই-মেইল : info@bicdhaka.com

**প্রকাশকাল**
জানুয়ারি ২০১৩

**কপিরাইট**
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

**প্রচ্ছদ**
গোলাম মাওলা

**মুদ্রণ**
আলফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭

**বিনিময়**
দুইশত টাকা মাত্র

www.pathagar.com

# সূচীপত্র

**পরাশক্তি আমেরিকার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবক্ষয়**
ড. আহসান হাবীব ইমরোজ ॥ ৭

**বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় সন্ত্রাস**
ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ॥ ২৫

**ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষানীতি**
মোহাম্মদ ইমতিয়াজ উদ্দীন চৌধুরী ॥ ৬৯

**বাংলাদেশে সংবাদপত্র ও সাংবাদিক দলন**
ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ॥ ১১৮

**বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ : জন্ম, বিকাশ ও পরিণতি**
শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির ॥ ১৬৬

**ভারতে সংখ্যালঘু দাঙ্গা ঃ একটি বিশ্লেষণ**
মোঃ নূরুল আমিন ॥ ২৫৩

**পরিশিষ্ট**
সেমিনার প্রতিবেদন
ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া ॥ ২৮১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# পরাশক্তি আমেরিকার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবক্ষয়

ড. আহসান হাবীব ইমরোজ

## ১. ভূমিকা

বিশ্ব আজ একক পরাশক্তি আমেরিকার কঠিন জিঞ্জিরে বাঁধা। গত শতাব্দীর শেষ পাদে স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর ভাবা হয়েছিল, হয়তো একটি শান্তিময় নতুন শতাব্দীর সূচনা হবে। একটি স্বর্ণোজ্জ্বল সংস্কৃতির আবহ ও নতুন সভ্যতার ভিত বিনির্মাণ হবে। কিন্তু সে আশায় গুড়েবালি, আমেরিকার নেতৃত্বে শুরু হয়েছে নতুন শতাব্দীর নতুন যুদ্ধ 'ওয়ার অন টেরর'। বাহ্যতঃ আমেরিকা এবং তার সঙ্গীদের সফল মনে হলেও যালিমের যুল্‌ম ও ভুল-ত্রুটি এবং মাযলুমের হাহাকার ও ক্ষোভ স্থায়ীভাবে তাদেরও সফল হতে দেবে না। অত্যাচারের প্রতিফল প্রতিটি যালিমকে ভোগ করতেই হয়; হোক তা নিজের উপর, পরিবার বা মানবতার উপর যুল্‌ম। এই শ্বাশত সত্যকে সামনে নিয়েই আমেরিকার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবক্ষয় নিয়ে একটি বিশ্লেষণ প্রদত্ত হলো ঃ



www.pathagar.com

## ২. সাম্রাজ্যবাদের সূচনা ঃ আমেরিকার উদ্ভব

গবেষক সিরাজুল ইসলাম খানের ভাষায় ঃ

"খৃস্টপূর্ব ৫৪ সনে জুলিয়াস সীজার যখন ব্রিটেন জয় করেন, তখন ব্রিটেনবাসীরা গুহায় থাকে, মাছ ও পশু শিকার করে, মাছ মাংস পুড়িয়ে খায়। তার তিন হাজার বছর আগ থেকে সুসজ্জিত...নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছে। কিন্তু আধুনিক যুগে ব্রিটেন হয়ে দাঁড়ায় বিশ্বের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশ।"[১] অপরদিকে "১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে কলম্বাসের আমেরিকা আবিস্কারের পর ইউরোপ থেকে লোকজন সেখানে খুব কম যেতো। পালের জাহাজে মহাসাগর পাড়ি দেয়া ছিল খুবই কষ্টসাধ্য। যারা গিয়েছে তারা ছিল বাপ অজানা, মায়ে খেদানো, রাস্তাঘাটে বসবাসকারী হতদরিদ্র চরিত্রহীনজন। আজকের আমেরিকা তাদের এবং তাদেরই বংশধরদের তৈরি।"[২]

## ৩. একক পরাশক্তির শঙ্কা

মিথ্যা ভিত্তির উপর কখনও প্রাসাদ গড়া যায় না, এটি যে কোন মুহূর্তে বালির বাঁধের মতোই ভেঙ্গে যায়। তাই এর রচয়িতা থাকে সদা শঙ্কিত, অস্থির। একক পরাশক্তি আমেরিকারও সেই অবস্থা, তৎকালিন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট তুরগুত উজাল প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাকের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে তুরস্কের সামরিক ঘাঁটি ব্যবহারের সপক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে বলেছিলেন, "আমেরিকা অন্তত: আরো দশ বছর পরাশক্তি হিসাবে থাকবে, অতএব তার পক্ষে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।" অর্থাৎ দশ বছর পর যে পরাশক্তি হিসেবে আমেরিকার মৃত্যু ঘটবে প্রকারন্তরে এ সত্যটিই তিনি ফাঁস করে দিয়েছিলেন।[৩] মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ১৯৯৩ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণে বলেন ঃ "আমরা যদি এখনই পদক্ষেপ না নিই তো এখন থেকে দশ বছর পর এ দেশকে খুঁজে পাব না।"[৪] সুলাইমান (আ)-এর নির্দেশে জিনরা বাইতুল মাকদিসের নির্মাণের কাজে নিয়োজিত ছিল। লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি ইন্তিকাল করেন। ঘুনে পোকা খেয়ে অনেক পরে লাঠিকে অন্তঃসারশূন্য করে ফেললে তিনি পড়ে যান। নৈতিকভাবে ঠিক এমনটি না হলেও অভ্যন্তরীণ ভাবে আমেরিকা আজ অন্তঃসারশূন্য কিন্তু তার না পড়া পর্যন্ত সবাই তার গোলামী করেই যাচ্ছে।

---

১. দৈনিক নয়াদিগন্ত, ঢাকা, ২৬ জুন, ২০০৫
২. প্রাগুক্ত
৩. নূর হোসেন মজিদী, পতনের দ্বারপ্রান্তে আমেরিকা, কনফিডেন্ট পাবলিকেশন্স (প্রাঃ) লিঃ, ঢাকা, ২০০০, পৃ-১২
৪. দ্য মরনিং সান, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩



www.pathagar.com

## ৪. শক্তির উৎস

ডিজরাইলি প্রাচ্যে, পাশ্চাত্যের কার্যক্রম সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'পুব হলো উন্নতির এক পেশা।'[৫] বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ দেশসমূহ যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা ভীষণ ভাবে প্রভাবিত। এমনকি তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা না করে আমেরিকার নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। আর আমেরিকা এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন কৌশলে তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করছে। আঙ্কেল স্যামের চালে আরব দেশগুলো মূল্যবান তেল খুবই কমদামে আমেরিকার হাতে তুলে দিচ্ছে। অপরদিকে আরবরা দেশের শিল্পায়ন এবং সামরিক মজবুতির দিকে দৃষ্টি দেয়নি। বরং আমেরিকার প্ররোচনায় পেট্রোডলারে ভোগ্যপণ্য ক্রয় করেছে এবং বাকী অর্থ পশ্চিমা ব্যাঙ্ক, প্রধানতঃ আমেরিকান ব্যাঙ্কেই জমা রেখেছে।

আমেরিকা প্রথমবার ইরাককে ধ্বংস করার খরচের সিংহভাগই সৌদিআরব ও কুয়েতের নিকট থেকে আদায় করেছে। এরপর অস্ত্র বিক্রি করেও আমেরিকা এসব আতঙ্কিত দেশের নিকট থেকে বিপুল পেট্রোডলার হাতিয়ে নিয়েছে। তবে ইসরাইলের মুকাবিলায় সক্ষম কোন অস্ত্র দেয়নি। এমনকি মোটা অঙ্কের বেতন দিয়ে মার্কিন সামরিক উপদেষ্টাদের এবং পারস্য উপসাগরে, কুয়েতে ও সৌদি আরবে মোতায়েনকৃত আমেরিকান সৈন্যদের যাবতীয় ব্যয় তাদেরকে বহন করতে হচ্ছে।[৬]

আরব অর্থনৈতিক ঐক্য কাউন্সিল ১৯৯২ সালে বিদেশে আরবদের বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ ৭৫ হাজার থেকে ৮০ হাজার কোটি ডলার বলে অনুমান করে।[৭] ১৯৯১ সালের হিসাব অনুযায়ী আরবদের বিদেশে বিনিয়োগকৃত অর্থের মাত্র ১৬ শতাংশ বিশেষ করে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায় বিনিয়োগ করা হয়েছে।[৮] অর্থাৎ বাকী ৮৪ শতাংশই পাশ্চাত্যে, বিশেষ করে আমেরিকায় বিনিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু ১৯৯২ সালের প্রথম ৮ মাসে ডলারের মূল্যপতনজনিত কারণে আরবরা সাড়ে ছয় হাজার কোটি ডলারের উর্ধ্বে লোকসানের সম্মুখীন হয়।[৯]

## ৫. ধোকাবাজির নেতৃত্ব ও সিন্দাবাদের ভুত

সোভিয়েত বিলুপ্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের কারণ দুটি। প্রথমতঃ সিআইএ দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসূচির মাধ্যমে সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে স্বীয় এজেন্ট সৃষ্টি ও তাদেরকে

---

৫. এডওয়ার্ড ডব্লিউ. সাঈদ, অরিয়েন্টালিজম, অনুবাদ-ফয়েজ আলম, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৫, পৃ-২৩
৬. নূর হোসেন মজিদী, পৃ-১৪
৭. ডেইলি স্টার, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩
৮. দৈনিক ইনকিলাব, ২৪ জুলাই, ১৯৯২
৯. ডেইলি স্টার, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩


www.pathagar.com

দলের শীর্ষপদে উন্নীত করতে সক্ষম হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিনকে সিআইএ শীর্ষপদে উপনীত করতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয়ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিমা মিত্ররা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে প্রচারযুদ্ধ চালিয়েছিল। ভয়েস অব আমেরিকা ইংরেজীসহ ৪৬ টি ভাষায় এবং 'রেডিও লিবার্টি' ও 'রেডিও ফ্রি ইউরোপ' পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে লক্ষ্য করে ২০টির অধিক ভাষায় নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচার করেছে। প্রসিডেন্ট রিগ্যান শুধু ভয়েস অব আমেরিকার আধুনিকায়নের জন্যই ১৫০ কোটি ডলার ব্যয় করেন।[১০] তবে টাইম ম্যাগাজিন এ অঙ্ককে লক্ষ লক্ষ কোটি ডলার বলে উল্লেখ করেছে। আমেরিকা এরই পাশাপাশি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিতে ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত ৫ লাখ ৮০ হাজার কোটি ডলার ব্যয় করেছে।[১১]

এ প্রেক্ষাপটেই প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি তেল সমৃদ্ধ দেশের উপর চাপ সৃষ্টি করে তেলের মূল্য হ্রাস করিয়ে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনীতির ওপর প্রভাব খাটিয়ে ডলারের বিনিময় হার বৃদ্ধি করে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নিতে সক্ষম হন।[১২]

মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী উইলিয়াম কোহেন বলেছেন ঃ "২০১৫ সালে পর আমেরিকা বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি হিসাবে স্বীয় ক্ষমতা ও মর্যাদা হারাতে পারে।"[১৩] আমেরিকা পরের ধনে পোদ্দারী করে চলেছে। অন্যের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে তৃতীয় পক্ষকে ঋণ দিয়ে মহাজনী কারবার করছে। আমেরিকার অর্থনীতিকে সচল রাখছে জাপান, জার্মানী এবং মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ দেশসমূহের অর্থ। এ অর্থই আবার ঋণদানে ব্যবহৃত হয়। নতুন শতাব্দীতে হয়তো জাপান ও জার্মানী আমেরিকাকে আর আগের মত ঋণ দেবে না। হয়ত মধ্যপ্রাচ্যের রাজা-বাদশাহ-শেখদের দিবানিদ্রাও টুটে যাবে।

### ৬. বিদায়ের দ্বারপ্রান্তে আমেরিকান শতাব্দী

জার্মানীর পত্রিকা 'ডের স্পিগেল'-এর ১৯৯১ এর এক সংখ্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত একটি কভার স্টোরির শিরোনাম ছিল- 'বিদায়ের দ্বারপ্রান্তে আমেরিকান শতাব্দী'। বিশ্বের পুলিশী শক্তি আমেরিকা নিজেকে একটি নিরাপত্তা কোম্পানী হিসেবে বিক্রি করার চেষ্টা চালাচ্ছে। অধিকাংশ আমেরিকান কী চায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে রিগ্যান ইতিহাসের ব্যয়বহুল ও সর্বাধিক শক্তিশালী সমরযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এরই

---

১০. প্রাগুক্ত, ২১ অকটোবর, ১৯৯২
১১. দৈনিক ইনকিলাব, ৩ জুলাই, ১৯৯৮
১২. নূর হোসেন মজিদী, পৃ-১৯
১৩. দৈনিক ইনকিলাব, ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮



www.pathagar.com

পাশাপাশি তিনি কর ও বৈদেশিক পুঁজি হ্রাস করে সীমাহীন ভোগের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করেন।[১৪]

১৯৮৯ সালে আমেরিকানরা বিদেশে ৩৭ হাজার ৪৪০ কোটি ডলার পুঁজি বিনিয়োগ করে, কিন্তু ঐ সময় বিদেশীরা আমেরিকায় ৪০ হাজার ৮০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করে। বর্তমানে জাপানী গাড়ী 'হন্ডা একোর্ড' হচ্ছে আমেরিকায় সর্বাধিক জনপ্রিয় গাড়ী। আমেরিকানরা আয়ের শতকরা ৬ ভাগেরও কম সঞ্চয় করে থাকে; এটি জাপানীদের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ এবং জার্মানদের তুলনায় অর্ধেকেরও কম। অন্যদিকে তারা স্বীয় উৎপাদনের তুলনায় ৩% থেকে ৪% বেশি ভোগ ব্যবহার করে থাকে।[১৫]

ইহুদী তোষণনীতি আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির একটি স্থায়ী দিক যেটি ক্লিনটন লিখেছেন, এর থেকেই আঁচ করা সম্ভব, যা লেখা হয় না সে সকল কাহিনী। তার ধর্মউপদেষ্টা বললেন, "বিল! আমার মনে হয়, তুমি একদিন প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছো। আমি মনে করি তুমি খুব ভাল করবে। সর্বোপরি মনে রাখবে, তুমি যদি ইসরাইলের পাশে না দাঁড়াও তাহলে ঈশ্বর কখনো ক্ষমা করবেন না। তার বিশ্বাস ঈশ্বর চান ইহুদীরা পবিত্র ভূমিতে থাকবে।"[১৬]

আমেরিকার সাদার্ন মেথোডিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী রবি বত্র বলেন- "লোকেরা মনে করে, পুঁজিবাদ অপরাজেয়, কিন্তু তারা কম্যুনিজম সম্পর্কেও একই কথা বলত।"[১৭]

## ৭. সামাজিক সংকট

(আমেরিকা তথা) পশ্চিমা সমাজকে রূপকথার মায়াবিনীর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। তার রূপের জৌলুস আছে, আছে তীব্র আকর্ষণ কিন্তু অন্তরে অমৃত নেই, আছে গরল। তার ক্ষমতা অনেক, কিন্তু একটু সুখ, একটু শান্তি, একটু নিরাপত্তা দিতে কতই না অক্ষম সে।[১৮]

নিউইয়র্ক আমেরিকার আয়না হিসেবে গণ্য। কিন্তু এ নিউইয়র্কেই প্রতি ১০০ জনে একজন লোক গৃহহীন, প্রতি ৩০০ জনের একজন এইডস রোগে আক্রান্ত এবং প্রতি

১৪. নূর হোসেন মজিদী, পৃ-৩১
১৫. প্রাগুক্ত, প-৩৩
১৬. বিল ক্লিনটন, মাই লাইফ, আলফ্রেড এ নফ, অনুঃ শাহীন রেজা নুর, ডঃ নুরুল হক ও অন্যান্য, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪, পৃ-৩১২
১৭. নূর হোসেন মজিদী,পৃ.২৯
১৮. অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান, সেমিনার স্মারক-গ্রন্থ ২০০৭, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, পৃ-৬



www.pathagar.com

সাড়ে চার ঘন্টায় একজন লোক নিহত হয়। এছাড়া প্রতি ছয় মিনিটে একটি করে চুরি হয় এবং প্রতি চার মিনিটে একটি করে গাড়ী উধাও হয়ে যায়।[১৯]

পাশ্চাত্যের এই সংকট সম্পর্কে ১৯৩৮ সালে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিখ্যাত 'রাউন্ড টেবিল' পত্রিকার সম্পাদক লর্ড লোথিয়ান বলেন, "আজকের অধিকাংশ পাশ্চাত্যবাসী শিশুসুলভ ক্ষিপ্রতা, বৈচিত্র বিলাস ও ইন্দ্রিয় সুখের নেশায় বিভোর। অনাড়ম্বর জীবন যাপনের সামর্থ তাদের থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মের পেশকৃত আদিম, অসীম ও অনন্ত সত্যের সঙ্গে তাদের কোনই সংযোগ নেই।"[২০]

আমেরিকায় প্রায় ১৫ লক্ষ মিলিয়নার রয়েছেন। ১৯৮৯ সালে শিল্পপরিচালকদের গড় আয় শ্রমিকদের গড় আয়ের ৯৩ গুণ দাঁড়ায়। সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, কানাডা ও জাপানের মাথাপিছু আয় আমেরিকার তুলনায় বেশি।[২১]

আমেরিকানরা বছরে ৬০ হাজার কোটি ডলার স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় করে। এতদসত্ত্বেও, পার্শ্ববর্তী কিউবাসহ উন্নতদেশসমূহের তুলনায় তার জনগণ খুব কমই স্বাস্থ্যসেবা লাভ করে থাকে। শিশুমৃত্যু, দীর্ঘায়ু এবং ডাক্তারের নিকট গমনের মানদন্ডে জাতিসমূহের স্বাস্থ্যতালিকায় শিল্পোন্নত দেশসমূহের মধ্যে তার অবস্থান হচ্ছে সর্বনিম্নে। সর্বশেষ জরীপে স্বাস্থ্যগত দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ১৩ নম্বরে।[২২]

## ৮. চার কোটি দরিদ্র তিন কোটি ক্ষুধার্ত

স্বয়ং মার্কিন তথ্যসংস্থা ইউসিস পরিবেশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৯৩ সালে আমেরিকায় দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৭০ লাখ এবং এর মধ্যে ক্ষুধার্ত জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৩ কোটি। ওয়াশিংটনের "ব্রেড ফর দ্য ওয়ার্ল্ড ইনস্টিটিউট" এর চতুর্থ বার্ষিক রিপোর্টে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। এতে আরও বলা হয় যে, ১৯৯৫ সালের পর আমেরিকায় ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে।[২৩] সংখ্যালঘুদের অবস্থা আরো শোচনীয়, কৃষ্ণাঙ্গদের শতকরা ৩০ ভাগ এবং হিস্পানিকদের শতকরা ২৬ ভাগ দারিদ্র্যসীমার নিচে জীবনযাপন করে। সেখানে ৪

---

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪
২০. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪, পৃ-৫৬
২১. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৫
২২. নূর হোসেন মজিদী, পৃ-৩৬
২৩. দৈনিক দিনকাল, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩



www.pathagar.com

লাখ মানুষের কোন আশ্রয় নেই। তারা রেলস্টেশনে, পার্কে, রাস্তা বা দোকানের পাশে রাত কাটায়।[২৪] শুধু নিউইয়র্ক শহরে এ ধরনের ১ লাখ গৃহহীন রয়েছে। এখানে কর্তৃপক্ষ পথেঘাটে ভিক্ষা নিষিদ্ধ করেছিল। কিন্তু মার্কিন ফেডারেল কোর্টের এক বিচারক গৃহহীনদের পক্ষে রায় প্রদান করে তাদের ভিক্ষা করার অধিকারকে বৈধতা প্রদান করেন।[২৫]

এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে গৃহহীনদের সংখ্যা ১৯৯২ সালে ছিল ৩০ লাখ এবং ২০০৭ সাল নাগাদ গৃহহীনদের সংখ্যা এক কোটি ৯০ লাখ দাঁড়াতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে।[২৬] টাইম ম্যাগাজিন প্রতিবেদক ট্যালবোট বলেন ঃ "কার্ল মার্কস অনেক ভুল করে ছিলেন, কিন্তু একটি ব্যাপারে তাঁর ধারণা ঠিক ছিল তা হচ্ছে অর্থনীতি থেকেই রাজনীতির জন্ম হয়।"[২৭] বস্তুতঃ আমেরিকা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের জন্য যে লক্ষ লক্ষ কোটি ডলার ব্যয় করেছে তা-ই মার্কিন জনগণের শতকরা ৪০ ভাগের অবস্থার ক্রমাবনতি এবং ৪ কোটি দরিদ্র, ৩ কোটি ক্ষুধার্ত, ৩০ লাখ নিরাশ্রয় ও লাখ লাখ আমেরিকানের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের জন্য দায়ী।

## ৯. দেশ যখন জনগণের দুশমন

১৯৯২ সালের নির্বাচনে বিল ক্লিনটন নির্ধারিত কোটার চেয়ে ৯৯% এবং জর্জ বুশ ৩৭% বেশি ব্যয় করেন। নিউইয়র্ক টাইমস পরিচালিত এক জনমত জরীপের রিপোর্ট অনুযায়ী ৭৯% জবাবদাতার মতে, কয়েকটি বড় কায়েমী স্বার্থ অধিকারী কর্তৃক সরকার পরিচালিত হয়ে থাকে।[২৮] প্রেসিডেন্ট কেনেডী একটি মাফিয়া চক্রের নিকট থেকে নির্বাচনী চাঁদা নিয়েছিলেন। পরে গোয়েন্দারা তাদের পিছু নিলে তারা কেনেডিকে হত্যা করে। এছাড়া কেনেডির নারীঘটিত কেলেঙ্কারীকে ব্লাকমেইল করে জনসন ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মনোনীত হন এবং কেনেডি নিহত হবার পর প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন।[২৯]

প্রেসিডেন্ট কেনেডি বলেছিলেন ঃ "আপনারা জিজ্ঞেস করবেন না আপনাদের দেশ আপনাদের জন্য কি খিদমাত আঞ্জাম দিতে সক্ষম। বরং জিজ্ঞেস করুন, আপনারা

২৪. দৈনিক সংগ্রাম, ২৫ অকটোবর, ১৯৯৮
২৫. প্রাগুক্ত, ৪ অকটোবর, ১৯৯২
২৬. দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ নভেম্বর, ১৯৯২
২৭. টাইম ম্যাগাজিন, ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৯১
২৮. নিউজউইক, ২৮ অগাস্ট, ১৯৯৫
২৯. দৈনিক ইনকিলাব, ২১ নভেম্বর, ১৯৯৭



www.pathagar.com

দেশের জন্য কি খিদমাত আঞ্জাম দিতে সক্ষম?" টিভি-ভাষ্যকার চ্যান্সেলর বলেনঃ "রোনাল্ড রিগ্যান কেনেডির কথাটিকে খুব ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছেন। ফলে এক পরাশক্তি হিসাবে দেশ এখন জনগণের দুশমনে পরিণত হয়েছে।"[৩০]

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, আমেরিকান নেতৃত্ব সর্বদাই সামাজিক সংকট, অর্থনৈতিক সংকট বা ব্যক্তিগত স্ক্যান্ডাল মুকাবিলায় জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে এ প্রসঙ্গে নোয়াম চমস্কি বলেন, "আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক অস্থিরতা শুরু হলে উইলসনের 'লালভীতি' দেখিয়ে তা অল্পসময়ের জন্য হলেও দমানো যায়।"[৩১]

## ১০. শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গন

গত ২৫ বছরের একটি চিত্র পাই ১৯৮৩-র একটি স্মৃতি থেকে। "এডুকেশন সংক্রান্ত জাতীয় কমিশন 'এ নেশন অ্যাট রিস্ক' শিরোনামে হতবুদ্ধিকর একটি রিপোর্ট ইস্যু করে ৯টি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পরীক্ষায় আমেরিকা কখনো ১ম বা ২য় হতে পারেনি এবং সর্বশেষ অবস্থানে থেকেছে ৭ বার।"[৩২]

আমেরিকার সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপারে 'জাতীয় শিক্ষা উন্নয়ন কমিশন' হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছে : "কোন বিদেশী ও দুশমন শক্তি যদি আজকে আমেরকিায় যে নিকৃষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা বিরাজমান করছে অনুরূপ কোন শিক্ষাব্যবস্থা আমেরিকার ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করত, তাহলে আমরা সে পদক্ষেপকে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল বলে গণ্য করতাম।"[৩৩]

১৯৮৯ সালে জাতীয় ভূগোল সমিতি লক্ষ্য করে যে, ২ কোটি ৪০ লাখ বয়স্ক লোক বিশ্বের মানচিত্রে আমেরিকার অবস্থান খুঁজে বের করতে সক্ষম নয়। আমেরিকার কলেজ-ছাত্রদের ১৬% জানে না আব্রাহাম লিঙ্কন কখন নিহত হন। মাত্র ২৫% জানে তার সময় কেন গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। মজার বিষয় হচ্ছে, ১০০ ভাগ শিক্ষিত হওয়ার পরও, ১৬% মনে করে ফুসফুস হচ্ছে পরিপাক যন্ত্র। ২৫% মনে করে সূর্য হচ্ছে একটি গ্রহ।[৩৪]

শুধু ১৯৮৬ সালেই আমেরিকার স্কুলসমূহে ৩ লাখ ৬০ হাজার সহিংস ঘটনা সংঘটিত হয়। ঐ বছর স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে ৭০ হাজার অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়।[৩৫]

---

৩০. নূর হোসেন মজিদী, পৃ-৪৩
৩১. নোয়াম চমস্কি, মিশেল ফুকো ও অন্যান্য, জ্যোতির্ময়কাল, সম্পাদনা- ফজলুল আলম, সংবেদ প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০৮, পৃ-৫৯
৩২. বিল ক্লিনটন, পৃ-২৮৫
৩৩. নূর হোসেন মজিদী, পৃ-৩৭
৩৪. হুমায়ুন আহমেদ, মে ফ্লাওয়ার, নিউ শিখা প্রকাশনী, ঢাকা ২০০০, পৃ-৪২
৩৫. নূর হোসেন মজিদী, পৃ-৪০



www.pathagar.com

২০০৫ সাল নাগাদ আমেরিকায় ১০ বছরের কমবয়স্ক ঘাতকশিশুর সংখ্যা ১০ হাজারে দাঁড়াতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে।[৩৬] বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে মেটাল ডিটেক্টর যন্ত্র বসানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও শতকরা ২১ ভাগ ছাত্রছাত্রী অস্ত্রসহ ক্লাসে আসে।[৩৭] সর্বশেষ গত বিশ্বভালবাসা দিবসে আমেরিকার নর্দান ইলিনয় ইউনিভার্সিটিতে ৬ এবং ভার্জিনিয়া টেক ইউনিভার্সিটিতে ৩৩ জন শিক্ষক ও ছাত্র সেখানকার ছাত্রদেরই গুলিবর্ষণে নিহত হয়।

## ১১. অপরাধিদের স্বর্গরাজ্য

সাম্রাজ্যবাদী পূর্বপুরুষদের মতো অস্ত্রপ্রীতি সকল শিল্পোন্নত দেশের মধ্যে অপরাধের মাত্রা সর্বোচ্চ হবার অন্যতম কারণ। ১৯৮৯ সালে আমেরিকায় ২১ হাজার ২৫ ব্যক্তি, ১৯৯০ সালে এফ বি আই-র রিপোর্ট অনুযায়ী ২৩ হাজার ২০০ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। ধর্ষণ, প্রহার, আহতকরণ ও চুরি জাতীয় অপরাধের সংখ্যা ছিল ২০ লাখ। ঐ বছর প্রথম ১১ মাসে শুধু নিউইয়র্কে ২ হাজার লোক নিহত হয়। ১৯৯৩ সালে অপরাধের মাত্রা দারুনভাবে বৃদ্ধি পায়। ঐ বছর ৪ কোটি ৪০ লক্ষ অপরাধ সংঘঠিত হয়।[৩৮] ঐ বছর শুধু আগ্নেয়াস্ত্রে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৩৯ হাজার ৩৯৫ জন।[৩৯] বিগত পনের বছরে যত আমেরিকান নাগরিক আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা নিহত হয়েছে, তাদের সংখ্যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত আমেরিকান সৈন্যদের মোট সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি।[৪০]

## ১২. সর্বোচ্চ পর্যায়ে নৈতিক অবক্ষয়

আমেরিকার বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট কেনেডি অভিনেত্রী মেরিলিন মনরোসহ অনেকের সাথেই অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। জনসনের বিরুদ্ধেও যৌন কেলেঙ্কারীর অভিযোগ ছিল।[৪১] জর্জ বুশের এক যৌন কেলেঙ্কারী ফাঁস হয়ে গেছে। ১৯৮৪ সালে ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকাকালে জেনেভায় এক সম্মেলনে যোগদান করতে গিয়ে তিনি জোনিফার নামে এক মহিলার সাথে রাত কাটান।[৪২] প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন আরকানসাসের গভর্ণর থাকাকালে রীতিমত দালালের মাধ্যমে নারী সংগ্রহ করতেন।[৪৩] আর মনিকার বিষয়টি তো তার ভিতকেই কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

---

৩৬. দৈনিক মুলমুজাদ্দেদ, ৯ জানুয়ারি, ১৯৯৬
৩৭. দৈনিক মিল্লাত, ১৭ অকটোবর, ১৯৯৩
৩৮. দৈনিক ইনকিলাব, ১ জানুয়ারি, ১৯৯৪
৩৯. প্রাগুক্ত, ১৯ এপ্রিল, ১৯৯৮
৪০. নূর হোসেন মজিদী,পৃ-৪০
৪১. দৈনিক ইনকিলাব, ২১ নভেম্বর, ১৯৯৭
৪২. প্রাগুক্ত, ১৩ অগাস্ট, ১৯৯২
৪৩. দৈনিক মিল্লাত, ২২ ডিসেম্বর, ১৯৯৩



www.pathagar.com

২০০০ সালের আদমশুমারী বিশ্লেষণে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে সমকামী লোকের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি।[৪৪] ওয়াশিংটন পোস্ট-এর রিপোর্টে বলা হয়, রোমান ক্যাথলিক খৃস্টান সন্ন্যাসীদের ৫০% ই সমকামী। শুধু তাই নয়, এরা তাদের সমকামিতাকে বৈধ ঘোষণার জন্য গীর্জার নিকট দাবী জানিয়েছে।[৪৫]

## ১৩. যৌন অনাচার, গর্ভপাত আর জারজদের মিছিল

শয়তান যখন অপকর্মের প্রাথমিক নীল নকশা তৈরি করে তখন তার প্রথম পরীক্ষাগার হিসেবে আমেরিকাকেই বেছে নেয়।[৪৬] আমেরিকার কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের শতকরা ৮২ ভাগই ২০ বছর বয়স হবার পূর্বে যৌন অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং মাত্র ১৮ ভাগ কৌমার্য রক্ষা করে।[৪৭] লাগামহীন ভোগ আর সন্তানের যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে "যুক্তরাষ্ট্রে বছরে প্রায় ১৬ লাখ গর্ভপাত ঘটানো হয়।"[৪৮] অবশ্য সবাই গর্ভপাত করে না। ১৯৯২ সালে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়স্কা মায়েরা ৩ লাখ ১১ হাজার শিশুর জন্ম দেয়। সরকারী হিসাবে এদের মধ্যে ৬৫% ছিল অবিবাহিতা মায়েদের সন্তান। আর সব মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর মোট যত শিশু জন্ম নেয় তার মধ্যে শতকরা ৩১ ভাগই জারজ সন্তান।[৪৯] কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে মাত্র ২৭টিতে ব্যভিচার আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ, অপর ২৩টিতে তা অপরাধরূপে গণ্য হয় না।[৫০] ফলে "আমেরিকায় প্রতি ৪৬ সেকেন্ডে একজন মহিলা ধর্ষিতা হন। (National Victim Centrer-1992) সে হিসেবে প্রতি ঘন্টায় ৭৮ এবং বছরে ৬,৮৩,২৮০ জন নারী এই জঘন্য নির্যাতনের শিকার হন।"[৫১]

## ১৪. পরিবার প্রথা হুমকির মুখে

যুক্তরাষ্ট্রের বিবাহিতা নারীদের ৪০% এবং বিবাহিত পুরুষদের ৬৫% ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে।[৫২] যৌনতা পশ্চিমাবিশ্ব (বিশেষকরে আমেরিকা)-কে এতটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে, নিতান্ত ইতর প্রাণীর মত রক্তসম্পর্কের অতি আপনজনের সাথে

৪৪. অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ-৮
৪৫. নূর হোসেন মজিদী, পৃ-৪৭
৪৬. মুনির উদ্দীন আহমদ, বিয়ে নিয়ে ইয়ে, প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ-৩৫
৪৭. ডেইলি স্টার, ৮ জুন, ১৯৯৪
৪৮. দ্য টেলিগ্রাফ, ঢাকা, ২৭ নভেম্বর, ১৯৯২
৪৯. নিউজউইক, ৮ জানুয়ারি, ১৯৯৬
৫০. প্রাগুক্ত
৫১. শিব খেরা, তুমিও জিতবে, ম্যাকমিলন ইন্ডিয়া লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৩, পৃ-২৮,২৯
৫২. ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন, ৫ জানুয়ারি, ১৯৯৬



www.pathagar.com

দৈহিক সম্পর্কও আজ বিরল কোন ঘটনা নয়।[৫৩] পিতা কর্তৃক কন্যা সন্তানের ওপর যৌন নিপীড়ন চালানোর ন্যায় জঘন্য ঘটনাও ঘটে থাকে।[৫৪]
প্রতি ১০০ বিবাহের মধ্যে ৫৫ টি ভেঙ্গে যাচ্ছে।[৫৫] পিতা-মাতার বিবাহ বিচ্ছেদ এবং পিতা কর্তৃক অবৈধ সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ না করার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ২৩. ৯% শিশু শুধু পিতা বা মাতার কাছে প্রধানতঃ মাতার কাছেই বড় হয়।[৫৬] কিন্তু সবচেয়ে মর্মান্তিক হচ্ছে, যারা পিতা-মাতা উভয় কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়, ১৯৯১ সালে এরূপ ২২ হাজার শিশু জন্মের পরই হাসপাতালগুলোতে পরিত্যক্ত হয়।[৫৭]
কিন্তু যারা পরিবারের সাথে থাকছে তাদের কপালও কম মন্দ নয়। মার্কিন বিচার মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যাণ অনুযায়ী ১৯৮৯ সালে আমেরিকায় ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অপরাধ সংঘটিত হয় ৩ কোটি ৫৮ লক্ষ।[৫৮] এদেশে গর্ভবতী মহিলাদের ২৫% কে তাদের স্বামীরা মারধোর করে। রাটগার্টস বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের প্রফেসর একটা হাতুড়ী দিয়ে পিটিয়ে তার স্ত্রীকে মেরে ফেলেছে।[৫৯] পিতা-মাতা কর্তৃক ১২ বছর বয়স্ক সন্তানকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে না খেতে দিয়ে হত্যা[৬০] এবং মাতা কর্তৃক নিজ সন্তানদের পুড়িয়ে হত্যা করার[৬১] ন্যায় লোহমর্ষক ঘটনাও ঘটছে। শতকরা ৮৩ ভাগ আমেরিকান মনে করে বাচ্চাদের একটি শক্ত মার দিয়ে মাঝে মাঝে শাসন করা উচিত।[৬২] ৩১ বছরের এক মেয়ে, বাবার সাথে থাকে। কি নিয়ে ঝগড়া। বাবা তাকে খুন করে কেটে কুটে রান্না করে ফেলল। পুলিশ যখন তাকে ধরল তখন রান্না করা মেয়েকে খেয়ে প্রায় শেষ করে এনেছে।[৬৩] কিন্তু ইসলামে সন্তানকে পিতামাতার জন্য শ্রেষ্ঠ নিয়ামাত এবং পিতামাতাকে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা দেখাতে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا.

"আমরা লোকদেরকে তাদের পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি।"[৬৪]

---

৫৩. অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ-৮
৫৪. ডেইলি স্টার, ১ অকটোবর, ১৯৯৩
৫৫. নিউজউইক, ১২ জুন, ১৯৯৫
৫৬. প্রাগুক্ত
৫৭. দৈনিক দিনকাল, ১১ নভেম্বর, ১৯৯৩
৫৮. দৈনিক ইনকিলাব, ১ নভেম্বর, ১৯৯৪
৫৯. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, আমেরিকা, পার্ল পাবলিকেন্স, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ-২৩,৩৬
৬০. দৈনিক ইনকিলাব, ১৩ অগাস্ট, ১৯৯২
৬১. দৈনিক মিল্লাত, ৬ অকটোবর, ১৯৯৩
৬২. হুমায়ুন আহমেদ, পৃ-৪২
৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ-৪৮
৬৪. সূরা আল আনকাবুত, আয়াত : ৮



www.pathagar.com

## ১৫. মহামারী এইডসের আগ্রাসন

নতুন সহস্রাব্দের অভিশাপ, "এইডসে আক্রান্ত হয়েছে এরূপ লোকদের মধ্য থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯২ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে এক লাখ ৭১ হাজার ৮৯০ জন প্রাণ হারায়।"[৬৫] অনাগত শিশুরাও বাদ যাচ্ছে না, "১৯৯১ সালের শুরুতে আমেরিকায় সন্তান ধারণক্ষম ৮০ হাজার নারী এইডস রোগের ভাইরাস বহন করছিল।"[৬৬] উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে? সেখানেও সমস্যা "আমেরিকায় ৭ হাজার চিকিৎসকও এইডসের ভাইরাসধারী বলে ওয়াশিংটন পোস্ট-এর রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।"[৬৭]

## ১৬. মারাত্মক মাদকাসক্তি

সর্বত্রই শুধু হতাশার দাবানল। তাই "সেখানে ১৮ বছরের কমবয়সী তরুণ-তরুণীদের শতকরা ২৫ ভাগ মাদকাসক্ত।"[৬৮] এমনকি "আমেরিকায় প্রতি বছর ৩ লাখ ৫৭ হাজার শিশু নেশাগ্রস্ত মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করার ফলে দুনিয়ায় আগমনের সময় থেকেই তারা জন্মসূত্রে নেশাগ্রস্ত হয়ে থাকে।" আইনেও ভূত! "আমেরিকার আইনজীবীদের প্রতি পাঁচ জনের একজনই মাদকদ্রব্যে আসক্ত, অনেক বিচারকও তাই।"[৬৯]

## ১৭. দেশটিই যেন কারাগার

পুলিশ কঠোরতায় পক্ষপাতি নয়। তা সত্ত্বেও ১৯৮৯ সালে মার্কিন পুলিশ ৭৩ লাখ লোককে গ্রেফতার করে। ৩৭ লক্ষ আমেরিকান অর্থাৎ দেশের প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার প্রায় ২% স্থায়ী ভাবেই হয় কারাগারে, নয়ত পুলিশ হিফাযাতে রয়েছে।[৭০] ১৯৯৩ সালে গ্রেফতারকৃতদের ২৩% ই ছিল অপ্রাপ্তবয়স্ক। আর এখানেও বর্ণবাদী ভূত। ১৯৮৯ সালের পরিসংখ্যাণ অনুযায়ী আমেরিকার ২০ থেকে ২৯ বছর বয়স্ক কৃষ্ণাঙ্গদের ২৩% অর্থাৎ ৬,০৯,৬৯০ জন ছিল কারাগারে যেখানে শেতাঙ্গরা মাত্র ৬.২%।[৭১]

## ১৮. বর্ণবৈষম্যের বর্বরতা

"সেদিন আমেরিকায় কালোদের জন্য না ছিল কোন নাগরিক অধিকার আইন, না কোন ভোটাধিকার আইন বা কৃষ্ণাঙ্গদের যেকোন স্থানে বসবাসের অধিকার আইন। ...কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার জন্য নির্বাচন কর ধার্য করা

৬৫. ডেইলি স্টার, ১১ এপ্রিল, ১৯৯৩
৬৬. নূর হোসেন মজিদী, পৃ-৪৯
৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ-৪৯
৬৮. দৈনিক ইনকিলাব, ৫ জানুয়ারি, ২০০০
৬৯. নূর হোসেন মজিদী, পৃ-৫০
৭০. প্রাগুক্ত, পৃ-৪০
৭১. প্রাগুক্ত, পৃ-৫৫



www.pathagar.com

হয়েছিল। রাস্তাঘাটে কৃষ্ণাঙ্গদের 'নিগার' বলে গালি দেওয়া ছিল অতি সাধারণ ব্যাপার।"[৭২] "মিসিসিপি বদ্বীপের একটি রেস্ট হাউসের দরজায় তখনো 'হোয়াইট' ও 'কালারড' শব্দ লাগানো ছিলো।"[৭৩]

১৯৯২ এর পরিসংখ্যাণ, আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদের গড় আয়ু ৬৫, অথচ শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের ৭২ বছর। কৃষ্ণাঙ্গদের শিশু মৃত্যুর হার শ্বেতাঙ্গদের দ্বিগুণ।[৭৪] হত্যাকাণ্ডের শিকারের মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গদের সংখ্যা শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় ছয় থেকে সাত গুণ। আর কৃষ্ণাঙ্গ তরুণদের মধ্যে মৃত্যুর প্রধান কারণ হচ্ছে এটিই।[৭৫] মেরিলিন টমাস কর্তৃক লিখিত 'লাইফ অন ডেথ রো' গ্রন্থে বলা হয়েছে। "নিঃসন্দেহে এদের মধ্যে সংখ্যালঘু হলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তি নির্দোষ, কিন্তু প্রাদেশিক ও বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থার শিকার।"[৭৬]

ক্লিভ স্ট্যাফোর্ড নামক জনৈক আইনজীবী উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় মার্কিন বিচার ব্যবস্থার কড়া সমালোচনা করে বলেন, "দরিদ্র হওয়ার মানে হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড প্রদানকারীর সাথে সাক্ষাতের এক চমৎকার সুযোগ।" "আদর্শ শাস্তি মানে হচ্ছে যাদের পুঁজি নেই তারাই এ শাস্তি লাভ করে।"[৭৭]

## ১৯. আত্মহত্যার প্রবণতা

বার্ট্রান্ড রাসেল পাশ্চাত্যের করুণ পরিণতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন "সুদূর অতীতের বন্য গোষ্ঠীগুলির পক্ষে সেই নিষ্ঠুরতা আর কু-সংস্কার হয়তো স্বাভাবিকই ছিল, কিন্তু আজকের যুগে তা ধ্বংস করে দেবে আমাদের যাবতীয় সুখকে, তারপর, খুব সম্ভবত যাবতীয় জীবনকেও।"[৭৮]

ভোগবাদ ও উচ্ছৃঙ্খলতার চূড়ান্ত পরিণতি সুখকর নয়। এর পরিণতি জীবন সম্পর্কে হতাশা। তাই আত্মহত্যার হার স্বাভাবিক মৃত্যুর হারকেও ছাড়িয়ে গেছে। ১৯৯৫ সালে আমেরিকায় স্বাভাবিক মৃত্যু বরণকারীদের সংখ্যা ছিল ২২ হাজার ৫৫২ জন সেখানে আত্মহত্যাকারীদের সংখ্যা ছিল ৩১ হাজার ২৮৪ জন।[৭৯] ১৯৯৫ সালে শুধু

---

৭২. প্রাগুক্ত, পৃ-৮৪
৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ-১০৫
৭৪. নূর হোসেন মজিদী, পৃ-৫৪
৭৫. প্রাগুক্ত, প-৫৫
৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ-৫৬
৭৭. প্রাগুক্ত
৭৮. বার্ট্রান্ড রাসেল, মানুষের কি কোন ভবিষৎ আছে?, অনু. শামীম আহমদ, শব্দগুচ্ছ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ-৯৪
৭৯. দৈনিক বাংলাবাজার, ২৩ অকটোবর, ১৯৯৮



www.pathagar.com

ওয়াশিংটনেই ৪১৪ ব্যক্তি আত্মহত্যা করে।[৮০] যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন ৮৬ জন লোক আত্মহত্যা করে, আরো ২ হাজার অর্থাৎ বছরে ৭ লাখ ৩০ হাজার ব্যক্তি আত্মহত্যার চেষ্টা করে। এর কারণ মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস এবং নিজেদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে সন্দেহ প্রবণতায় বৃদ্ধি পাচ্ছে হতাশা। কয়েক বছর পূর্বে জনৈক গবেষক আরামে আত্মহত্যা করার এক যন্ত্র আবিস্কার করে মার্কিন রেডিও টিভি ও পত্রপত্রিকার প্রশংসা লাভ করেন। বলা হয়, এ আবিস্কার হাজার হাজার আমেরিকানের অন্তরে আরামে আত্মহত্যার ব্যাপারে আশার সৃষ্টি করেছে।[৮১]

## ২০. সংখ্যালঘুদের শক্তি বৃদ্ধি

২০০০ খৃস্টাব্দে আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ ও অশ্বেতাঙ্গ জনসংখ্যা যথাক্রমে ২১ কোটি ১৩ লাখ এবং ৮ কোটি ২৬ লাখ অর্থাৎ শতকরা ৭১ দশমিক ৯ ভাগ ও ২৮ দশমিক ১ ভাগ আর ২০১০ সালে দাঁড়ায় যথাক্রমে ২২ কোটি ৩৭ লাখ এবং ১১ কোটি ৫ লাখ অর্থাৎ শতকরা ৬৬.৯৩% ও ৩৩.০৭%। এ হিসাবে ২০৫০ সালে শ্বেতাঙ্গ ও অশ্বেতাঙ্গদের অনুপাত দাঁড়াবে যথাক্রমে ৪৪ ও ৫৬ অর্থাৎ ২০৪৫ সাল নাগাদ অশ্বেতাঙ্গরা শতকরা ৫০ এর কোঠা পেরিয়ে যাবে।

১৯৯৪ সালের পরিসংখ্যাণ অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে কার্ডধারী বৈধ বিদেশীর সংখ্যা ছিল এক কোটি। এদের মধ্যে ৬৫ লাখই যুক্তরাষ্ট্রে কমপক্ষে পাঁচ বছর বসবাস করার কারণে নাগরিকত্ব লাভের উপযুক্ততা অর্জন করে।

যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূল উৎস হচ্ছে বৈধ ও অবৈধ অভিবাসীর আগমন। ১৯৯৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ৮ লাখ ২০ হাজার অভিবাসী আগমন করে। ১৯৯২ এর শেষে যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল ৭৬ লাখ। মুসলিমদের মধ্যে জন্মহার বেশি তেমনি অভিবাসীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মুসলিম। সেই সাথে নব দীক্ষিতদের সংখ্যাও ব্যাপক।[৮২] সকল উপাদানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনার পর ২০২০ সালে শ্বেতাঙ্গরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।[৮৩]

নিউ মেক্সিকো ও ক্যালিফোর্নিয়ায় অশ্বেতাঙ্গরা সংখ্যাগুরুতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। আমেরিকার ইতিহাসে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রাদেশিক গভর্ণর হিসেবে ডগলাস ওয়াইল্ডার ভার্জিনিয়ার গভর্ণর নির্বাচিত হন। ১৯৮৯ সালে হিস্পানিক লরো ক্যাভাজোস আমেরিকার শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং তিনিই হচ্ছেন প্রথম হিস্পানিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

---

৮০. দৈনিক ইনকিলাব, ৩ জানুয়ারি, ১৯৯৬
৮১. নূর হোসেন মজিদী, পৃ-৫০
৮২. দৈনিক ইনকিলাব, ১৫মার্চ, ১৯৯৩
৮৩. নূর হোসেন মজিদী, পৃ-৬২



www.pathagar.com

অন্যদিকে জেনারেল কলিন পাওয়েল মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ জয়েন্ট স্টাফ প্রধান মনোনীত হন। সর্বশেষ বারাক ওবামা প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। নেশন অব ইসলামের নেতা লুই ফারাহ খানের আহ্বানে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে ১০ লাখ কৃষ্ণাঙ্গ লোকের মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বলেন "মার্কিন সরকার কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে দারিদ্র ও মাদকদ্রব্যের বিস্তার ঘটানোর জন্য এক গোপন নীতি বাস্তবায়ন করে চলেছে। তিনি আরো বলেন ঃ শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যাশক্তি হ্রাস পাবার কারণে মার্কিন সরকার কৃষ্ণাঙ্গদের নিশ্চিহ্ন করার পথ খুঁজছে।"[৮৪]

## ২১. নেতৃত্বের অবসান

**১৯৯১ সালে আমেরিকার একজন বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানীর মন্তব্য হচ্ছে ঃ**

"কেন যে অনেকে আমাদের অনুসরণ করে? কূটনীতি আর অর্থনীতি ছাড়া আমাদের কোনো নীতিই নেই। নেই পারিবারিক বা সামাজিক শান্তি। নেই কোন নীতি, নৈতিকতা, আমরা বাইরের দুনিয়ার অনেককে বর্বর বলি, সন্ত্রাসি বলি, আসলে ধর্ষণ আর নারী নির্যাতনই আমাদের প্রকৃত অবস্থা। আমাদের সমাজকে যারা অনুসরণ করবে তারাই বিপদগামী হবে।"[৮৫]

জাপানের ওকিনাওয়া দ্বীপের জনগণ মার্কিন সামরিক ঘাটি রাখার বিরুদ্ধে গণভোটে রায় দিয়েছে। সৌদী আরবে মার্কিন সামরিক অবস্থানে একাধিক বার আত্মঘাতী বোমা হামলা হয়েছে। লেবানন থেকে তো মার্কিন নৌসেনারা পাততাড়ি গুটাতে বাধ্য হয়েছিল।[৮৬]

সবচেয়ে বড় কথা, মার্কিন জনগণের অনেকেই যুদ্ধবাজ আমেরিকাকে পছন্দ করে না। এর পরেও যদি আমেরিকা অস্ত্রশক্তি বলে অন্যান্য দেশের ওপর তার আধিপত্য চাপিয়ে রাখার চেষ্টা করে, তা হবে আত্মঘাতি। কারণ এখন ভারত ও পাকিস্তানসহ বহুদেশের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে। অন্যদিকে মার্কিন গোয়েন্দাদের তথ্যানুযায়ী অচিরেই ইরান ও উত্তর কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলোতে ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত হানতে সক্ষম হবে। এমতাবস্থায় পারমাণবিক অস্ত্রের পাল্টা ব্যবহার হলে শহরকেন্দ্রিক যুক্তরাষ্ট্র সহজেই ধ্বংস হয়ে যাবে ... কিন্তু তার প্রতিপক্ষের গ্রামাঞ্চলে কোটি কোটি লোক বেঁচে থাকবে।[৮৭]

---

৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ-৬৫
৮৫. সৈয়দ আলী আহসান, আমেরিকা ঃ আমার কিছু কথা, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, চট্টগ্রাম, ২০০২, পৃ-৮
৮৬. বাংলাদেশ অবজারভার, ৮ এপ্রিল, ১৯৯৪
৮৭. নূর হোসেন মজিদী, পৃ-৬৯



www.pathagar.com

আমেরিকা বিশ্বের সবচেয়ে বড় ঋণী দেশ। বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় মার্কিন পণ্য মার খাচ্ছে। জার্মানী থেকে ১ লাখ ৭৬ হাজার সৈন্য প্রত্যাহার করার কথা। আমেরিকা জার্মানী ও জাপান থেকে স্বীয় সৈন্য পিছু বার্ষিক ৪০ হাজার ডলার হারে অর্থ আদায় করে। তাই সৈন্য প্রত্যাহারের ফলে মার্কিন সরকারের মোটা অঙ্কের আয় হ্রাস ছাড়াও এরা সহ মোট সাত লাখ সৈন্যকে সশস্ত্র বাহিনী থেকে ছাঁটাই করার ফলে বেকার সমস্যাও তীব্রতর হওয়াই স্বাভাবিক। যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘকে তার দেয় চাঁদা পরিশোধেও সক্ষম নয়, বরং তারই সবচেয়ে বেশি বাকী পড়েছে। আরেকটি লজ্জাজনক ব্যাপার হচ্ছে আমেরিকা সফরে ইচ্ছুক বিদেশীদের নিকট থেকে গলকাটা হারে অফেরতযোগ্য ভিসা ফি নেয়া হচ্ছে। আমেরিকার অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রকৃত চিত্র এর চেয়েও ভয়াবহ। এ শুধু সাড়ে ৮১ হাজার কোটি ডলার[৮৮] বৈদেশিক ঋণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং মার্কিন অর্থনীতি জাপানীদের দখলে চলে যাচ্ছে। তাই প্রশ্ন উঠেছে : আমেরিকা কি জাপানের অর্থনৈতিক উপনিবেশে পরিণত হতে যাচ্ছে ?[৮৯]

সার্বিক কারণেই আমেরিকা নৈতিক ও চারিত্রিক দিক থেকে নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমেরিকার মুখে ছিল অবাধ অর্থনীতি তথা পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের মুখরোচক শ্লোগান। কিন্তু পুঁজিবাদ মানে শোষণ, গণতন্ত্র মানে পুঁজিপতিদের পরোক্ষ শাসন এবং মানবাধিকার মানে পাশ্চাত্যের অবৈধ অধিকার-এ সত্য শুধু বিশ্ববাসী নয়, বরং আজ আমেরিকানদের নিকটও ধরা পড়ে গেছে। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কারণ এবং সোভিয়েত জুজুর ভয়ে আমেরিকার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এখন জাতীয় মর্যাদার চিন্তা পশ্চিম ইউরোপ, বিশেষতঃ জার্মানীর মধ্যে দিন দিন তীব্রতর হচ্ছে। অন্যদিকে ইরানকে পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে সহযোগিতা দান থেকে বিরত থাকার মার্কিন আহ্বানেও রাশিয়া, চীন ও ভারত সাড়া দেয়নি। 'টাইম' সাময়িকীর এক রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রতি ১০ জন আমেরিকানের মধ্যে ৮ জনই মনে করে যে, আমেরিকা ভুল পথে অগ্রসর হচ্ছে। বলা বাহুল্য যে, ১০ জনের মধ্যে বাকী ২ জন হচ্ছে অস্ত্রশিল্প-মালিক, অস্ত্রব্যবসায়ী, শোষক পুঁজিপতি, যায়নবাদী ইহুদীচক্র এবং সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্বার্থান্বেষীর দল। উক্ত রিপোর্ট থেকে সুস্পষ্ট প্রতিভাত যে, শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানরাও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদিতা ও নেতৃত্বলিপ্সার বিরোধী। বাকী বিশ্ব যেন তার এই নেতৃত্ব অস্বীকার না করে তাই

---

৮৮. এশিয়াউইক, ২১ অগাস্ট, ১৯৯৮
৮৯. ইকো অব ইসলাম, ডিসেম্বর, ১৯৯৪



www.pathagar.com

ইউসিসের এক নিবন্ধে বলা হয়ঃ স্নায়ু যুদ্ধের পর আমেরিকাকে বিশ্বের আর্থ-রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে বাদ দেয়া ঠিক হবে না।"[৯০] এদিকে এশিয়ায় মার্কিন প্রভাব ও আধিপত্য খর্ব করার লক্ষ্যে ইরানের প্রচেষ্টায় ইরান, রাশিয়া, চীন ও ভারতের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি আমেরিকার বিশ্বনেতৃত্বকে কার্যতঃ একটি কাগুজে দাবী ও বাগাড়ম্বর হিসাবে প্রতিপন্ন করেছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে একটি বিষয় প্রায় সর্বজনস্বীকৃত সত্য। তা হচ্ছে একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব হবে অনেকগুলো আঞ্চলিক নেতৃত্বের বিশ্ব এবং তার মূল ভিত্তি হবে অর্থনৈতিক। বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় বিশ্বে যেসব সম্ভাব্য নেতৃত্ব চোখে পড়ে তা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, রাশিয়া, চীন, ভারত, জাপান ও ইরান।

## ২২. উপসংহার

পাশ্চাত্যের কোলে জন্ম নেয়া এবং বড় হওয়া মুহাম্মাদ আসাদ বলেন "পশ্চিমা সভ্যতার বস্তবাদী আত্মতৃপ্তি পশ্চিমা জগৎকে এমন ভয়ঙ্কর পর্যায়ে নিয়ে যাবে, যে এর জনসাধারণ আবারো আধ্যাত্মিকতার সত্য খুঁজতে শুরু করবে এবং তখন হয়তো ইসলামের সফল প্রচার সম্ভব হতে পারে।"[৯১] টমাস ম্যালথাসের ভ্রান্ত তত্ত্ব এবং সেই সাথে ভোগবাদী সংস্কৃতির পরিণতিতে পাশ্চাত্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার জনসংখ্যার ব্যবধান দ্রুত বৃদ্ধি পায়। আর স্বাভাবিক নিয়মেই প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে জনসংখ্যা স্থানান্তর চলতে থাকে। বর্তমানে আমেরিকার মোট অধিবাসীদের শতকরা দশ জনই অভিবাসী।[৯২] বহিরাগতদের এ ধারা তাদের স্বার্থেই ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে। এভাবে যুক্তরাষ্ট্র হয়তোবা তার সবচেয়ে উন্নত এবং ধনী দেশের মর্যাদা কিছুটা হলেও ধরে রাখতে চাইবে। অপরদিকে শ্বেতাঙ্গদের বাঁধভাঙ্গা অনৈতিক জীবন, পরিবারহীনতা, মাদকাসক্তি, এইডস, আত্মহত্যার মাধ্যমে হয়তো তারা রেডইন্ডিয়ান, কৃষ্ণাঙ্গ কৃতদাস তথা বিশ্বব্যাপি মানবতার বিরুদ্ধে করা তাদের যুল্মের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করবে। অথবা বিবেকের তাড়নায় নৈতিক আদর্শ ইসলাম কবুল করবে। কিন্তু এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা বিন্যাসে যে পরিবর্তনের ধারা সূচিত হবে তাতে যুক্তরাষ্ট্র আর যুক্ত থাকবে

---

৯০. দৈনিক মিল্লাত, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩
৯১. মুরাদ উইলফ্রেড হফম্যান, ইসলাম ২০০০ , অনু. মোঃ এনামুল হক, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, চট্টগ্রাম, ২০০২, পৃ-১২
৯২. ডেইলি ইনডিপেনডেন্ট, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯



www.pathagar.com

না, অথবা থাকলেও এই যুক্তরাষ্ট্র থাকবে না, তা হবে এক ভিন্ন ধরনের যুক্তরাষ্ট্র। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে এরশাদ করেছেন,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ. إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ.الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. فَأَكْثَرُوا فِيْهَا الْفَسَادَ. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ.

"তুমি কি দেখনি তোমার রব সুউচ্চ স্তম্ভের আধকারী আদে-ইরামের সাথে কি আচরণ করেছেন, যাদের মতো কোন জাতি দুনিয়ার কোন দেশে সৃষ্টি করা হয়নি? আর সামুদের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ্ নির্মাণ করেছিল? আর কীলকধারী ফিরাউনের সাথে? এরা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বড়ই সীমালংঘন করেছিল। অবশেষে তোমার রব তাদের ওপর আযাবের কশাঘাত করলেন। আসলে তোমার রব ওঁৎ পেতে আছেন।"[৯৩]

---

**লেখক পরিচিতি :** ড. আহসান হাবীব ইমরোজ, চেয়ারম্যান, গ্লোবাল লাইটহাউস ফাউন্ডেশন।
**লেখা পরিচিতি :** প্রবন্ধটি ৩০ জুন, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার আয়োজিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসাবে পঠিত হয়।

---

৯৩. সূরা আল ফজর, আয়াত : ৬-১৪



www.pathagar.com

# বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় সন্ত্রাস

ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

## ১.১ ভূমিকা ঃ

ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতিমান কবি ও নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়র (১৫৬৪-১৬১৬) তাঁর Measure for measure নাটকের একটি অঙ্কে লিখেছেন, 'একটি দৈত্যের শক্তি অর্জন অতি উত্তম বটে। কিন্তু দানবের মত তার প্রয়োগ সত্যিই এক বিরাট অত্যাচার' (O, it is excellent to have a giant's strength, but it is tyrannous to use it like a giant')[১]। ভারত দক্ষিণ এশিয়ার বড় শক্তি। জনসংখ্যা ও ভৌগলিক আয়তনে ভারত একটি বিশাল দেশ। আর এই সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের মুখোশ পরিহিত সামরিক শক্তিবেত্ত এখন রীতিমত সম্ভ্রমের পাত্র। ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগী শক্তি।[২] এর নাকি রয়েছে দৈত্যের মত শক্তি।

---

১. উদ্ধৃত ড. এমাজউদ্দিন আহমদ, আঞ্চলিক সহযোগিতা জাতীয় নিরাপত্তা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, এশিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৮৮।

২. মহিউদ্দিন আহমদ, এশিয়ার স্নায়ুযুদ্ধ, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৮ জুন ২০১২, পৃ.-৬। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের স্বার্থ এক, তাহলো-চীনের ক্রমবর্ধমান উত্থানকে ঠেকানো এবং চীনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এজন্য ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগী শক্তি।



www.pathagar.com

ভারতের রয়েছে পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম সেনাবাহিনী, ষষ্ঠ বৃহত্তম নৌবাহিনী ও অষ্টম বৃহত্তম বিমান বাহিনী। ভারত পারমাণবিক শক্তির অধিকারী। সাধারণ এবং পারমাণবিক অস্ত্রের এমন সম্ভার হয়ত ভারতের অস্ত্রাগারে রয়েছে- যা দিয়ে ইচ্ছা করলে ক্ষুদ্র প্রতিবেশীদেরকে বার কয়েক ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ার যে কোন স্থানে নির্ধারিত টার্গেট বিদ্ধ করতে তারা সক্ষম। ধ্বংসাত্মক নানা শর এখন তাদের তূনে। কিন্তু শক্তিশালী হলেই কি সে শক্তির প্রয়োগ ঘটাতে হবে যখন তখন? দানবের মত? জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান, আইন-কানুন লঙ্ঘন করে। একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে অন্য সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিকদের সীমান্তে পাখির মত গুলি করে হত্যা করে? প্রাকৃতিক অনিবার্যতা ও ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশ ভারতের অনিবার্য প্রতিবেশী। বলা যায় এটা নিয়তি নির্ধারিত ব্যবস্থাপনা।[৩]

আসলে সর্বদা সৎ ও নিরীহ প্রতিবেশীকে উত্যক্ত করে এক ধরনের জান্তব আনন্দ পাওয়া ভারতের একটি নেশায় পরিণত হয়েছে। আর এই নেশার অনুমান হচ্ছে বাংলাদেশ। ভারতের চোখে-মুখে শুধু আধিপত্যবাদের নগ্ন পরাক্রম ছাড়া বাংলাদেশ যাত্রা লগ্ন থেকে অন্য আর কিছু দেখতে পায়নি।

পৃথিবীর মানচিত্রে ভারত নামক বৃহৎ দেশটি আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে তিন দিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে। ভারত বাংলাদেশের একটি বড় প্রতিবেশি দেশ। একদিকে শুধু বাংলাদেশের সাথে মায়ানমারের সীমান্ত,[৪] ধরনীর সীমারেখায় বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন দেশের অভ্যুত্থান হয়েছে সেও চার দশক পূর্ণ হয়েছে। তবে এই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করতে আমাদের ত্রিশ লাখ[৫] শহীদের আত্মদান আর দুই লাখ মা

৩. আজিজুল হক বান্না, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক এবং আমাদের অস্তিত্বের সংগ্রাম, সেমিনার স্মারক গ্রন্থ ২০০৮, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, নভেম্বর ২০০৮, পৃ-৪৪।

৪. মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত মাত্র ১৭৬ মাইল।

৫. বিবিসি খ্যাত সাংবাদিক সিরাজুর রহমান এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, কতলোক মারা গেছে মুক্তিযুদ্ধে? আমি তাঁকে (শেখ মুজিবুর রহমান) বলেছিলাম, হতাহতের কোন হিসাব কেউ রাখেনি, রাখা সম্ভবও ছিল না। তবে বিশ্ব মিডিয়ায় প্রকাশিত খবর এবং বিভিন্ন জনের বাচনিক বিবরণ থেকে মনে হয় লাখ তিনেক লোক মারা গেছে, আমরা মিডিয়াকে সর্বশেষ সে হিসেবই দিয়েছি। অন্য কোন মহল থেকে তিনি ভিন্ন হিসেব পেয়েছিলেন? নাকি মানসিক ক্লান্তি, আবেগের আতিশয্য ইত্যাদি কারণে 'লাখে' আর 'মিলিয়নে' তিনি তালগোল পাকিয়ে ফেলেছিলেন! কারণ যাই হোক পরে ডেভিড ফ্রস্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন যে মুক্তিযুদ্ধে তিন



www.pathagar.com

বোনের ইজ্জত লুটিয়ে দিতে হয়েছে। সে কারণেই বিশ্বের দরবারে এ জাতি আত্মমর্যাদাশীল, দেশপ্রেমিক ও বীরের জাতি বলে গৌরব অর্জন করেছে। কিন্তু বাংলাদেশ সৃষ্টির লগ্ন হতেই ভারতের সাথে আমাদের রয়েছে অমীমাংসিত কিছু রাষ্ট্রীয় সমস্যা। যার কল্যাণকর ও সুষ্ঠু সমাধান আজও হয়নি। এমনই একটি দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা হল সীমান্তবর্তী এলাকায় বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশের সামরিক/বেসামরিক মানুষকে অকারণে, অকাতরে নির্যাতন করা এবং গুলি চালিয়ে হত্যা করা। মানবতা পরিপন্থী ওই ক্রিয়ার মাত্রাটি ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ভারতীয় সীমান্তে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বর্বরতা সব সীমা-পরিসীমা ছাড়িয়ে গেছে। নিছক তুচ্ছ ঘটনার কারণেও নিরীহ গ্রামবাসী তাদের নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতার হাত থেকে রক্ষা পায় না। শান্তির সীমান্ত প্রতিষ্ঠার সব প্রত্যাশা গুঁড়িয়ে দিয়ে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর বর্বরতায় দু'দেশের সীমানা হচ্ছে রক্তাক্ত। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত এখন এক রক্তাক্ত প্রান্তর।[৬]

## ১.২ বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কেমন? ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের কয়েকটি দিক সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন ড. মাহবুব উল্লাহ। এগুলো হচ্ছে : 'ভারতের বহুদিনের পরিকল্পনাটা কি? পরিকল্পনাটি হল, ভারতের ১৯৪৭ সালের পূর্ব মানচিত্রে ফিরে যাওয়া। এগুলো নেহেরু ডকট্রিন, ইন্দিরা ডকট্রিন ও গুজরাল ডকট্রিনেরই কথা। ভারত তার বহুদিনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ক্রমাগতভাবে কোশেশ করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় বিদ্রোহের মদদ দিচ্ছে, স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলনে উৎসাহ যুগিয়েছে, ভারত বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত ৫৪টি আন্তর্জাতিক অভিন্ন নদী থেকে পানি প্রত্যাহারের আয়োজন করে, ছিটমহলের জটিলতা অব্যাহত রেখে, উভয় দেশের মধ্যে সমুদ্র সীমা চিহ্নিত না করে এবং বাংলাদেশের ভেতরে পঞ্চম বাহিনী সৃষ্টি করে ভারত তার বহুদিনের পরিকল্পনা সুচারুভাবে বাস্তবায়িত করে চলছে। বাংলাদেশের কাছ থেকে ট্রানজিট/করিডোর আদায় করাও ভারতের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনারই অংশ।'[৭] বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের নানাদিক যেমন-বাংলাদেশের

---

মিলিয়ন (৩০ লাখ) বাংলাদেশী মারা গেছে। – দেখুন সিরাজুর রহমান, একজীবন এক ইতিহাস ঐতিহ্য, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০১০ , পৃ. ১৭৬।

৬. মর্জিনা আফসার রোজী, সীমান্ত এখন রক্তাক্ত প্রান্তর, দৈনিক ইনকিলাব, ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০১২, পৃ-৮।

৭. দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ অগাস্ট ১৯৯৯ সংখ্যা।



www.pathagar.com

ভৌগোলিক অবস্থান ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বর্তমান অগ্নিগর্ভ অবস্থা, বাংলাদেশের বুকের উপর দিয়ে করিডোর সুবিধা লাভে ভারতের দীর্ঘ প্রয়াস, বাংলাদেশে-ভারত সম্পাদিত চুক্তিসমূহ বাস্তবায়িত না হওয়া, বহু পাক্ষিকতায় ভারতের পরিকল্পিত অনাগ্রহ, প্রস্তাবিত এশিয়ান হাইওয়ে রেলওয়েকে কেবল নিজের স্বার্থে ব্যবহারকল্পে ভারতীয় প্রচেষ্টা, বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য অসমতা, বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের অন্যান্য দেশকে ভারত নির্ভরকরণ প্রচেষ্টা, বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের নামে ভারত নির্ভরতা বৃদ্ধিকরণ, ভারতের দীর্ঘমেয়াদী সামরিক লক্ষ্য সমূহ অর্জন প্রচেষ্টা, সীমান্ত চিহ্নিতকরণ, সীমান্তের বিভিন্ন অংশ অমিমাংসিত রাখা, ছিটমহল সমস্যা, তিন বিঘা করিডোর, সীমান্ত সংঘর্ষ, পুশইন, বাংলাদেশী শরণার্থী নাম দিয়ে ভারতীয়দের বাংলাদেশে পুশব্যাক, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা, বিএসএফের পাদুয়া[৮] দখল করে নেয়া, স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলনে মদদদান, সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় বাহিনীর তৎপরতা, বাংলাদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বলকরণে ভারতীয় প্রচেষ্টা, বাংলাদেশ বিরোধী ভারতীয় প্রচারণা, চোরাচালানকে উৎসাহিত করা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, বাংলাদেশে কর্মরত ভারতীয় কূটনীতিকদের আধিপত্যবাদী আচরণ ও অতিউৎসাহ, বাংলাদেশের ব্যাপক জনগণের বিশ্বাস ও আদর্শের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান, বাংলাদেশের উদীয়মান শিল্প সেকটরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য বহুবিধ ষড়যন্ত্র ও ডাম্পিং, ভারতের পানি আগ্রাসন তথা অভিন্ন নদীগুলির পানি বন্টন সমস্যা– গঙ্গা নদীর পানি বন্টন-ফারাক্কা বাঁধ, তিস্তা নদীর পানি বন্টন–গজলডোবা বাঁধ মরণ ফাঁদ, টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ, সারী নদীর উৎসমুখ তথা মাইন ফ্রং নদীতে বাঁধ নির্মাণ, ফেনী নদীর পানি লুণ্ঠন, আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্প, খোয়াই নদীর উৎস মুখে বাঁধ, মনু নদীর উজানে মিনি ফারাক্কা, গোমতী নদীর উজানে ভারতীয় বাঁধ, পুনর্ভবা, কোদলা, ধরলা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র নদীর উজানে বাঁধ; বাংলাদেশের যুব সমাজকে ধ্বংসে সীমান্তব্যাপী ফেনসিডিলের অসংখ্যা কারখানা স্থাপন, বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা ও সমুদ্রের তলদেশের সম্পদ দখলের অপতৎপরতা, অপদখলী ভূমি হস্তান্তর না করা, অনিষ্পন্ন সীমানা নির্ধারণে সই হওয়া প্রটোকল

৮. সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার পশ্চিম জাফলং ইউনিয়নের বহুল আলোচিত পাদুয়া গ্রাম ২০১০ সালের ১৪ ডিসেম্বর দখল করে নিয়েছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ। -দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৫ ডিসেম্বর, ২০১০, পৃ-১।



www.pathagar.com

অনুসাক্ষরে বিরোধিতা, মহুরীর চরের সমস্যা, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন, সীমান্তে বিএসএফের নির্যাতন তথা পরিকল্পিত ভারতীয় সীমান্ত সন্ত্রাস ইত্যাদিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোন অবকাশ নেই। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন লিখেছেন, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির জন্য ভারত নিজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী।[৯] বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ নানা ভারতীয় আগ্রাসী অপতৎপরতার মধ্যে রয়েছে :

ক. পারিসরিক আগ্রাসন ও সীমান্ত হামলা,

খ. দেশের অস্তিত্ববিনাশী গোয়েন্দা তৎপরতা,

গ. ভারতীয় সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন,

ঘ. ভারতের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক আগ্রাসন,

ঙ. শিক্ষা ব্যবস্থায় ও ধর্মীয় পরিমণ্ডলে আগ্রাসন,

চ. সংবাদ মাধ্যম ও তথ্য মাধ্যমে ভারতীয় আগ্রাসন,

ছ. অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারতীয় প্রভাব ও আগ্রাসন এবং

জ. বাংলাদেশের পারিবেশিক পরিমণ্ডলে আগ্রাসন বা পরিবেশ যুদ্ধ।[১০]

## ১.৩ ভারতীয় সীমান্ত সন্ত্রাস

ভারতীয় পানি সন্ত্রাস, তথ্য সন্ত্রাস এবং সীমান্ত সন্ত্রাস যে একই সূত্রে গাঁথা তা বোধকরি খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে নতজানু করে ভারতীয় নীল নকশার বাস্তবায়ন করা। ভারতীয় নীল নকশার মধ্যে রয়েছে ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি[১১] বাস্তবায়ন না করা, যার ফলে ছিটমহল ও অপদখলীয় ভূমির হস্তান্তর ও গ্রহণ বিলম্বিত করার পাশাপাশি অভিন্ন নদীসমূহের মধ্য স্রোতকে, অবৈধভাবে বাঁধ, গ্রোয়েন এবং স্পার নির্মাণের মাধ্যমে অব্যাহতভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঠেলে দিয়ে জেগে ওঠা চর দখলের মধ্য দিয়ে সার্বভৌম বাংলাদেশের ভূমি গ্রাস করা। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া শূন্য রেখায় নির্মাণের মাধ্যমে সৃষ্ট ভারতীয় সীমান্ত সন্ত্রাস বাংলাদেশের মতো একই ভূমি সীমার অংশীদার

---

৯. প্রফেসর ডা. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া ও বহির্বিশ্ব, ১৯৯৪, পৃ-১২।

১০. ড. মোহাম্মাদ আব্দুর রব, বাংলাদেশে ভারতীয় আগ্রাসন : বিপন্ন সার্বভৌমত্ব, দৈনিক সংগ্রাম, ২৫ এপ্রিল ২০০৫, পৃ-৬।

১১. মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি ভারত কোনভাবেই বাস্তবায়ন করতে চায়না বরং জীইয়ে রেখে বাংলাদেশের ওপর উৎপাত চালিয়ে যেতে চায়।



www.pathagar.com

প্রতিবেশীর প্রতি ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ বলে প্রতীয়মান হয়। মনুসংহিতা[১২] ভারতের প্রাচীনতম এবং সর্বাপেক্ষা প্রমাণ্য ধর্মশাস্ত্র যা যুগ যুগ ধরে ভারতীয় হিন্দু সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই মনুসংহিতার ১৫৮তম শ্লোকে বলা হয়েছে, 'অনন্তরমরিং বিদ্যাদরিসেবিনমেবচ। অরেরনন্তরং মিত্রমুদাসসীনং তয়োঃপরম।' (কোন রাজার) অব্যবহিত পরবর্তী রাজাকে শত্রু এবং শত্রুর সহায়ককে শত্রু বলে জানবেন। শত্রুরাজ্যের পরবর্তী রাজাকে মিত্র এবং তাদের পরবর্তী রাজ্যের রাজাকে উদাসীন বলে জানবেন। এই শ্লোকের মূল বক্তব্য হচ্ছে, একই ভূমি সীমার অংশীদার প্রতিবেশীর প্রতি ভারতের মনোভাব হবে চরম শত্রুতামূলক যা মনুসংহিতার অলঙ্ঘনীয় ধর্মীয় অনুশাসন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত।[১৩]

মনু তার সংহিতার মধ্য দিয়ে মানুষের প্রতি মানুষের অবজ্ঞা ও নিগৃহকে ধর্মীয় রূপদান করার ফলে অত্যাচারকে ভারত একটি ধর্মীয় কর্তব্য বলে জ্ঞান করে। আবহমানকাল ধরে নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের সংগে একাদিক্রমে যে নিপীড়ন চলে আসছে, তা থেকেই প্রমাণিত হয় মানবিক অধিকারকে পদদলিত করেই 'মহান' ভারতের নৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে হাল আমলের ভারতীয় বর্গীদের উৎপাত স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা শুরুর কিছুদিন পর থেকেই চলে আসছে। কখনো বেশি, কখনো কম। তবে বলা যায় বিরামহীনভাবেই বন্ধুদেশের বন্ধুদের এই অবন্ধুসুলভ আচরণ বাংলাদেশকে গ্রাস করে চলেছে।

ভারতীয় আগ্রাসনের হিংস্র থাবায় বিপন্ন মানবতা, বিধ্বস্ত বাংলাদেশ। সীমান্তে পাখির মত গুলি করে মানুষ হত্যা করছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। ফেলানীদের লাশ কাঁটা তারের বেড়ায় ঝুলে থাকে। বাংলাদেশী সীনামায় ঢুকে পশুসহ মানুষকে অপহরণ

---

১২. মনুসংহিতা বা মনু স্মৃতি () সনাতন হিন্দু আইন বা প্রাচীন আইন প্রণেতা মনু ও অন্যান্য ধর্মগুরু কর্তৃক আনুমানিক খৃস্টপূর্ব ২০০ অব্দ থেকে ২০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে রচিত। এতে হিন্দু ধর্ম ও সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশ এবং ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে যাবতীয় নিষেধ সহ বহুবিধ বিষয়ে ইতিকর্তব্যের নির্দেশ পাওয়া যায়। এ গ্রন্থের বহু টীকা ও ভাষ্য আছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত 'মনুসংহিতা' ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও বহুল আলোচিত গ্রন্থ। মনুসংহিতাকে ধর্মশাস্ত্রও বলা যায় আবার স্মৃতিশাস্ত্ররূপেও উল্লেখ করা যায়। সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ থেকেই মনুসংহিতার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং তা থেকে এ গ্রন্থের প্রাচীনত্বই প্রমাণিত হয়। - দেখুন, মনুসংহিতা, প্রমানেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শাস্ত্রী, সদেশ, বিবেকানন্দ রোড, কোলকাতা।

১৩. অব. মেজর জেনারেল আ.ল.ম. ফজলুর রহমান, ভারতীয় সীমান্ত সন্ত্রাস : কিসের আলামত, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৩ মার্চ ২০০৫, পৃ-৯।



www.pathagar.com

করে নিয়ে যাচ্ছে বিএসএফ। ভারত আসলে অত্যাচার করে খুব আনন্দ পায়। তার মধ্যে প্রতিহিংসা ও পরশ্রীকাতরতা স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশি। ভারতের আচরণ অনেকটা ইসরাইলের সাথে তুলনীয়। তাদের কূটনীতি মানে চানক্যনীতি।[১৪]

স্মর্তব্য, ১৯৭২ সালে মুজিব শাসন আমলে মার্চ-এপ্রিল মাস থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগের শুরু থেকেই সীমান্তে উৎপাতের কিছু নমুনা ধরা পড়ে। এমনকি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় সরকার (১৯৯৬-২০০১) ক্ষমতায় থাকাকালে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর সব ধরনের সীমান্ত উৎপাত একেবারে সীমাহীন হয়ে পড়ে। দিল্লীকে তোষামোদকারী সরকারগুলোর আমলে বাংলাদেশের জন্যে সীমান্ত সমস্যা যেনো অত্যধিক বেড়ে যায়।[১৫] ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতের বিএসএফ-এর অবৈধ আচরণের ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সাধারণ সীমান্ত আইন এবং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত চুক্তি অনুযায়ী সীমান্তের উভয়দিকে ১৫০ গজ করে যে স্থান আছে, তাকে বলা হয় 'নো ম্যান্স ল্যান্ড'। সে স্থানে সীমান্তের কোনো দিকেই কোনো স্থাপনা বা পরিখা খনন করা যাবে না। কিন্তু ঐ নো ম্যান্স ল্যান্ডে ভারত কাঁটাতারের বেড়া ও সড়ক নির্মাণ, নিরাপত্তা চৌকি স্থাপন, বিএসএফ ক্যাম্প স্থাপন ইত্যাদি করেই চলেছে। এসব অবৈধ কাজে বিএসএফকে ভারতীয় সেনাবাহিনী কখনো কখনো বিএসএফের আবরণে সাহায্য দিয়ে আসছে। তখন ছোটখাট সীমান্তযুদ্ধ বেঁধে যাচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের শেষ বছর ২০০১ সালে ভারতীয় বাহিনী সিলেট সীমান্তে পাদুয়া দখল করে নেয়। কিন্তু বিডিআর-এর বীর জওয়ানরা পাদুয়াকে দলখমুক্ত করে সে বছরের ১৫ এপ্রিল। এরপর ঐ মাসেই আন্তর্জাতিক সীমান্ত লংঘন করে কুড়িগ্রাম জেলার বড়াইবাড়ি গ্রামে ঢুকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তায় বিএসএফ-এর একটি কোম্পানী গ্রামটি দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু দখলকারীরা যখন দেখে যে, সীমান্তে বিডিআর ক্যাম্প থেকে কোনো সাড়া বা প্রত্যুত্তর নেই, তখন তারা ভাবে বিডিআরের লোকজন ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে গেছে। এই ভেবে ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশের আরো ভেতরে প্রবেশ করতে থাকে। বিডিআর ক্যাম্প থেকে মেশিনগানের রেঞ্জের ভেতরে আসার পরপরই

১৪. আবু জাফর, ভারত প্রেমের অমৃত কথা, উপসম্পাদকীয়, দৈনিক ইনকিলাব, ২৬ নভেম্বর, ২০০৪, পৃ-১১।

১৫. সিরাজুল হোসেন খান, সীমান্ত তস্করদের জওয়াব দিচ্ছে বিডিআর, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৮ মার্চ ২০০৫, পৃ-৮।



www.pathagar.com

তাদের ওপর বিডিআর ক্যাম্পে অবস্থিত প্লাটুনটি গুলি ছোড়ে। ঘটনাস্থলে নিহত হয় ১৭ জন ভারতীয় সেনা এবং আহত হয় অনেকে। নিহতদের লাশ ফেলে, আহতদের নিয়ে আক্রমণকারীরা কোনোক্রমে পালিয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটে ঐ বছরের ১৮ এপ্রিল। এ দু'টি ঘটনা নিয়ে ভারতীয় লোকসভায় অর্থাৎ পার্লামেন্টে তুমুল হৈ চৈ হয়। ক্ষমতাসীন বিজেপি'র এক উন্মত্তপ্রায় সদস্য পার্লামেন্ট ভবনে চিৎকার করে ঢাকায় অবস্থিত বিডিআর হেড কোয়ার্টার্স বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার দাবি জানায়।[১৬] অপরদিকে, দিল্লি বিডিআরের বিজয়ী বীরদের এবং তৎকালীন বিডিআর প্রধান মেজর জেনারেল আ.ল.ম. ফজলুর রহমানকে কঠোর শাস্তি দেয়ার জন্য ঢাকার ওপর জোর চাপ দিতে থাকে। দেশের জনমত এবং পত্র-পত্রিকার মতামত উপেক্ষা করে ভারতের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার। তারা সিলেটের পাদুয়াকে আবারো ভারতের দখলে দিয়ে দেয় এবং বিডিআর প্রধানকে তার পদ থেকে অপসারণ করে। বিডিআরের দেশপ্রেম, সাহস ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা সরকারের কাছে হয়ে দাঁড়ায় অপরাধ?[১৭]

'ভারত তার সীমান্তে বিদ্যুৎ-সঞ্চালিত দুই পরত কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে রেখেছে যাতে কোনো বাংলাদেশী তার দেশে ঢুকতে না পারে। ভুল করেও কোনো বাংলাদেশী সে বেড়ার ধারে-কাছে গেলে তাকে চড়ুই পাখির মতো গুলি করে মারা হচ্ছে। সীমান্তে হাজার হাজার বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)। আমাদের প্রধানমন্ত্রী এসব হত্যা বন্ধ করতে পারছেন না, উল্টো তিনি বাংলাদেশের নদী, বাংলাদেশের বন্দর, বাংলাদেশের সড়ক আর বাংলাদেশের রেলপথ খুলে দিয়েছেন ভারতের জন্য। রাষ্ট্রের শত্রু, বিদেশী নাগরিক আর ভারতের দালালদের তিনি উপদেষ্টা নিযুক্ত করেছেন, তারা বলে যে বিনিময়ে ভারতের কাছ থেকে কোনো রকম ফি কিংবা মাশুল চাওয়া অসভ্যতা হবে।'[১৮]

এডভোকেট বাবুল দে লিখেছেন, 'সীমান্তে নিরীহ বাংলাদেশী নাগরিক হত্যার বিষয়টি

---

১৬. ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী দল শিবসেনা, বজরং, আর এসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বিজেপি'র সাথে সুর মিলিয়ে বাংলাদেশ আক্রমণ করতে সৈন্য পাঠাতে দাবী জানায়। -দেখুন, দৈনিক সংগ্রাম, উপসম্পাদকীয়, ৯ মে, ২০০১, পৃ-৪।

১৭. সিরাজুল হোসেন খান, পূর্বোক্ত, পৃ-৮।

১৮. সিরাজুর রহমান, তৃতীয় সালতামামিতে হাসিনার ভাষণ হাস্যকর, দৈনিক আমার দেশ, ১১ জানুয়ারী ২০১২, পৃ-৬।



www.pathagar.com

অমানবিক নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে পড়ে। সীমানা লংঘনকারীকে ধরে শাস্তির ব্যবস্থা করা যায়। তাই বলে হত্যা চরমভাবে মানবাধিকার লংঘন।'[১৯]

সিলেটের সাংবাদিক মুহাম্মাদ রিয়াজ উদ্দিন লিখেছেন, 'প্রায় প্রতিদিনই সীমান্তবর্তী এলাকার কোথাও না কোথাও সংঘটিত হয় গুলির ঘটনা। আর এসব গুলিতে প্রাণ হারান বাংলাদেশের নিরপরাধ, নিরীহ, নিরস্ত্র ব্যক্তিরা। যাদের পরিচয় সাধারণ কৃষক, দিনমজুর কিংবা ব্যবসায়ী। এসব হত্যাকাণ্ডের পরপরই দু'দেশের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা দায়সারা কোনো রকম একটি বিবৃতি দিয়েই ঘটনাকে চাপা দেয়ার চেষ্টা করেন। সরকার ভারতের এমন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জানাতে পারেনি। যার ফলে ভারত অন্যান্য সীমান্তে নির্বিচারে গুলি চালাতে না পারলেও ঠিকই বাংলাদেশের নাগরিকদের ওপর গুলি চালায়।'[২০]

বিএসএফ-এর নির্যাতন বর্তমানে চরম পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। মোহাম্মদ আবদুল সেলিম লিখেছেন, 'একটি বিষয় বা ইস্যু ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। তা হলো, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের বিভিন্ন স্থানে বিএসএফ বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স কর্তৃক ক্রমবর্ধমান বাংলাদেশী সাধারণ বা নিরীহ মানুষ হত্যার বিষয়। এ নিয়ে উভয় দেশের সীমান্তে প্রায়ই ঘটছে আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে গুলি বিনিময়। দেখা যাচ্ছে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি। তবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে উভয় দেশের বিভিন্ন সীমান্ত পয়েন্টে ভারতীয় বিএসএফ বাহিনীর বেপরোয়া কর্মকাণ্ডের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাদের দ্বারা বাংলাদেশী অপহরণ, গুম, হত্যা ইত্যাদি যেন নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের তাণ্ডবে নিরীহ গ্রামবাসী উপায়ন্তর না পেয়ে নিজ বাড়ি ছেড়ে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করে নিরাপদ স্থানে। পালানো বা আত্মরক্ষার সময়েও অনেকে তাদের ছোড়া গুলিতে আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কেউবা আহত অবস্থায় কোনোরকমে সেখান থেকে পালিয়ে প্রাণে রক্ষা পায়। ভারতের একতরফা আক্রমণে সীমান্তজুড়ে বাংলাদেশীরা দিন কাটাচ্ছে আতংকের মধ্য দিয়ে। এ আতংক কবে নাগাদ কাটবে তা জানে না ভুক্তভোগী বাংলাদেশীরা। গণমাধ্যমে ভারতীয় বিএসএফ কর্তৃক আক্রমণ, হত্যা, অবৈধ প্রবেশ

---

১৯. এডভোকেট বাবুল দে, সৎ প্রতিবেশী পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়, দৈনিক ইনকিলাব, ১৩ জানুয়ারী ২০১২, পৃ-১১।

২০. মুহাম্মাদ রিয়াজ উদ্দিন, প্রতিবেশী রাষ্ট্র এবং সীমান্তে বাংলাদেশী হত্যা, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১২, পৃ-৭।



www.pathagar.com

ইত্যাদি নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে। কিন্তু আমাদের সরকার যেন এ ব্যাপারে একেবারেই চুপচাপ।[২১]

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম লিখছেন, 'মহান ভারত মানবের দেশ, দানবের নয়। পৌরাণিক যুগে শূর-অসুরের, দেব-দানবের লড়াইয়ের অনেক উপাখ্যানে এমন চরম নিষ্ঠুরতার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রে সদা সর্বদা অসুরের নয়, শূরের জয়জয়কার দেখা যায়। সে মহাভারতের কুরুক্ষেত্রেই হোক, আর সীতা হরণে লঙ্কাপতি রাবনই হোক। কোথাও কোনো দানবের জয় হয়নি। সর্বত্রই মানবের আর মানবতার জয়জয়কার। কিন্তু হায়, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ইদানীং একি দেখি! ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী দিনের পর দিন নিষিদ্ধ পাখি শিকারের মতো সীমান্তে নিরীহ মানুষকে গুলি করে মারছে। কোনো প্রতিকার নেই। কেন এই নিষ্ঠুরতা? এ দিয়ে তারা কি অর্জন বা বুঝাতে চায়? এটা কি ভারতের জাতীয় অনুভূতি? নাকি সীমান্তরক্ষী বিএসএফ'র উচ্ছৃঙ্খলতা? এসব জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়ার সময় মনে হয় এখন এসে গেছে।'[২২]

বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের আগ্রাসী বেপরোয়া সীমান্ত হত্যাকে বিশেষজ্ঞরা ভারতের দানবীয় মূর্তি ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বলে আখ্যায়িত করেছেন। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের আরেক রূপ। যখন রাষ্ট্রশক্তি আন্তর্জাতিক আইন-কানুন ও রীতিনীতি লংঘন করে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত হয় তখন তাকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ হিসেবে গণ্য করা হয়। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কারণেই ভারত বাংলাদেশে এবং বিশ্বব্যাপী ধিকৃত।

বিডিআরের সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) আ.ল.ম. ফজলুর রহমানের মতে, 'সীমান্ত অতিক্রম করছে বলে কাউকে মেরে ফেলার বিধান পৃথিবীর কোনো দেশে নেই। সীমান্ত অতিক্রমের অপরাধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিজ নিজ দেশের আইনের হাতে ন্যস্ত করাই হচ্ছে বিধান। আইন অনুযায়ী আদালত অপরাধ প্রমাণসাপেক্ষে দণ্ড দেবেন। দেখামাত্রই গুলি করে মেরে ফেলা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।'[২৩]

বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. এমাজউদ্দিন

---

২১. মোহাম্মাদ আবদুল সেলিম, বিএসএফের নিষ্ঠুরতার কাছে সবই যেন হার মেনেছে, দৈনিক সংগ্রাম, ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১২, পৃ-৫।

২২. বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী, সীমান্ত হত্যা, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৫ জানুয়ারী ২০১২, পৃ-৪।

২৩. দৈনিক আমার দেশ, ৬ মার্চ ২০১১, পৃ-৪।



www.pathagar.com

আহমদের ভাষায়, "সীমান্তে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক ঘটনা আমাদের দেশের সকল মহলকে ভাবিয়ে তুলেছে। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারত আমাদের প্রতি অবিচার, অনাচার ও নির্মমতার পরিচয় দিয়েছে। ভারতের শাসকরা আমাদের অতীতে যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিয়েছে তার কোনোটিই বাস্তবায়ন হচ্ছে না। উল্টো আমাদের সীমানাকে হুমকির মুখে ফেলেছে। দুই দেশের মধ্যে প্রতিবেশী হিসেবে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হওয়ার কথা ছিলো তা ততটা শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে। এর জন্য দায়ী সরকার ও তার তোষণনীতি।'[২৪]

**১.৪ বাংলাদেশের সীমানাজুড়ে হত্যাকাণ্ড : কিছু পরিসংখ্যান**

শুধু বাংলাদেশের ভূমি দখল করেই নয়- হিংস্র দানব প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত, দক্ষিণ এশিয়ার অক্টোপাস ভারত ১৯৭১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ৯৩০০ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে। ৫ হাজারের বেশি বাংলাদেশী অপহৃত হয়েছে। ৮২৫ জন নারী ও শিশু ধর্ষিত হয়েছে। কেবলমাত্র ২০০১ সালের ১০ অকটোবর থেকে ২০০৬ সালের ১৮ মার্চ পর্যন্ত সময়কালে ভারতীয় বর্বর সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ-র হাতে ৩৭৪ জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছে। ৪৩৮ জন গ্রেফতার এবং ৪২০ জন অপহৃত হয়েছে। ৮ শিশুসহ ৫৩ জন নিখোঁজ হয়েছে এবং ১৬ জন নারী ধর্ষিত হয়েছে।[২৫]

সীমান্ত সন্ত্রাসে ভারতের আগ্রাসনে বহু বেসামরিক বাংলাদেশী নাগরিক প্রায় প্রতিদিনই মারা যাচ্ছে। এমন নীরব ও নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের নজির পৃথিবীতে বিরল।

বিডিআরসহ ঐ হতভাগা বাংলাদেশী নাগরিকদের বেশিরভাগই বিএসএফ'র গুলিতে প্রাণ হারায়। শুধু ২০০০ সালে বিএসএফ'র হাতে মোট ৩৫ জন বিডিআর সদস্য নিহত হয়েছেন। ঢাকার ইংরেজী দৈনিক The Independent গত ১২ ডিসেম্বর ২০০০ সংখ্যায় এক সরকারী সূত্রের উল্লেখ করে '35 BDR men killed in border skirmishes this year' শীর্ষক এক রিপোর্ট প্রকাশ করে। বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকাসমূহ ভারতীয় সীমানা রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর নিরীহ

---

২৪. উদ্ধৃত ড. কে.এ.এম. সাহাদাত হোসেন মণ্ডল, সীমান্তে বিএসএফের নির্যাতন : মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন, দৈনিক ইনকিলাব, ৯ ফেব্রুয়ারী ২০১২, পৃ-৯।

২৫. উদ্ধৃত ড. মাহফুজ পারভেজ, ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্ব, আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ : বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহের বিপদ ও করণীয়, সেমিনার স্মারক গ্রন্থ ২০০৬, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৭, পৃ- ৬৮।



www.pathagar.com

বাংলাদেশীদের উপর হিংসাত্মক হত্যাকাণ্ড ও আক্রমণের খবর প্রায়শই প্রকাশ করে থাকে। ৩০ মার্চ ২০০১ তারিখের দৈনিক যুগান্তর ইউএনবি'র বরাতে এক খবর দিয়ে লিখে যে, বিএসএফ চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার চাঁদপুর গ্রাম থেকে এক বাংলাদেশী তরুণ জুলুকে (২৭) অপহরণ করে নির্যাতন করে হত্যা করেছে। ১৩ মার্চ ২০০১ তারিখের দৈনিক মানব জমিনের সিলেট অফিসের এক প্রতিবেদনে বিএসএফ'র গুলিতে নিহত জকিগঞ্জের সীমান্তবর্তী কুশিয়ারা নদীতে খলিলুর রহমানের লাশ পাওয়ার খবর জানা যায়। ১৫ জানুয়ারী ২০০১ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'সাতক্ষীরা সীমান্তে বিএসএফ'র উস্কানিমূলক তৎপরতা : এক মাসে ১৫ জনের মৃত্যু। ইত্তেফাকের সাতক্ষীরা সংবাদদাতার ঐ খবরে প্রকাশ গত ১১ জানুয়ারী ২০০১ সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার খান্জিরা সীমান্তের ইছামতি নদীর ঘারকাঘাটে ভারতীয় হানাদার বিএসএফ'র একটি টহলদার গানবোট বাংলাদেশের পানিসীমায় প্রবেশ করে বাংলাদেশের একটি যাত্রীবাহী নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে দুদলি গ্রামের জিন্নাহ নামের ৩২ বছরের এক যুবককে হত্যা করে। একইভাবে ঐ জানুয়ারী মাসের ৬ তারিখে বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চলের কালিন্দী নদীতে আর একটি যাত্রীবাহী নৌকায় বিএসএফ গুলি চালিয়ে ২ জনকে এবং ইছামতী নদীতে বাংলাদেশী আরো ৪ ব্যক্তিকে হত্যা করেছে বলে ইত্তেফাকের (১৫-০১-২০০১) ঐ রিপোর্টে প্রকাশ।[২৬]

গত ২০ ডিসেম্বর, ২০০০-এর দৈনিক মানবজমিনে প্রকাশিত অপর এক খবরে দেখা যায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-র গুলিবর্ষণে বাংলাদশের রাজশাহী জিলার চরখিদিরপুর সীমান্তে খুশবু নামের একজন বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ী আহত হয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন হয়। ঐ ঘটনায় বিএসএফ বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ৪৭টি বৈধভাবে আমদানিকৃত গরু জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যায়।

১৯৯০ সাল থেকে নিয়ে ২০০০ পর্যন্ত মোট ১১ বছরে ভারতের সীমান্তরক্ষী বিএসএফ-এর গুলিতে বাংলাদেশের মোট ২২৮ জন নাগরিক নিহত হয়। এর মধ্যে বাংলাদেশের

---

২৬ . ড. মোহাম্মাদ আবদুর রব, বাংলাদেশে ভারতীয় আগ্রাসন : বিপন্ন সার্বভৌমত্ব, দৈনিক সংগ্রাম, ১৬ এপ্রিল ২০০১, পৃ-৭।



www.pathagar.com

বিডিআর-এর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী, হিন্দু উগ্রবাদী এবং ভারতীয় নাগরিকদের নগ্ন হামলা, ভূমিদখল, লুটতরাজ, নারী-ধর্ষণ, অপহরণ ও চোরাচালানসহ অন্যান্য আগ্রাসন বাংলাদেশে বর্তমানের আওয়ামী শাসনামলে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিচের ছকে বিগত এক যুগে তথা ১২ বছরে ভারতীয়দের হাতে নিহত ও আহত বাংলাদেশী নাগরিকদের হিসাব তুলে ধরা হলো ঃ

**সারণী-১**

ভারতীয় বিএসএফ-এর হাতে নিহত এবং আহত বাংলাদেশী নাগরিকদের বছরওয়ারী হিসাব (১৯৯০-২০০১ সময়কাল)।

| সন | নিহত | আহত | আক্রমণ ও গোলাগুলির ঘটনা |
|---|---|---|---|
| ১৯৯০ | ২৯ | ১৯ | - |
| ১৯৯১ | ২৭ | ১৭ | - |
| ১৯৯২ | ১৬ | ১৩ | - |
| ১৯৯৩ | ২১ | - | - |
| ১৯৯৪ | ২১ | ১৪ | ১৭০ |
| ১৯৯৫ | ১২ | ৯ | ৭৫ |
| ১৯৯৬ | ১৩ | ১৮ | ১৩০ |
| ১৯৯৭ | ১১ | ১১ | ৩৯ |
| ১৯৯৮ | ২৩ | ১৯ | ৫৬ |
| ১৯৯৯ | ৩৩ | ৩৮ | ৪৩ |
| ২০০০ | ৩৯ | ২৬ | ৪২ |
| ২০০১ | ৯৪ | ১০২ | ৫৮ |

তথ্য: ২২-২৫ অকটোবর, ২০০০ তারিখ ঢাকার পীলখানা বিডিআর সদর দপ্তরে বিডিআর-বিএসএফ শীর্ষ পর্যায়ের সীমান্ত সম্মেলনে উপস্থাপিত তথ্যানুসারে উপস্থাপিত রিপোর্ট, দৈনিক সংগ্রাম, ২৯-১০-২০০১। ২০০০-২০০১ সালের হতাহতের হিসাব মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকারের' রিপোর্ট থেকে নেয়া হয়েছে। দেখুন, দৈনিক ইনকিলাব, ২৭ জুলাই, ২০১২, পৃ-১২।

উপরোল্লিখিত ছক থেকে দেখা যায় যে ১৯৯৬ থেকে ২০০০ সালের অকটোবর পর্যন্ত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় মেয়াদের শাসনামলে মোট ২১৩ জন বাংলাদেশী



www.pathagar.com

নাগরিক নিহত হয়েছে ভারতীয় বিএসএফ-র গুলিতে; আহত হয়েছে মোট ২১৪ জন বাংলাদেশী। ঐ সময়ে সীমান্তে সর্বমোট ৩৬৮টি ভারতীয় হামলা ও গোলাগুলির ঘটনা সংঘটিত হয়।

উপরোক্ত সময়কালে শুধু কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী সীমান্তে বিএসএফ ৩১জন নিরপরাধ বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে। এর মধ্যে ২৮ জন সাধারণ মানুষ এবং ৩ জন বিডিআর জওয়ান।[২৭] একযুগে রৌমারী সীমান্তে বিএসএফ-র গুলিতে নিহত সাধারণ বাংলাদেশীদের অনেকের লাশও তাদের পরিবার ফেরত পায়নি। এদের সবাইকে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের ভেতরে ঢুকে গুলি করে হত্যা করার পর বিএসএফ সদস্যরা ঐসব লাশ পশুর মৃত দেহের মত টেনে হিচড়ে নিয়ে চলে যায়।[২৮] ২০০১ সালের ১৭ জুন বিএসএফ লালমনিরহাট জেলার কুচলিবাড়ী সীমান্তে বাংলাদেশে প্রবেশ করে একজন কৃষককে হত্যা করে। এর আগে ১৪ জুন ২০০১ চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর সীমান্তে হত্যা করা হয় ৩ জন বাংলাদেশী কৃষককে। এ সময় ৬ জন বাংলাদেশীকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯ জুন ২০০১ হালুয়াঘাট সীমান্তে গুলি চালিয়ে বিএসএফ হত্যা করে আরো একজন কৃষককে।[২৯] ২০০১ সালের ৫ জুলাই বিনা উস্কানিতে সীমান্ত আইন লংঘন করে বিএসএফ কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ি সীমান্তে বাংলাদেশ সীমান্তের ২০০ গজ অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মফিজুর রহমান (৩৫) কে অপহরণ এবং রৌমারী সীমান্তে ফুল মিয়াকে (৩২) গুলি করে গুরুতর আহত করে।

১৪ সেপ্টেম্বর ২০০২ দৈনিক ইত্তেফাকের এক রিপোর্টে ২০০২ সালের জানুয়ারী-অগাস্ট এই ৮ মাসে বিএসএফ'র গুলিতে ৮৫ জন বাংলাদেশী নির্মমভাবে নিহত হয়েছে বলে জানা যায়।[৩০] রিপোর্টে বলা হয়, বিএসএফ কর্তৃক সীমান্ত এলাকায় বিনা

---

২৭. শাহাদাত বরণকারী এ ৩ জন হচ্ছেন : শহীদ ল্যান্সনায়েক মো. ওয়াহিদ, শহীদ সিপাহী মো. মাহফুজুর রহমান এবং শহীদ সিপাহী মো. আবদুল কাদের। ২০০১ সালের ১৮ এপ্রিল রৌমারীর বড়াইবাড়ি গ্রামে ভারতের সীমান্তরক্ষীরা রাতের আঁধারে চোরের মত ঢুকে ডাকাতের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাংলাদেশের নিরপরাধ ও শান্তিকামী নাগরিকদের ওপর। এ ৩ জন সেদিন ভারতীয় হানাদারদের মুকাবিলায় জীবনপণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে অকাতরে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। বীরত্ব, সাহসিকতা, কর্তব্য নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের কারণে তারা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন দেশবাসীর হৃদয়ে।- দৈনিক সংগ্রাম, ২৬ এপ্রিল, ২০০১, পৃ.১।

২৮. দৈনিক সংগ্রাম, ২৬ এপ্রিল ২০০১, পৃ-২।

২৯. সীমান্তে বিএসএফ'র আগ্রাসন, সম্পাদকীয়, দৈনিক সংগ্রাম, ১৪ জুন ২০০১, পৃ-৬।

৩০. সীমান্ত হত্যা : ৮ মাসে নিহত ৮৫ বাংলাদেশী, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০২, পৃ-১।



www.pathagar.com

উস্কানিতে বাংলাদেশী নিরীহ বেসামরিক নাগরিকদের গুলি করে হত্যার বিষয়টি আশংকাজনক হারে বাড়ছে।

দৈনিক ইনকিলাবের ৪ অগাস্ট ২০০৪ এর এক রিপোর্টে বলা হয় যশোর সীমান্তে এক পক্ষ কালের ব্যবধানে বিএসএফ ৪ জন বাংলাদেশীকে গুলি করে হত্যা করে লাশ টেনে হেঁচড়ে ওপারে নিয়ে যায়। যশোরের শিকারপুর সীমান্তে জমিতে সেচ দেয়ার সময় ১৫ই জুলাই ২০০৪ বিএসএফ গুলি করে শিকারপুর গ্রামের কৃষক করিম বক্সকে হত্যা করে লাশ নিয়ে যায়। পরবর্তীতে ফ্লাগ মিটিং-এর মাধ্যমে ঘটনার তিনদিন পর লাশ ফেরত দিতে বাধ্য হয়। ২০০৪ সালের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে সাতক্ষীরার কলারোয়ার চান্দা সীমান্তে আশ শিকড়ী ক্যাম্পের বিএসএফ রামভদ্রপুর গ্রামের মনিরুল ইসলামকে গুলি করে হত্যা করে। একই সময়ে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে পদ্মায় মাছ ধরার সময় দোমাকুল ক্যাম্পের বিএসএফ উদয়নগর গ্রামের রফিক উদ্দিন ও মন্টু ব্যাপারীকে গুলি করে হত্যা করে। এছাড়া ঘিবা, পলিয়ানপুর, শিকারপুর, শালকোনা, সামান্তা ও যাদবপুরসহ বিভিন্ন সীমান্তে বিএসএফ সীমান্ত ঘেঁষা জমিতে ও বিভিন্ন নদ-নদীতে কাজ করতে যাওয়া সীমান্তবাসীদের বিনা কারণে রাইফেল উঁচিয়ে তেড়ে আসে এবং মারপিট করে আতঙ্ক সৃষ্টি করে।[৩১]

দৈনিক ইনকিলাবের দিনাজপুর রিপোর্টার মাহফুজুল হক আনার এর রিপোর্টে ৫ অগাস্ট ২০০৪ উল্লেখ করা হয় যে, দিনাজপুর সীমান্তে বিএসএফ প্যারাসুট বোমা নিক্ষেপ করায় বিচ্ছুরিত অগ্নিকান্ডে ২ জন বাংলাদেশী আহত এবং একটি বসত ঘরে আগুন লেগে যায়। এর আগে আরো কয়েকবার তারা একই সীমান্তে বাংলাদেশী অংশে বাঁধ নির্মাণে বাধা প্রদানের পর প্যারাসুট নিক্ষেপ করে আতংক সৃষ্টি করেছিল।[৩২]

দৈনিক নয়াদিগন্তের ১৪ মার্চ ২০০৫ এর এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে বিএসএফ ও ভারতীয় দুর্বৃত্তদের হাতে প্রতি পাঁচদিনে একজন বাংলাদেশী নিহত হচ্ছে। এ ছাড়া প্রতিদিনই তাদের হাতে সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছে। মানবাধিকার সংগঠন অধিকার-এর প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। অধিকার জানায়, ভারত কর্তৃক বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের নোম্যান্স ল্যান্ডে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ ও এর ফলে সৃষ্ট উত্তেজনার কারণে সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসকারী

৩১. বিএসএফ সীমান্ত অশান্ত করে তোলার পাঁয়তারা করছে, দৈনিক ইনকিলাব রিপোর্ট, দৈনিক ইনকিলাব, ৪ অগাস্ট ২০০৪, পৃ-১২।

৩২. মাহফুজুল হক আনার, দিনাজপুর সীমান্তে বিএসএফ'র প্যারাসুট সেল নিক্ষেপে অগ্নিকাণ্ড, দৈনিক ইনকিলাব, ৫ অগাস্ট ২০০৪, পৃ-১২।



www.pathagar.com

বাংলাদেশী নাগরিকরা আতঙ্কের মধ্যে জীবনযাপন করছে। অধিকারের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, গত ৫ বছর ২ মাস ১২ দিনে বিএসএফ এবং ভারতীয় দুর্বৃত্তদের হাতে ৩৭৭ জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে ৪৬৬ জন, গ্রেফতার হয়েছে ৪৬৭ জন, অপহৃত হয়েছে ৪৯১ জন, ৮ শিশুসহ ৩৯ জন নিখোঁজ এবং ৫ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এছাড়া একই সময় ৪৮টি ছিনতাই এবং লুটের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে বিএসএফ'র হাতে বিভিন্নভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে ১ হাজার ৮৩৮ জন বাংলাদেশী নাগরিক। বিএসএফ'র হাতে হত্যাকাণ্ডের শিকার সিংহভাগই হচ্ছে নিরীহ কৃষক। মাঠে কাজ করার সময় বিনা কারণে বিএসএফ তাদেরকে গুলি করে হত্যা করে এবং অপহরণ করে নিয়ে যায়।[৩৩]

দৈনিক সংগ্রামের চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর সংবাদদাতা ২৯ মার্চ ২০০৫ জানান চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকার ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএসএফ ও ঘোষ বাহিনীর সশস্ত্র হামলা বেড়েই চলেছে। বিএসএফ ও ঘোষ বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে মানুষ হত্যা, অপহরণ এবং ফসল ও গবাদি পশু লুট করে নিয়ে যায়। কিন্তু কোন প্রতিকার হচ্ছে না। গত ৫ বছরে বিএসএফ ও ঘোষ বাহিনী চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বিভিন্ন সীমান্তে ৫১ বার সশস্ত্র হামলা চালিয়ে ২৪ জনকে হত্যা, ১৩ জনকে অপহরণ, ৩০ জনকে আহত করে। এ ছাড়া প্রায় ১৭শ গবাদি পশু ও কয়েকশ বিঘা জমির ফসল লুট করে নিয়ে যায়। গত ৯ মার্চ ২০০৫ সন্ধ্যায় গোমস্তাপুর উপজেলার রোকনপুর সীমান্ত দিয়ে একদল সশস্ত্র ভারতীয় দুর্বৃত্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে মো. আলম (২২) নামের এক যুবককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যার পর লাশ সীমান্তের ওপারে নিয়ে যায়।[৩৪]

২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ-র হাতে ১২ জন বাংলাদেশী নিহত, ৪ জন বাংলাদেশী আহত এবং ৩ জন অপহৃত হয়েছেন। অধিকারের এক রিপোর্টে একথা বলা হয়েছে।[৩৫] ২০০৭ সালের জানুয়ারী থেকে ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ১৪ মাসে ঠাকুরগাঁও জেলার বিভিন্ন সীমান্তে বিএসএফ'র হাতে নিহত হয়েছে ১৩ জন হতভাগ্য বাংলাদেশী নাগরিক। ২০০৮

৩৩. বিএসএফ ও ভারতীয় দুর্বৃত্তদের হাতে প্রতি পাঁচদিনে একজন বাংলাদেশী নিহত হচ্ছে, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৪ মার্চ, ২০০৫, পৃ-১৬।

৩৪. চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্ত : ৫ বছরে বিএসএফ ও ঘোষ বাহিনীর হামলায় নিহত ২৪, দৈনিক সংগ্রাম, ১৯ মার্চ ২০০৫, পৃ-১, এবং পৃ-১৫।

৩৫. বিএসএফ প্রতি আড়াইদিনে ১ জন বাংলাদেশী হত্যা করছে, অধিকারের প্রতিবেদন, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২ মার্চ, ২০০৮, পৃ-১।



www.pathagar.com

সালের ১৮ই জানুয়ারী হরিপুর সীমান্তে বিএসএফ'র গুলিতে আনোয়ারুল হক নামে এক বাংলাদেশী যুবক নিহত হয়।[৩৬]

২০০৮ সালের ১৭ জুলাই থেকে ২০ জুলাই ৪ দিনে বিএসএফ চাঁপাইনবাবগঞ্জের রঘুনাথপুর সীমান্তে ২ বিডিআর ও ৩ বাংলাদেশীসহ মোট ৫ বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে। বিএসএফ এ হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে এমন এক সময় যখন বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় বিষয় নিয়ে দিল্লীতে সচিব পর্যায়ে বৈঠক চলছে।[৩৭] মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০০-২০০৭ পর্যন্ত ৭০৭ বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে বিএসএফ।[৩৮]

২২ এপ্রিল ২০০৯ রাতে সাতক্ষীরা সীমান্তে স্বামীকে গাছে বেঁধে রেখে বাংলাদেশী এক মহিলাকে বিএসএফ ধর্ষণ করে। প্রতিবাদ করায় স্বামীকে হত্যা করেছে পাষণ্ড বিএসএফ সদস্যরা। সাতক্ষীরার লক্ষ্মীদাড়ি সীমান্তের বিপরীতে ভারতের ঘোজডাঙ্গায় এ ঘটনা ঘটে।[৩৯] ৯ জুন ২০০৯ সকালে লাল মনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী ইসলামপুর সীমান্তে বিএসএফ'র গুলিতে সেলিম মিয়া নিহত হয়। তার বাড়ি ওই সীমান্তের জিরো পয়েন্ট এলাকাতেই। সীমান্তের ৮৪২ নং মেইন পিলারের নিকটেই সকালে হাটাহাটি করার সময় বিএসএফ'র টহল দল তাকে গুলি করে। ১০ জুন ২০০৯ বুড়িমারী সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিক সাজুকে বিএসএফ গুলি করে হত্যা করে। ২০০৯ সালের মে মাসেই বিএসএফ হত্যা করেছে ১০ বাংলাদেশীকে। জখম করেছে ৭ জনকে, অপহরণ করেছে ৩ জনকে আর ১১ জনকে পুশইন করেছে। আর সীমান্ত থেকে নিখোঁজ হয়েছে ৮জন। জানুয়ারী-জুন ২০০৯ এ ৬ মাসে বিএসএফ'র গুলিতে কমপক্ষে ৫০ জন বাংলাদেশী খুন হয়েছে। লালমনিরহাট সীমান্তে বিএসএফ'র সহায়তায় ভারতীয় দুষ্কৃতিকারীরা সীমান্ত এলাকা থেকে বাংলাদেশী গরু-ছাগল, এমনকি ক্ষেতের ধানও কেটে নিয়ে যায়। সাধারণ মানুষ নিজেদের সম্পদ রক্ষার সুযোগ পায় না।[৪০] বাংলাদেশের মানবাধিকার সংস্থা অধিকার তাদের এক রিপোর্টে

৩৬. গোলাম সরোয়ার সম্রাট, ঠাকুরগাঁও সীমান্তে বিএসএফ'র গুলিতে ১৪ মাসে ১৩ জন নিহত, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ৩ মার্চ ২০০৮, পৃ-১৬।

৩৭. বিএসএফ-'র বিডিআর হত্যা, (সম্পাদকীয়) দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২০ জুলাই ২০০৮, পৃ-৬।

৩৮. মানবাধিকার সংগঠন অধিকার এর রিপোর্ট, দৈনিক আমার দেশ, ২১ জুলাই ২০০৮।

৩৯. বাংলাদেশী গৃহবধুকে বিএসএফ'র ধর্ষণ, (সম্পাদকীয়), দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৫ এপ্রিল ২০০৯, পৃ-৬।

৪০. সীমান্তে বাংলাদেশীকে গুলি করে হত্যা, এ কেমন বন্ধুত্ব? (সম্পাদকীয়) দৈনিক আমার দেশ, ১০ জুন ২০০৯, পৃ-৬।



www.pathagar.com

বলেছে, ২০০৮ সালের জানুয়ারী থেকে ১৩ জুলাই পর্যন্ত বিএসএফ'র হাতে ১২১ জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছে। আর ২০০৯ সালের জানুয়ারী থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত বিএসএফ'র হাতে নিহত হয়েছে ৫৯ জন বাংলাদেশী। গত ১০ বছরে বিএসএফ ৮৪৮ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে। আহত হয়েছে ৬৪৬ জন। বিএসএফ'র হাতে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১৩ জন বাংলাদেশী নারী। ধরে নিয়ে যাওয়ার পর হদিস পাওয়া যায়নি এমন সংখ্যা ৭৪। ভারতের পক্ষ থেকে এসব হত্যাকাণ্ডের শিকারদের চোরাচালানি বলা হলেও তাদের অধিকাংশ নিহত হয়েছে বাংলাদেশের সীমান্তের অভ্যন্তরে। তাদের অনেকে নিহত হয়েছেন ধান ক্ষেতে কাজ করার সময়। নিছক বাংলাদেশীদের লক্ষ্য করে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি বর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। নিহতদের মধ্যে শিশু-কিশোররাও রয়েছে।[৪১]

২০০৯ সালে বিএসএফ'র ঘটানো প্রধান কয়েকটি হত্যাকাণ্ড হচ্ছে : ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ সাতক্ষীরা সীমান্তে ২ জন, সিলেট সীমান্তে ফুরকান ও নান্নু মিয়া নামক ২ জন, একই তারিখে বিয়ানী বাজার সীমান্তে ২ জন; ২৪ ফেব্রুয়ারী বিরামপুরে মমতাজ (২১); ২৭ ফেব্রুয়ারী দিনাজপুর সীমান্তে ২ জন; ৬ মার্চ তেতুলিয়ায় সামছুদ্দিন (৩০); ১৩ মার্চ নওগাঁ ও মহেশপুরে বারিক ও ওয়াকার নামক দুই কিশোর; ২১ মার্চ সাতক্ষীরা সীমান্তে বকুল হোসেন (১৮) ও সুলতান হোসেন; ৬ এপ্রিল কুড়িগ্রামে ইব্রাহীম (২৫); ৯ এপ্রিল দিনাজপুরে কাছিম উদ্দিন; ২১ এপ্রিল ঝিনাইদহে আবদুল খালেক (২৮); ৩ মে চাঁপাই সীমান্তে আমিরুল ইসলাম (৩০); ৫ মে বেনাপোল সীমান্তে মধুমিয়া (২৫); ২৪ এপ্রিল ঝিনাইদহে হারুন অর রশীদ (২২); ২৯ এপ্রিল নওগাঁয় ২ জন; ১২ জুন রুদ্রপুরে সাইদুর রহমান (২৮); ১৩ জুন বিরামপুরে মজিবুর রহমান (৩০); ১৮ জুন বুড়িমারিতে সেলিম মিয়া (৩৫); ২৮ জুন ছাগলনাইয়ায় বাহার (৩৫); ৬ জুলাই সাতক্ষীরায় মফিজুল (২৪); ৯ জুলাই শার্শায় সবুজ (২২), আহমদ (২০), আরিফুল ইসলাম (২৫) ও আবদুস সালাম (২২); ১১ জুলাই চাঁপাই-এ জমিরুল ইসলাম (২৪); ১২ জুলাই বিরামপুরে ২ জন; ৭ জুলাই পাঁচ বিবিতে হামিদ মন্ডল (৩২); ৩০ জুলাই চুয়াডাঙ্গায় মিজান (২২); ৪ অগাস্ট চাঁপাই-এ মতিউর রহমান (২৫), সুবেদ আলী (২৭); ৭ জুলাই বুড়িমারিতে ১ জন; ৯ অগাস্ট যশোরের গ্রভুলট সীমান্তে সবুজ (২২), আহমদ (২২), আরিফুল (২৫), আবদুল মান্নান (২২); ২৬ অগাস্ট বেনাপোলে এরশাদ আলী (৩২); ৯ সেপ্টেম্বর চাঁপাইয়ে মনির হোসেন (২৪), ১৪ সেপ্টেম্বর দিনাজপুর সীমান্তে ২ জন ও ১৭ সেপ্টেম্বর দিনাজপুর সীমান্তে ৫ জনকে হত্যা করা

৪১. আলফাজ আনাম, বেপরোয়া বিএসএফ, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৬ জুলাই ২০০৯, পৃ ১ এবং ১১।



www.pathagar.com

হয়েছে।[৪২] ৬ নবেম্বর কুড়িগ্রামে ছাগল খুঁজতে গিয়ে এক কিশোরী বিএসএফ'র হাতে নিহত হয়।[৪৩] ৬ অকটোবর সাতক্ষীরা বকচরা নদীতে মাছ ধরার সময় বিএসএফের স্পিড বোটের ধাক্কায় আনোয়ার নামের এক বাংলাদেশী নিহত হয়। ইচ্ছে করেই বিএসএফের স্পিড বোড এ ধাক্কা দেয়। দৈনিক কালের কণ্ঠের অনুসন্ধানে জানা যায় ২০০৯ সালে বিএসএফ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তে ৮৯ বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে। সবচেয়ে বেশি সাতক্ষীরা সীমান্তে ২২ জন, যশোর সীমান্তে ১৬ জন, ঝিনাইদহ সীমান্তে ৭ জন এবং চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে ৪ জনকে হত্যা করা হয়েছে।[৪৪] মানবাধিকার সংগঠন অধিকার জানিয়েছে ২০০৯ সালে বিএসএফ ৯৬ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে, বিএসএফ'র হাতে আহত হয়েছে ৭৯ জন। এছাড়া ২৫ জনকে অপহরণ করা হয়েছে। ৯২ জন নিখোঁজ রয়েছে।

২০১০ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে বিএসএফ'র গুলিতে মারা যায় ১৫ জন। গত ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১০ সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার নিজহাট ইউনিয়নের ডিবির হাওর এলাকা থেকে বিডিআর নায়েক মুজিবুর রহমানকে গুলি করে ধরে নিয়ে যায় বিএসএফ। ১৭ ফেব্রুয়ারী তামাবিল সীমান্তে বিএসএফ ও বিডিআর'র মধ্যকার পতাকা বৈঠকের পর বিএসএফ সদস্যরা নায়েক মুজিবরকে ফেরত দেয়। এছাড়া গত ২৬ ও ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১০ বিএসএফ সদস্যরা একই সীমান্ত এলাকায় প্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিকদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে।

জুন ২০১০ সীমান্তে অন্তত ৬টি স্থানে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে বিএসএফ। জানুয়ারী-জুন ২০১০ এ ৬ মাসে ৩৫ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১০ জনকে পিটিয়ে ও ২৫ জনকে গুলি করে হত্যা করে। এছাড়া বিএসএফ একই সময়ে ৪১ জনকে আহত করেছে। ৫ জুলাই ২০১০ সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার শ্রীপুর সীমান্তে বিএসএফ'র ছত্রছায়ায় ভারতীয় খাসিয়াদের গুলিতে ৫ বাংলাদেশী কৃষক আহত হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা যায়, ইউরোনিয়ামসহ দুর্লভ ও মূল্যবান বেশ কিছু খনিজ সম্পদ আবিস্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়ায় বিএসএফ সিলেটের সীমান্ত

---

৪২. বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশী হত্যাকাণ্ড বেড়েই চলেছে, সংগ্রাম রিপোর্ট, দৈনিক সংগ্রাম, ২৮ অকটোবর ২০০৯, পৃ-১, ২।

৪৩. বিএসএফ'র বাংলাদেশী হত্যা অব্যাহত, (সম্পাদকীয়) দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৮ নভেম্বর ২০০৯, পৃ-৬।

৪৪. ফখরে আলম, যশোর সংবাদদাতা, দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে বিএসএফ'র হত্যাকান্ড থেমে নেই, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১০ জানুয়ারী ২০১২, পৃ-৮।



www.pathagar.com

এলাকায় বিভিন্নভাবে আগ্রাসন চালাচ্ছে। ২০১০ সালের প্রথম ৬ মাসে সিলেট সীমান্তে সবচেয়ে অধিক সংখ্যক গুলি বর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।[৪৫]

২১ অকটোবর ২০১০ কুষ্টিয়া সীমান্ত থেকে ৫ জন বাংলাদেশীকে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ। ১৬ অকটোবর ২০১০ বিএসএফ'র হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় ৩ জন। নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার রংছাতি ইউনিয়নের সন্ন্যাসী পাড়া গ্রামের জসিম উদ্দিন নামে এক বাংলাদেশী কৃষক বিএসএফ'র গুলিতে নিহত হন। ফসলের জমি দেখতে গেলে বিএসএফ তাকে গুলি করে হত্যা করে। একই দিন চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার শিংনগর সীমান্তে বিএসএফ'র গুলিতে খুন হন বাংলাদেশী নাগরিক আবদুল লতিফ এবং পঞ্চগড় সীমান্তে ভারতীয় হায়েনাদের হাতে নিহত হন এক বাংলাদেশী নাগরিক। এর আগে ৫ অকটোবর ২০১০ শেরপুরের নালিতাবাড়ী সীমান্তে সাধন ঘোষ নামে অপর এক বাংলাদেশীকে গুলি করে হত্যা করে ভারতীয় পুলিশ। ঘটনার তিন দিন পর তার লাশ হস্তান্তর করা হয়। ১২ অকটোবর লালমনিরহাট সদর উপজেলার দুর্গাপুর সীমান্তে এক বাংলাদেশীর লাশ উদ্ধার করা হয়। বিএসএফ তাকে হত্যা করে রাতের অন্ধকারে লাশ ফেলে যায়। ১৮ অকটোবর ২০১০ কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মুন্সীগঞ্জ সীমান্ত থেকে ফারুক মিয়া, আশিক, ফারুক, সুমন আলী ও সুমন নামে ৫ নাগরিককে ধরে গেছে বিএসএফ। তাদের বাড়ি রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের মুন্সীগঞ্জ ভাঙ্গাপাড়া গ্রামে। গরুর জন্য খাবারের ঘাস কাটতে গেলে ভারতের নদিয়া জেলার হোলবাড়িয়া থানার কৃষাণ ক্যাম্পের টহলরত বিএসএফ সদস্যরা তাদেরকে আটক করে নিজ ক্যাম্পে নিয়ে যায়।[৪৬] ১২ ডিসেম্বর ২০১০ বিএসএফ সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রামের ইসমাইলের পুত্র কবিরুল ইসলাম (৩৪) কে কলারোয়া সীমান্তে গুলি করে হত্যা করে।[৪৭]২৪ ডিসেম্বর ২০১০ রাজশাহীর খানপুর সীমান্তে বিএসএফ'র নির্যাতনে এক গরু ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়।[৪৮]

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব মতে, ২০০৮ সাল থেকে ২০১১ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত তিন বছরে বিএসএফ'র হাতে ২৫৬ জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন। একই

৪৫. মুহাম্মদ রুহুল আমিন নগরী, সীমান্তে খুনীর ভূমিকায় বিএসএফ, নিষ্ফল বৈঠক এবং আমাদের করণীয়, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ২৩ জুলাই ২০১০, পৃ-৩।

৪৬. আলাউদ্দিন আরিফ, সীমান্তে লাশের মিছিল বাড়ছে প্রতিকারে গুলি চালানোর অনুমতি পায় না বিডিআর, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ২০ অকটোবর ২০১০, পৃ-১-২।

৪৭. দৈনিক সংগ্রাম, ১৭ ডিসেম্বর ২০১০, পৃ-১-২।

৪৮. দৈনিক আমার দেশ, ১৩ মার্চ ২০১১, পৃ-১৬, সরদার এম আনিসুর রহমানের রিপোর্ট।



www.pathagar.com

সময়ে আহত হয়েছেন ১৬৮ জন এবং ১৬৭ জনকে অপহরণ করা হয়েছে।[৪৯] ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০১১ ভোররাতে বেনাপোলের পুটখালি সীমান্তে বাংলাদেশী ব্যবসায়ী ইসরাফিলকে পিটিয়ে হত্যা করেছে বিএসএফ। ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে বিএসএফ'র গুলিতে ও শারীরিক নির্যাতনে মরা গেছে ৬৩ জন বাংলাদেশী। এর মধ্যে সাতক্ষীরা সীমান্তে ২৬ জন, যশোর সীমান্তে ২৫ জন, ঝিনাইদহে ৮ জন ও চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে ৪ জন নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে ২৯ জনকে গুলি করে এবং ৩৪ জনকে শারীরিক নির্যাতন ও বিদ্যুতের শক দিয়ে হত্যা করা হয়। এছাড়া প্রায় দুই শতাধিক মানুষকে গুলি ও নির্যাতন চালিয়ে আহত করা হয়েছে।[৫০]

**১.৫ সীমান্তের কাঁটাতারে নিস্পাপ কিশোরী ফেলানীর উপুড় হয়ে থাকা ঝুলন্ত লাশ**

এ যেন ভারতের কাঁটাতারের বেড়ায় নিরীহ ফেলানীর লাশ নয়, ঝুলছে বাংলাদেশ। বাবা-মায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তান মারা যাওয়ার পর ১৫ বছর আগে জন্ম নেয়া এই শিশুটি যাতে বেঁচে থাকে, সে আশা নিয়েই তার নাম রাখা হয়েছিল ফেলানী। বধূ বেশে স্বামীর ঘরে যাওয়ার মতো করে মেয়েকে নিজ হাতে সাজিয়ে দিয়েছিলেন মা জাহানারা বেগম। চারচালা টিনের ভাঙা বেড়ার ঘরে বসে সেই স্মৃতিই রোমন্থন করছিলেন মা জাহানারা বেগম। বলছিলেন, সঞ্চয় যা ছিল সব দিয়ে সোনা রূপার গয়নাও পরিয়ে দিয়েছিলাম ওকে। কিন্তু তার মেয়ে লাশ হয়ে ফিরেছে নিজের ঘরে। গত ৭ জানুয়ারী ২০১১ প্রত্যূষে কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী সীমান্তের দক্ষিণ অনন্তপুর হাজিটারী গ্রামের ৯৪৭/৩ এস আন্তর্জাতিক পিলারের কাছে ভারতীয় অভ্যন্তরের খেতাবেরকুটি এলাকায় নির্মমভাবে ঠাণ্ডামাথায় গুলি করে ফেলানীকে হত্যা করে বিএসএফ। ভারতের কুচবিহার জেলার দিনহাটা থানার চৌধুরীহাট ক্যাম্পের বিএসএফরা এই হত্যায় জড়িত ছিল।

**ফেলানীর লাশ যেভাবে উদ্ধার করা হয় :** নাগেশ্বরীর কাশিপুর বিজিবি[৫১] ক্যাম্পের কোম্পানী কমাণ্ডার আবদুল জব্বার মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের অনুসন্ধান দলকে জানান, গত ৭ জানুয়ারী আনুমানিক ৬টা ১৫ মিনিটে সংঘটিত ফায়ারের পরপরই অনন্ত পুর বিওপির বিজিবি টহলদল ঘটনাস্থলে যায়। কিন্তু ঘন কুয়াশার কারণে বিজিবি

---

৪৯. ২৮ জানুয়ারী ২০১১ রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত 'সীমান্ত নিরাপত্তাহীনতা ও আমাদের করণীয়' শীর্ষক মত বিনিময় সভায় মূল প্রবন্ধে এ তথ্য তুলে ধরা হয়। - দৈনিক সংগ্রাম, ২৯ জানুয়ারী ২০১১, পৃ-১২।

৫০. দৈনিক সংগ্রাম, ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১১, পৃ-১২।

৫১. বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ। বিডিআর-এর পরিবর্তিত নাম।



www.pathagar.com

সদস্যরা তৎক্ষণাৎ ফেলানীর লাশ দেখতে পায়নি। পরে সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে বিজিবি টহল দল কাঁটাতারের বেড়ার সঙ্গে বেশ উপরে নিহত ফেলানীর লাশ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। ওইদিন সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে বিএসএফ কাঁটাতারের বেড়া থেকে নিহত ফেলানীর লাশ নামিয়ে পশুর মত বাঁশে ঝুলিয়ে সুরতহাল ও ময়নাতদন্তের জন্য ভারতের কুচবিহারে নিয়ে যায়। আনুমানিক সকাল ১১টায় কোম্পানী কমান্ডার নায়েব সুবেদার মো. আবদুল জব্বার নিহতের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর লাশ ফেরত চেয়ে বিএসএফ'র কাছে চিঠি পাঠান এবং তাদের পতাকা বৈঠকের বসার অনুরোধ জানান। কিন্তু বিএসএফ'র পক্ষ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। ৮ জানুয়ারী সকাল ১১টায় বিজিবি-বিএসএফ'র মধ্যে পতাকা বৈঠক শুরু হয় এবং সকাল ১১টা ৫০ মিনিটে পতাকা বৈঠক শেষে বিএসএফ প্রায় ৩০ ঘণ্টা পর নিহত ফেলানীর লাশ হস্তান্তর করে।[৫২]

**ফেলানী পৈশাচিকতার শিকার** : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বাঁধন অধিকারীর লেখা "কাঁটাতারে ঝুলন্ত মানবাত্মা" ঘুমন্ত বিবেক বোধকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দেয়ার মতো। (১৭ জানুয়ারী দৈনিক আমার দেশ পাঠকমেলা) ফেসবুকে বাঁধনের বন্ধুরা বলছেন, 'কাঁটাতারে ঝুলছে বাংলাদেশ।' বাঁধন তার থেকে একটু সরে বলছেন, 'বাংলাদেশ না, কাঁটাতারে ঝুলছে মানবাত্মা। বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রটি মিডিয়া-মার্কেট-মিলিটারী যুগের বৈশিষ্ট্যকে বুকে ধারণ করে ভারত নামের রাষ্ট্রটির সঙ্গে সে স্বার্থগত বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, ঋণচুক্তি-ট্রানজিট-টিপাইমুখ-পানি নিয়ে ভারতীয় সাম্রাজ্যের যে আগ্রাসন, সবকিছুকে ছাপিয়ে ওই মানবাত্মার কান্নার ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি আমি। ওই মানবাত্মা আমার; সে ভারত বোঝে না, সে বিএসএফ বোঝে না, পরিবর্তিত নামে আবির্ভূত হওয়া বর্ডার গার্ড বোঝে না।'

বাঁধন আরও লিখেছেন, 'কেন পানি পানি বলে চিৎকার করেছিল ফেলানি? পানির ন্যায্য হিস্যা আমরা ভারতের কাছ থেকে আদায় করতে পারিনি, পারিনি আমরা দুর্বল রাষ্ট্র বলে, সে কি ফেলানি জানত না?

ফেলানি দেশের শাসন ব্যবস্থাকে ধিক্কার দিয়েছে, দেশকে নয়। তাই তো মাটির টানে ছুটে আসছিল ১৫ বছরের কিশোরী বউ সাজার স্বপ্ন নিয়ে। দেশে ফেরার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, তার সে স্বপ্নের কবর রচনা করেছে বন্ধুদেশের শত্রুরা।

ফেলানির লাশ! কবি হাসান হাফিজের লেখা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় বাঙালির বন্ধু পিরিতির কথা।

---

৫২. দৈনিক আমার দেশ, ৬ মার্চ ২০১১, পৃ-৪.।



www.pathagar.com

কবি হাসান হাফিজের ভাষায়–'ফেলানির বাবার দীর্ঘশ্বাস আছড়ে আছড়ে হারিয়ে যায় নিষ্ঠুর চরাচরে। বিএসএফ'র নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশ সরকার এ ঘটনার কোনো প্রতিবাদ করেছে বলে শুনিনি। ফেলানির জীবন কিছুতেই ফিরে পাওয়া যাবে না। অন্তত প্রতিবাদটুকু করা হলে আমরা সামান্য হলেও সান্ত্বনা পেতাম।'

ফেলানির লাশ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় বাঙালির অসহায়ত্বের কথা। ফেলানির ঝুলন্ত লাশ এবং মর্মস্পর্শী মৃত্যু বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রীকে ধিক্কার দিয়ে চিনিয়ে গেল কাঁটাতারে ঘেরা সীমানার ভয়াবহতার কথা।[৫৩] ড. তারেক শামসুর রেহমান লিখিত 'যে মৃত্যু বন্ধুত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে' শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধ। এর কিছু অংশ তুলে ধরছি– 'ফেলানি এ দেশের আলো-বাতাসে বেড়ে ওঠা এক কিশোরীর নাম। ঝুলে ছিল লাশ হয়ে, কাঁটাতারের বেড়ায়। ১৪ বছরের ফেলানির বিয়ের পিঁড়িতে বসার কথা ছিল পরদিন। কিন্তু বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হলো না ফেলানির। লাশ হয়ে ঝুলে থাকল কয়েক ঘণ্টা। ৮ জানুয়ারিতে লাল পায়জামা পরা লাশ হয়ে ঝুলে থাকা ফেলানির ছবি দৈনিক নয়া দিগন্তে যারা দেখেছেন, তাদের হৃদয় কতটুকু হাহাকার করে উঠেছিল, আমি বলতে পারব না। কিন্তু আমার চোখে পানি এসেছিল। আমি কেঁদেছি। কেঁদেছি ফেলানির জন্য, আমার মেয়ের মতো যার বয়স। ফেলানি এক টুকরো বাংলাদেশ। বিএসএফ'র গুলিতে প্রাণ দিয়েছিল ফেলানী।[৫৪]

ফেলানি কোনো লাশের নাম নয়। ফেলানি কোনো ফেলনা নাম নয়। ফেলানি মানে-বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখা। ফেলানি মানে একখণ্ড সবুজ ভূমি। ফেলানি বাংলাদেশের মানচিত্রের নাম। ফেলানি মানে-রক্তাক্ত জাতির পতাকা। ফেলানি মানে– একটি ছোট দেশ, নাম বাংলাদেশ।[৫৫]

ফেলানির নির্মম হত্যাকাণ্ডের পরও বিএসএফ'র বর্বরতা থেমে থাকেনি। ১৪ মার্চ ২০০১ বিএসএফ মৌলভী বাজারের চাতলাপুর স্থলবন্দরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে দুই ট্রাক চালক ও এক হেলপারকে নির্মম নির্যাতন করে।[৫৬] ১০ মার্চ ২০১১ চাঁপাইনবাবগঞ্জের পবা উপজেলার খানপুর সীমান্তে বিএসএফ'র গাড়ি চাপায় ২ বাংলাদেশী নিহত, ১৭ জন আহত হয়।[৫৭] ২৫ মার্চ ২০১১ সব সংবাদ পত্রে প্রকাশিত

---

৫৩. বিউটি আকতার হাসু, ফেলানি : পৈশাচিকতার শিকার, দৈনিক আমার দেশ, ২০ জানুয়ারী, পৃ-৯।
৫৪. উদ্ধৃত বিউটি আকতার হাসু, পূর্বোক্ত, পৃ-৯।
৫৫. বিউটি আকতার হাসু, পূর্বোক্ত, পৃ-৯।
৫৬. দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৬ মার্চ ২০১১, পৃ-২।
৫৭. দৈনিক নয়াদিগন্ত রিপোর্ট, ১২ মার্চ ২০১১, পৃ-২।


www.pathagar.com

খবরে জানা যায়, জাতীয় সংসদে উত্থাপিত প্রশ্নোত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন জানান, আওয়ামী মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এ পর্যন্ত (২৬ মাস) বিএসএফ'র গুলি বর্ষণে ১৩৬ জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন। বিএসএফ'র গুলিতে একই সময়কালে আহত হন ১৭০ বাংলাদেশী।[৫৮] ৬ মে ২০১১ কুড়িগ্রামের রাজীবপুর সীমান্তে আন্তর্জাতিক মেইন পিলার ১০৭৩-এর কাছ থেকে বিএসএফ সদস্যরা রউফ মিয়া নামে এক কৃষককে অপহরণ করে। ৭ মে ২০১১ দিনাজপুর সদর উপজেলার খানপুর গ্রামের ফয়জুর রহমানের ছেলে হাফিজুর রহমানকে (৩০) সুন্দরা বিওপির প্রধান পিলার ৩১৬ এর সাব পিলার-৪ এর বিপরীতে বিএসএফ সদস্যরা গুলি করে হত্যা করে। এর আগে ১৮ এপ্রিল ২০১১ সাতক্ষীরা জেলার গাজীপুর সীমান্তে বিএসএফ'র গুলিতে মারা যায় রেকাতুল ইসলাম নামের এক যুবক। ১৬ জুন যশোরের শার্শা উপজেলার ধান্যখোলা গ্রামের কয়েকজন যুবককে আটক করে বেদম পেটানোর পর বিএসএফ সদস্যরা তাদের শরীরে ইনজেকশনের মাধ্যমে পেট্রোল ঢুকিয়ে দেয়, ২৮ জুন ২০১১ মিজানুর রহমান নামে ১৮ বছরের এক যুবককে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয়। ২ জুলাই সিলেটের ভোলাগঞ্জ সীমান্তে এক যুবককে গুলি করে হত্যা করে বিএসএফ। ২২ জুলাই ভোরে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ঠাকুরপুর সীমান্তে বিএসএফ সেলিম হোসেন (২৫) নামে এক বাংলাদেশী কৃষককে হত্যা করে। ভোরে সীমান্ত সংলগ্ন নিজ জমিতে ঐ কৃষক কাজ করতে গেলে বিএসএফ তাকে পেটাতে পেটাতে ভারতের অভ্যন্তরে নিয়ে যায়। ২৫ জুলাই বুড়িমারী সীমান্তে রফিকুল ইসলাম নামের এক বাংলাদেশীকে বিএসএফ ধারাল অস্ত্র দিয়ে খুঁচিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে সানিয়াজন নদীতে লাশ ভাসিয়ে দেয়।[৫৯] জুলাই ২০১১ মাসে ৩ জন বাংলাদেশী বিএসএফ'র হাতে নিহত হয়।[৬০] ২৪ অগাস্ট ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর সীমান্তে বিএসএফ বাবুল হোসেন নামের এক বাংলাদেশীকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করে। বিকালে স্থানীয় লোকজন নাগর নদী থেকে তার লাশ উদ্ধার করে। ১৫ অকটোবর ২০১১ দিনাজপুরের হিলি সীমান্তে বিএসএফ'র পাথর নিক্ষেপে সুমন (১৫) নামের এক বাংলাদেশী বালক গুরুতর আহত হয়। এ ঘটনা প্রসঙ্গে সুমনের বড় ভাই বিপ্লব

৫৮. উদ্ধৃত ড. মাহফুজ পারভেজ, সীমান্ত সমাচার, দৈনিক আমার দেশ, ২৯ মার্চ ২০১১, পৃ-৭। আরো দেখুন, দৈনিক সংগ্রাম, ২৫ মার্চ ২০১১, পৃ-১।

৫৯. বাংলাদেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চাইলে ভারতকে সীমান্তে বাংলাদেশীদের হত্যা বন্ধ করতে হবে। (সম্পাদকীয়), সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ২৯ জুলাই ২০১১, পৃ-৬।

৬০. নাজমুল ইসলাম মকবুল, দেশে চলছে দানবাধিকার, দৈনিক আমার দেশ, ১৬ অগাস্ট ২০১১, পৃ-৬।



www.pathagar.com

জানায়, তার ভাই যখন সীমান্তের বাংলাদেশ অংশে দাঁড়িয়ে ছিল তখনই এক বিএসএফ সদস্য তাকে পাথর ছুঁড়ে জখম করে।

১৬ ডিসেম্বর ২০১১ কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ি সীমান্তে বিএসএফ'র বোমার আঘাতে আনোয়ার হোসেন (২৭) নামে এক বাংলাদেশী নিহত হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছে মোহর আলী নামক আরো একজন। ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের ৪০ বছর উদযাপনের সময় বিএসএফ'র গুলিতে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহেব বাড়িয়া সীমান্তে নিহত হয়েছে এক বাংলাদেশী। একই দিন কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার চরগোড়ক মন্ডপ সীমান্তে বিএসএফ'র গুলিতে দুই বাংলাদেশী নাগরিক আহত হয়েছেন। ১৭ ডিসেম্বর কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ি সীমান্তে বিএসএফ'র গুলিতে আলমগীর হোসেন (২৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।[৬১]

## সারণী -২

বিএসএফ'র হাতে নিহত এবং আহত বাংলাদেশী নাগরিকদের বছর ওয়ারী হিসাব (২০০২-২০১১

| সন | নিহত | আহত | আক্রমণ ও গোলাগুলির ঘটনা |
|---|---|---|---|
| ২০০২ | ১০৫ | ৯৩ | |
| ২০০৩ | ৪৩ | ৪৭ | |
| ২০০৪ | ১৩৫ | ৯৭ | |
| ২০০৫ | ১০৪ | ৯৩ | |
| ২০০৬ | ১৪৬ | ১৩৩ | |
| ২০০৭ | ১২০ | ১০৩ | |
| ২০০৮ | ৬২ | ৪৭ | |
| ২০০৯ | ৯৮ | ৭৯ | ১০০ |
| ২০১০ | ৭৪ | ৮৭ | ৩৭ |
| ২০১১ | ৭৫ | ৬৫ | ২৭ |

তথ্য : বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের উপস্থাপিত তথ্যানুসারে তৈরি।

সময়ের সাথে সাথে বিএসএফ'র দ্বারা হত্যা-গুম-নির্যাতন বেড়েই চলেছে। এর শিকার

৬১. আলাউদ্দিন আরিফ, মহাজোটের তিন বছরে সীমান্তে নিহত ২০০, দৈনিক আমার দেশ, ১৮ ডিসেম্বর ২০১১, পৃ-৪।



www.pathagar.com

হচ্ছেন নিরীহ বাংলাদেশী নাগরিক। অবশ্য অতি সম্প্রতি এক বিজিবি সদস্যও অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। তাকে পিটিয়ে আধমরা করে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে সম্প্রতি হাবিবুরকে উলঙ্গ করে ৫ ঘণ্টাব্যাপী নির্যাতনের ঘটনাটি সকলের মনে নাড়া দিয়েছে। বিএসএফ সদস্যরা ২০১১ সালের ৯ ডিসেম্বর হাবিবুর রহমান হাবু নামের যুবকের ওপর যে নারকীয় নির্যাতন চালায় তা বর্ণনা করার মতো নয়। এটি ভারতের এনডিটিভি চ্যানেলে প্রথম প্রচারিত হয়। প্রকাশিত ভিডিওতে দেখতে পাওয়া যায় হাবিবুরকে উলঙ্গ করে নিষ্ঠুর নির্যাতনের চিত্র। এ নির্যাতন দেখে মনে হয় তা গুয়ানতানামো-বে কারাগারের নির্যাতনকেও হার মানাবে। কিভাবে একটি দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী অন্য দেশের নিরীহ মানুষের ওপর এভাবে নির্যাতন চালায়? আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল এ ব্যাপারে বলছে, 'বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর বিএসএফ'র অত্যাচারের যে ভিডিও প্রচারিত হয়েছে, তা অবশ্যই মেনে নেয়ার মতো নয়। সীমান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা যে কতটা ব্যাপক, এ ঘটনা তার আভাস মাত্র'।[৬২]

মুহাম্মদ রেজাউর রহমান লিখেছেন, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ সীমান্তবর্তী এলাকার সকল মানুষকেই সন্দেহের চোখে দেখে এবং মনে করে যে তারা জঙ্গি, চোরাকারবারী বা তাদের সহযোগী। ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত নির্মিত কাঁটাতারের বেড়া ডিঙ্গাতে গিয়ে বাংলাদেশী কিশোরী ফেলানী বিএসএফ'র গুলিতে প্রাণ হারায়। তার মৃতদেহ দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা কাঁটাতারে ঝুলে থাকার খবর ভারতীয় ও বিশ্বগণমাধ্যমে প্রচারিত হলে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নির্মম বাস্তবতা অসংখ্য ভারতীয় ও বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর পরই বিশ্ব গণমাধ্যমে গত এক দশকে প্রায় এক হাজার বাংলাদেশী ভারতীয় বিএসএফ'র গুলিতে নিহত হওয়ার হিসাব স্থান লাভ করে। ভারতের বহুল প্রচারিত ইংরেজি দৈনিক 'দি হিন্দু' গত ২৪ জানুয়ারি সীমান্তে বর্বরতা শীর্ষক সম্পাদকীয়তে যে ঘটনার নিন্দা করেছে তা হলো– ভারতের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র হাতে বাংলাদেশী এক যুবক হাবিবুর রহমানের নিগৃহীত হওয়ার বিবরণ। যে অমানবিক, অশালীন ও বর্বর পন্থায় বিএসএফ তাকে বিবস্ত্র করে অমানবিক নির্যাতন করেছে, সে ঘটনার ভিডিও এর আগে ইউটিউব এবং এনটিডিটিভিতে প্রচারিত হয়। এগুলো উল্লেখ করে পত্রিকাটিতে লেখা হয় উক্ত বর্বর ঘটনার জন্য ভারতের উচিৎ বাংলাদেশের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করা।

---

৬২. মো. মেফতাউল ইসলাম, সীমান্তে বাংলাদেশী হত্যা ও পরাস্ত কূটনীতি, দৈনিক সংগ্রাম, ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১২, পৃ-৪।



www.pathagar.com

সম্পাদকীয়টিতে ২০১২ সালের জানুয়ারী মাসে বিএসএফ কর্তৃক সীমান্তে তিনজন বাংলাদেশীকে গুলি করে হত্যার ঘটনারও উল্লেখ করা হয় এবং মন্তব্য করা হয় যে, এসব ঘটনায় বাংলাদেশে ভারত বিদ্বেষী মনোভাব বেড়েই চলেছে। বিএসএফ তাদের খেয়ালখুশি মতো নিরীহ ও নিরস্ত্র বাংলাদেশীদের হত্যা করে চলেছেন বলেও পত্রিকাটিতে বলা হয়। আরো বলা হয় যে, ২০১১ সালের মার্চে বিএসএফ ও বিজিবির মহাপরিচালকদের যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সীমান্তে বিএসএফ গুলি করা থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু বিএসএফ সদস্যরা তা মানছে না বলে উল্লেখ করে সম্পাদকীয়টিতে বলা হয় যে, বিএসএফ সদস্যদের এমন কিছু করা ঠিক হবে না যাতে বাংলাদেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়।[৬৩]

বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশী যুবক হাবিবুর রহমানকে অমানুষিক নির্যাতন করার পর একাধিক হত্যার ঘটনাও ঘটানো হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিংনগর সীমান্ত থেকে বাংলাদেশী সাজ্জাদ হোসেন বাবুকে অপহরণ করে বিএসএফ জওয়ানরা। অপহরণের ২০ দিন পর বাবুর লাশ পাওয়া যায় পদ্মা নদীতে। তার সারা গায়ে ছিলো অমানুষিক নির্যাতন চিহ্ন। হাত দুটি ছিলো পিছনে বাঁধা।

এ ছাড়া কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারী সীমান্তে নিহত আরেক বাংলাদেশী যুবক আবদুল লতিফ লেবুর লাশ ৯ দিন পর হস্তান্তর করেছে বিএসএফ।

বিগত ২০ জানুয়ারি কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার দলকুইয়া সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় চোরাচালানী শাহ আলমকে হত্যা করা হলে তার সহযোগীরা বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের হাবিলদার লুৎফর রহমানকে বিএসএফ'র উস্কানিতে বেধড়ক মারধোর করে এবং তাকে জোরপূর্বক ধরে ভারতীয় এলাকায় নিয়ে যায়। পরে তারা তাকে বিএসএফ'র কাছে হস্তান্তর করে। অপহৃত হাবিলদারকে ফিরিয়ে আনার জন্য ওইদিনই বিএসএফ ও বিজিবির মধ্যে অধিনায়ক পার্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অপহৃত হাবিলদারকে পরের দিন রাত ৩টার সময় অমানবিক নির্যাতনের ফলে মারাত্মক আহত অবস্থায় ফেরত দেয়া হয়।[৬৪]

ড. কে এ এম শাহাদাত হোসেন মন্ডল লিখেছেন, সম্প্রতি সীমান্তে বাংলাদেশী এক যুবকের ওপর ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র বর্বর নির্যাতনের ভিডিও চিত্র ভারতীয় টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচারিত হলে তা বাংলাদেশে ব্যাপক নিন্দা ও তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে। নির্যাতিত বাংলাদেশী যুবকটি হলো চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ

---

৬৩. মুহাম্মাদ রেজাউর রহমান, মৃত্যুর দেয়াল সমাচার, দৈনিক ইনকিলাব, ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১২, পৃ-৯।
৬৪. মুহাম্মাদ রেজাউর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ-৯।



www.pathagar.com

উপজেলার দুর্লভপুর ইউনিয়নের সতের রশিয়া গ্রামের সাইদুর রহমানের পুত্র হাবিবুর রহমান (২২)। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ৯ ডিসেম্বর হাবিবুর রাজশাহী পবা উপজেলার খানপুর সীমান্ত দিয়ে গরু আনার জন্য ভারতে যান। সেখানে গরু না পেয়ে ফিরে আসার সময় ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার রানীনগর ক্যাম্পের বিএসএফ জওয়ানরা রাত ১১টার দিকে তাকে ধরে ফেলে। হাবিবুরের ভাষায়, তার কাছে মোবাইল ফোন সেট, টর্চলাইট ও এক হাজার টাকা দাবি করে বিএসএফ সদস্যরা। এসব দিতে হাবিবুর রহমান অসম্মতি জানালে তাকে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে ৬/৭ জন জওয়ান তাকে নির্মমভাবে মারধর করে। সকালেও মারধর চলে। এক পর্যায়ে তার পরনের লুঙ্গিও খুলে নেয় তারা। বিএসএফ জওয়ানরা তাকে উলঙ্গ করে নির্মমভাবে লাঠিপেটা করে ও লাথি মারে। এক পর্যায়ে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে ক্যাম্পের কাছে একটি সরিষা ক্ষেতে তাকে ফেলে রাখে বিএসএফ জওয়ানরা। পরে জ্ঞান ফিরলে সীমান্ত পেরিয়ে দেশে ফিরেন। বাড়িতে এসে গোপনে চিকিৎসা নেন হাবিবুর। তার শরীরে এখনও নির্যাতনের ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র পৈশাচিক নির্যাতনের চিত্র এবার খোদ ভারতীয় মিডিয়াতেই প্রচারিত হয়েছে। বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশী যুবককে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে যে নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে তার ভিডিও চিত্র গত ১৮ জানুয়ারি ভারতীয় টিভি চ্যানেল এনডি টিভিসহ কয়েক টেলিভিশনে প্রচার করা হয়, যার ধারবাহিকতায় তা বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন মিডিয়াতে চলে আসে এবং প্রচারিত হয়। এরপর সারা ভারতেও এ নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে ভিডিও চিত্রসহ এ খবরটি বারবার সম্প্রচার করা হয়। এছাড়া ভারতে বিখ্যাত সংবাদপত্র দি হিন্দু, টাইমসের মত বিভিন্ন পত্রিপত্রিকায় গুরুত্বের সাতে এ খবর ছাপ হয়। ভিডিও চিত্রে দেখা যায়, আটক বাংলাদেশী যুবককে হাত-পা বেঁধে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে বিএসএফ সদস্যরা বেধড়ক লাঠি দিয়ে পেটায়, লাথি মারে, বুকের ওপর বুট দিয়ে চাপ মারতে এবং নিরীহ মানুষের উপর বর্বর নির্যাতন করতে খুব সুখ আনন্দ পায়।[৬৫]

সম্প্রতি প্রকাশিত মানবাধিকার কমিশনের জরিপ রিপোর্টে জানা যায় ২০১২ সালের জানুয়ারী থেকে জুন মাস পর্যন্ত সময়কালে বিএসএফ'র গুলিতে নিহত হয় ৩৪ জন

---

৬৫. ড. কে. এম. শাহাদাত হোসেন মন্ডল, সীমান্তে বিএসএফ'র নির্যাতন : মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন, দৈনিক ইনকিলাব, ৯ ফেব্রুয়ারী ২০১২, পৃ-৯।



www.pathagar.com

বাংলাদেশী।[৬৬] একই সময়কালে বিএসএফ'র আক্রমণে আহত হয়েছেন ৪৮ জন বাংলাদেশী এবং অপহৃত হয়েছেন ২৫ জন। এ হিসাব দিয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার'।[৬৭] ২ জুলাই ২০১২ সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার বেড়াগাছী সীমান্তের মেইন ১৩-এর সাব ৬নং পিলারের বিপরীতে বিএসএফ সদস্যরা আলতাফ হোসেন (২৩) নামের এক বাংলাদেশীকে গুলি করে হত্যা করে। এ সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে পঞ্চা উদ্দিন ঢালি (২৩) নামের আরেক বাংলাদশী আহত হয়। একই দিন বেনাপোলের দৌলতপুর সীমান্তে বিএসএফ'র গুলিতে এক বাংলাদেশী নিহত হয়। ১ জুলাই ২০১২ ঠাকুরগাঁও হরিপুর উপজেলার ডাবরী সীমান্তে বিএসএফ'র গুলিতে আবু তাহের (২৮) ও এনামূল (২৫) নামে দুই বাংলাদেশী গুরুতর আহত হয়েছেন। একই দিন হরিপুর উপজেলার তিন বাংলাদেশী বশির, রমজান আলী কচু ও গোলাম হোসেনকে বিএসএফ ধরে নিয়ে গেছে বলে জানা গেছে।[৬৮] ৫ জুলাই ২০১২ বিএসএফ শ্রীমঙ্গল উপজেলার সিন্দুর খান সীমান্ত থেকে শফিকুল ইসলাম (৩৮) ও সুব্রত তাঁতী (৩০) নামের দুই বাংলাদেশীকে ধরে নিয়ে গেছে।[৬৯] গত ২ জুলাই ২০১২ কুড়িগ্রাম জেলার নারায়ণপুর সীমান্তবর্তী এলাকায় বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করতে গিয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য মোঃ জাফর আলী, কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক জনাব হাবিবুর রহমান এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যান নাজমুল হোসেনসহ সাত সদস্যের একটি টীম বিএসএফ'র হাতে গ্রেফতার হন। ভারতের মসলাবাড়ি ক্যাম্পের বিএসএফ জওয়ানরা তাদের আটক করে। পরে বিজিবির পক্ষ থেকে বিএসএফ'র উচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগ ও দেন দরবার করার পর তারা ছাড়া পেয়েছেন। বিএসএফ কর্তৃক তাদের গ্রেফতার অত্যন্ত অপমানজনক বলে বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ায় মন্তব্য করা হয়েছে।[৭০] ৮ জুলাই ২০১২ দৈনিক ইনকিলাব জানিয়েছে বিএসএফ'র হাতে বিনাদোষে ২০০০ সালের ১১ ডিসেম্বর রাতে আটক কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী উপজেলার সদর

---

৬৬. মানবাধিকার কমিশনের জরিপ রিপোর্ট, দৈনিক সংগ্রাম, ৮ জুলাই ২০১২, পৃ ১, ২।

৬৭. বিস্তারিত দেখুন দৈনিক আমার দেশ, ২ জুলাই ২০১২, পৃষ্ঠা-১, ১৫।

৬৮. বিএসএফ'র গুলিতে কলারোয়া ও বেনাপোলে ২ বাংলাদেশী নিহত, হরিপুরে আহত ২, ডেস্ক রিপোর্ট, দৈনিক আমার দেশ, ৩ জুলাই ২০১২, পৃষ্ঠা-১, ৪।

৬৯. দৈনিক সংগ্রাম, ৮ জুলাই ২০১২, পৃষ্ঠা-১।

৭০. বিএসএফ'র হাতে জেলা প্রশাসক ও এমপির গ্রেফতার প্রসঙ্গ, সম্পাদকীয়, দৈনিক সংগ্রাম, ৭ জুলাই ২০১২, পৃষ্ঠা-৪।



www.pathagar.com

ইউনিয়নের কামাত আঙ্গারীয়া গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেনের বড় ছেলে আশিক ইকবাল মিল্টন ভারতীয় কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে জীবনের বারটি বছর কাটিয়ে গত ৭ জুলাই দুপুরে বাংলাদেশে ফিরেছে। মুক্তি পাওয়া মিল্টন জানান, আমার জীবনের ১২টি বছর হারিয়ে গেছে। আমি এর সুষ্ঠু বিচার চাই।[৭১]

## ১.৬ সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিক হত্যা-নির্যাতনের নানাবিধ ভারতীয় কৌশল

বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় লোকজন আরও বেশি ভীত, আতঙ্কগ্রস্ত ও অনিরাপত্তার মধ্যে বসবাস করছে। বিএসএফ'র উস্কানিমূলক ও আক্রমণাত্মক কর্মকাণ্ডে সীমান্তে বসবাসকারী মানুষের জীবন ও জীবিকা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের তিনদিকে ভারতীয় সীমান্ত। বিশাল সীমান্তে মানুষ নানাবিধ সমস্যা মুকাবিলা করে কোন রকমে টিকে আছে। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ, নিরীহ-নিরপরাধ মানুষজনকে ধরে নিয়ে যাওয়া, গবাদিপশু আটক, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে বাড়িঘরে হামলা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বিএসএফ অবলীলায় করে যাচ্ছে। সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিক হত্যা-নির্যাতনে বিএসএফ বহুবিধ নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করছে। এ কৌশলগুলো নৃশংস, পৈশাচিক, বর্বর ও অমানবিক।

**ভারতীয় বিএসএফ'র হত্যা-নির্যাতনের কৌশলগুলো নিম্নরূপ :**

১. বাংলাদেশীদেরকে পাখির মত নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা/খুন,
২. কুপিয়ে হত্যা,
৩. শ্বাসরোধ করে হত্যা,
৪. সীমান্ত নদীতে ডুবিয়ে হত্যা,
৪. পাথর ছুড়ে আহত করা ও হত্যা করা- বোল্ডার নিক্ষেপ করে অজ্ঞান করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া।
৫. বেদম পিটানো- কাঁটা তারের বেড়ার সঙ্গে বেঁধে লাঠি দিয়ে মারপিট-পিটিয়ে হত্যা,
৬. বোমা নিক্ষেপ করে হত্যা,
৭. তীর, ধনুক নিক্ষেপ করে আহতকরণ ও হত্যা,
৮. মারপিটের পাশাপাশি নিতম্বে ইনজেকশন পুশ করা। ইনজেকশনের মাধ্যমে

---

৭১. বিনাদোষে আটক মিল্টন ফিরেছে, ভুরুঙ্গামারী থেকে এমদাদুল হক মন্টুর রিপোর্ট, দৈনিক ইনকিলাব, ৮ জুলাই ২০১২, পৃষ্ঠা-১, ১২।



www.pathagar.com

শরীরে পেট্রোল ঢুকিয়ে দেয়া। এর ফলে অসহ্য যন্ত্রণার শিকার হন বাংলাদেশীরা,

৯. বৈদ্যুতিক শক দিয়ে অমানবিক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা। গোপন অঙ্গে ইলেকট্রিক শক দেয়া,

১০. বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা,

১১. ধর্ষণ- সীমান্তে বসবাসকারী বাংলাদেশী গৃহবধু নারী ও কন্যা শিশুরা বিএসএফ ও ভারতীয়দের ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। প্রতিবাদ করায় স্বামীকে হত্যা করা হচ্ছে,

১২. বিএসএফ'র গাড়িচাপায় বাংলাদেশী হত্যা,

১৩. হাত পায়ের রগ কেটে সীমান্ত সংলগ্ন নদীতে ফেলে দেয়া,

১৪. স্পীড বোটের ধাক্কা দিয়ে বাংলাদেশীদের হত্যা-সীমান্ত নদীতে বাংলাদেশী অংশে মাছ ধরার সময় স্পীড বোটের ধাক্কা দিয়ে বহু বাংলাদেশীকে হত্যা করা হয়েছে।

১৫. সীমান্তজুড়ে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ,

১৬. সীমান্তে সার্বক্ষণিক আতঙ্কজনক পরিস্থিতি তৈরি করে রাখা,

১৭. যখম-আঘাতে আঘাতে নিহত বাংলাদেশীদের পাওয়া যাচ্ছে,

১৮. খুনের পাশাপাশি বিএসএফ অপহরণের পথও বেঁছে নিয়েছে,

১৯. লুট ও ছিনতাই এর অসংখ্য ঘটনা ঘটছে,

২০. ধারাল অস্ত্র দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে সীমান্ত নদীতে লাশ ভাসিয়ে দেয়া,

২১. পানিতে ডুবিয়ে নির্মম নির্যাতন,

২২. ধরে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন করে হত্যা করা,

২৩. মর্টার নিক্ষেপ, প্যারাসুট সেল নিক্ষেপ করে গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেয়া ও আতংক সৃষ্টি করা,

২৪. বাংলাদেশের তরুণ সমাজকে ধ্বংসের জন্য সীমান্ত জুড়ে শত শত ফেনসিডিল কারাখানা স্থাপন করেছে। এ মাদক দ্রব্য বাংলাদেশে চোরাচালানের ফলে এদেশের লাখ লাখ যুবক মাদকাসক্ত হয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে,

২৫. পণ্যবাহী ট্রাক চালকদের মাধ্যমে বাংলাদেশে এইডস ছড়ানোর ঝুঁকি,

২৬. বাংলাদেশীদের ধরে নিয়ে গিয়ে যৌনাঙ্গে পেট্রল ঢেলে অভিনব কায়দায় নির্যাতন,

২৭. নির্যাতিতরা করুণা চায়, করুণার বদলে বিএসএফ ও ভারতীয়রা হাসি, ঠাট্টা, তামাশা, বিদ্রুপ ও উল্লাস প্রকাশ করে,

২৮. সীমান্ত নদীতে টহল গান বোট থেকে ধাক্কা দিয়ে বাংলাদেশী যাত্রীবাহী নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে মানুষ হত্যা।



www.pathagar.com

প্রতিবেশী দেশের সাধারণ মানুষকে সীমান্তে পেলেই গুলি করে মেরে ফেলা কিংবা অন্যকোনভাবে হত্যা করার মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। হত্যা হত্যাই। সেটা যেভাবেই ঘটুক। সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের এমন কোন গ্রাম নেই যেখানে বাংলাদেশীরা বিএসএফ'র আগ্রাসনের শিকার হয়নি। তাদের সময় কাটে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর মৃত্যুর বিভিষিকার মধ্যে।

## ১.৭ সীমান্ত সন্ত্রাসের বিরোধিতা খোদ ভারতেই

সীমান্তে বিএসএফ'র সন্ত্রাস হানাদারি নিত্য ঘটনায় পরিণত হয়েছে। ভারতের তরফ থেকে বারবার আশ্বাস দেয়ার পরও ভারতীয় এই বাহিনীর সন্ত্রাস অব্যাহত আছে। বিএসএফ সদস্যদের অমানবিক আচরণে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন খোদ ভারতের দু'জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। তাঁদের মতে, এটি একটি জঘন্য অপরাধ এবং চরম লজ্জাজনক। প্রতিবেশী দেশে এই ঘটনায় ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষ বাড়বে। এতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নষ্ট হবে। কয়েকজন বিএসএফ জওয়ানের জন্য এ ধরনের সম্পর্কের প্রভাব খুবই আশঙ্কার বিষয়। এখনই দ্রুত এ রকম ঘটনা রুখতে না পারলে ভবিষ্যতে আরো বড় ধরনের অপরাধ সংঘটিত হবে। কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জির[৭২] বক্তব্য অত্যন্ত দুঃখজনক ও উদ্বেগের কারণ। তিনি বলেন, বিএসএফ'র নির্যাতনের ঘটনা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখে লাভ নেই। মাঝে মাঝে এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। এটা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা চলছে। এই ঘটনা দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কে কোন রেখাপাত করবে না।[৭৩]

সুখের বিষয় এই যে, সম্প্রতি ভারতীয় গণমাধ্যমে কিছু কিছু ব্যতীক্রমধর্মী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কোনো কোনো সংবাদপত্র বা টিভি চ্যানেল কোদালকে কোদাল রূপেই আখ্যায়িত করছেন। এরই সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত হলো এনডিটিভিতে বাংলাদেশী তরুণ হাবিবুর রহমানের ওপর অমানুষিক নির্দয় নির্যাতনের ভিডিও প্রচার ও দি হিন্দু সংবাদপত্রটি কর্তৃক এ সম্বন্ধে প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয় প্রকাশ। ভারতীয় গণমাধ্যমে বাংলাদেশী তরুণের ওপর নৃশংস নির্যাতনের প্রচার এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলিতে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত রেখা বরাবর নির্মিত কাঁটাতারের বেড়াকে

৭২. প্রণব মুখার্জি ভারতের ক্ষমতাসীন জোটের প্রার্থী হিসেবে ভারতের ১৩তম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। ২৮ জুন ২০১২ তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জোটের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। ১৯ জুলাই ২০১২ ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

৭৩. ড. কে.এম. শাহাদাত হোসেন মন্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ-৯।



www.pathagar.com

'মৃত্যুর দেয়াল' হিসেবে আখ্যায়িত করার প্রেক্ষিতে ও সীমান্তকে বন্ধুত্বের সীমান্ত হিসেবে গড়ে তোলার সিংহভাগ দায় বর্তায় ভারতেরই ওপর।

সম্প্রতি বিবিসি বাংলায় প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারে ভারতীয় বিএসএফ প্রধান ইউকে বনশাল মন্তব্য করেছে, 'সীমান্তে গুলি চালানো পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব নয়।' পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, বিএসএফ'র প্রধানের এ মন্তব্যে অতি উৎসাহিত হয়েছে বিএসএফ'র আগ্রাসী সদস্যরা। বস্তুত বনশালের মন্তব্যে ভারতীয় ছিটমহলের নাগরিকরাও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। সীমান্ত ঘেঁষা বাংলাদেশী নাগরিকরাও নতুন করে ভারতীয় আগ্রাসী বাহিনী বিএসএফ'র গুলিতে হত্যার আশঙ্কায় নিরাপত্তাহীনতায় সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। গত কয়েক দিনে বিএসএফ বাংলাদেশী নাগরিকদের গুলি চালিয়ে হত্যা না করলেও সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙ্গা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাটের বিভিন্ন সীমান্তে যেসব ঘটনা ঘটিয়েছে, সেসব ঘটনা সত্যিই উদ্বেগজনক। আমাদের বিজিবি অপহরণ করা বাংলাদেশী নাগরিকদের আনুষ্ঠানিকভাবে ফেরত চাওয়ার পরও বিএসএফ সদস্যরা তাদের ফেরত না দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে ভারতীয় থানাগুলোতে।

গত বছর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং বাংলাদেশ সফরে এসে আমাদের শুনিয়েছিলেন, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিএসএফ) এখন থেকে সীমান্তে আর গুলি করবে না। এর আগে গত বছরের ৩০ জুলাই ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম ঢাকায় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছিলেন, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রমকালে বিএসএফ কাউকে আর গুলি করবে না। তিনি সে সময় আরো জানিয়েছিলেন বিএসএফকে কড়া নির্দেশ দেয়া হয়েছে কোনো অবস্থাতেই গুলি করা যাবে না, শেষ জওয়ানটির কাছেও এ বার্তা পৌঁছে দেয়া হয়েছে। আশ্বাসগুলো যে ছিল শুধুই ধোঁকাবাজি তা গত ডিসেম্বরে ভারতের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এম রামচন্দনের বক্তব্যে পরিষ্কার হয়েছে। বাংলাদেশ সীমান্তে গুলি না চালাতে বিএসএফকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে কি না সাংবাদিকদের এমন এক প্রশ্নের জবাবে ভারতের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, সীমান্তে নিরস্ত্র মানুষের ওপর গুলি না চালাতে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীকে কোনো নির্দেশ দেয়া হয়নি। তার এই মন্তব্যের পর ভারতীয় গণমাধ্যম 'আসাম ট্রিবিউনে' বক্তব্যটিকে 'ইন্টারেস্টিং' অভিহিত করে দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় প্রতিশ্রুতির পুরোটাই প্রহসন। ভারত আগাগোড়াতেই বাংলাদেশকে দেয়া কোনো অঙ্গীকার রক্ষা করছে না।[৭৪]

---

৭৪. সীমান্তে ফের রক্তপাত, সম্পাদকীয়, দৈনিক আমার দেশ, ১৮ ডিসেম্বর ২০১১, পৃ-৬।



www.pathagar.com

ভারতের অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি কিছুদিন আগে পেট্রাপোল সীমান্তে এসেছিলেন। সেখানে তিনি দোষারোপ করেছেন গণমাধ্যমকে। বলেছেন, সীমান্তের ঘটনাগুলো ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করা হচ্ছে। প্রণব মুখার্জির এ ধরনের মন্তব্য মোটেও ঠিক নয়। শুধু বাংলাদেশের প্রচার মাধ্যম নয়, বিএসএফ'র মানবতাবিরোধী অপরাধ কর্মকাণ্ড ভারতীয় প্রচার মাধ্যমেও প্রচারিত হচ্ছে। কাঁটাতারের বেড়ায় ঝুলন্ত ফেলানির লাশ কিংবা ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রচারিত বাংলাদেশী যুবকের নির্যাতনের ছবিগুলোও কি মিথ্যা? ভারত চাওয়া মাত্রই বর্তমান সরকার সবকিছু উজাড় করে দিচ্ছে, প্রতিদানে আমরা পাচ্ছি কাঁটাতারে ঝুলন্ত কিশোরী ফেলানির লাশ ও উলঙ্গ দেহ ফেরৎ নির্যাতিত যুবক হাবুকে। ভারত বাংলাদেশের প্রতি বৈরী মনোভাবে ও বিদ্বেষমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিচ্ছে।[৭৫]

ভারতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রধান সাবেক বিচারপতি কেজি বালাকৃষ্ণাণ বলেছেন, আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি মর্যাদা দিয়ে বিএসএফকে বাংলাদেশ সীমান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বন্ধ করতেই হবে। তিনি বিএসএফকে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন।[৭৬] ভারতীয় সাংবাদিক যতীন দেশাই বলেছেন, সীমান্তে যে কোন হত্যা নিন্দনীয়।[৭৭] পশ্চিম বঙ্গের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও একসময়ের রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী কমলগুহ বলেছেন, সীমান্তে বিএসএফ জঘন্য অত্যাচার করছে।[৭৮] কাঁটাতারে ঝুলন্ত ফেলানীর লাশের ছবি ছাপা হয় আনন্দ বাজার পত্রিকায়। নীচে লেখা ছিল সম্প্রতি বিএসএফ'র গুলিতে নিহত ফেলানীর লাশ।

## ১.৮ বিশ্বব্যাপী সীমান্তে ভারতীয় সন্ত্রাসের নিন্দা

বিখ্যাত গার্ডিয়ান পত্রিকার সাংবাদিক ব্রাড অ্যাডামস গত ২৩ জানুয়ারী ২০১১ তার এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তকে দক্ষিণ এশিয়ার বধ্যভূমি- মৃত্যু উপত্যকা' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করেছেন এ সব হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র হাতে। তিনি বিএসএফকে ঠান্ডা মাথার খুনি বলে উল্লেখ করেছেন।[৭৯] তিনি লিখেছেন, বাংলাদেশ সীমান্তে ভারত গুলি করে হত্যার নীতি নিয়েছে এবং এই সীমান্তকে দক্ষিণ এশিয়ার বধ্যভূমি বানানো হয়েছে। যার ফলে নিহতের সংখ্যা ধীরে ধীরে বিরাট আকার ধারণ করছে।

---

৭৫. সীমান্তে বিএসএফ'র বর্বরতা, সম্পাদকীয়, দৈনিক সংগ্রাম, ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১২, পৃ-৪।
৭৬. দৈনিক সমকাল, ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১২, পৃ-১।
৭৭. দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২১ জানুয়ারী ২০১১, পৃ-১৫।
৭৮. দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ অগাস্ট ২০১১, পৃ-১।
৭৯. হারুন ইবনে শাহাদাত, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত মৃত্যু উপত্যকা, দৈনিক সংগ্রাম, ৬ মে ২০১১, পৃ-১।



www.pathagar.com

সম্প্রতি উইকিলিকস বলেছে- বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে প্রতিনিয়ত বিএসএফ ও পুলিশ মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। কিন্তু তাদের বিচার হচ্ছে না। বিএসএফ'র মত বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত কোন অপরাধের তদন্তের জন্য ভারতের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অনুমোদন লাগে। কিন্তু সে অনুমোদনের ব্যাপারটা সচরাচর দেখা যায় না। ..... গরিব, নিরস্ত্র গ্রামবাসীকে গুলি করে নিয়মিতভাবে হত্যা করা বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশের আচরণ হতে পারে না।[৮০]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবার্ট ব্লেক ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠককালে সীমান্ত হত্যায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন।[৮১]

নিউইয়র্ক ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বিএসএফ'র নির্যাতনের বিচার চেয়েছে। ৩১ জানুয়ারী ২০১২ প্রকাশিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সংস্থাটি বলেছে, ভারত সরকার বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ'র হত্যা এবং নির্যাতনের ব্যাপারে ভালোভাবেই অবগত। কিন্তু দোষীদের কখনোই বিচারের মুখোমুখি করা হয়নি। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে বাংলাদেশী যুবক হাবিবের ওপর নির্মম নির্যাতনের ভিডিও প্রকাশের পর পরীক্ষা হয়ে যাবে ভারতের আইন-শৃংখলা বাহিনী আইনের উর্ধ্বে কিনা? হিউম্যান রাইটস ওয়াচের দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের পরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলী বলেন, 'মানবাধিকার সংস্থাগুলো দীর্ঘদিন থেকে বলে আসছে, বিএসএফ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে। লাগামহীন অত্যাচার-নিপীড়নের এ চিত্র ভিডিওতে উঠে আসায় সে বিষয়টিই প্রমাণিত হয়েছে।' ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতাভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা বাংলার মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ (মাসুম) এবং ঢাকা ভিত্তিক সংস্থা অধিকারকে সঙ্গে নিয়ে 'ট্রিগার হ্যাপি : এক্সেসিভ ইউজ অব ফোর্স বাই ইন্ডিয়ান ট্রুপস অ্যাট দা বাংলাদেশ বর্ডার' নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে (এইচআরডব্লিউ)।[৮২]

ভারত সরকারই চায় না সীমান্তে বাংলাদেশীদের ওপর বিএসএফ'র নির্যাতন বন্ধ হোক। যদিও বারবার ভারতের পক্ষ থেকে সীমান্ত হত্যা বন্ধের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি বাংলাদেশী চোরাকারবারিকে নির্যাতনের ভিডিওচিত্র প্রকাশের ঘটনায় যে আট বিএসএফ সদস্যকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা নেয়া হবে না। ফৌজদারি

---

৮০. খোলা কাগজ, ২৫ এপ্রিল ২০১১, পৃ-৫।
৮১. দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১২, পৃ-১৬।
৮২. বিএসএফ'র নির্যাতনের বিচার চেয়েছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, সমকাল প্রতিবেদন, দৈনিক সমকাল, ১ ফেব্রুয়ারী ২০১২, পৃ-২।



www.pathagar.com

কার্যবিধিতে কোন অভিযোগও উত্থাপন করা হবে না। যদিও ঘটনা তদন্তে আন্ত:বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। বুধবার বিখ্যাত মার্কিন দৈনিক ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে প্রকাশিত 'কিভাবে বিএসএফ'র নির্যাতনের ভিডিওচিত্র প্রকাশিত হল' শীর্ষক প্রতিবেদনে ভারতের মানবাধিকার সংস্থা বাংলার মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চের (মাসুম) বরাত দিয়ে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনে ভারতীয় মানবাধিকার কর্মী মাসুমের সেক্রেটারী কৃতী রায়ের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, একটি ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে বলে ঘটনার সংখ্যা যে একটি তা নয়, বরং হরমামেশাই বিএসএফ সীমান্তে বাংলাদেশীদের ওপর এমন বা তার চেয়ে কঠোর নির্যাতন চালায়। আর সত্য হচ্ছে, ভারত নির্যাতনকারী বা হত্যাকারীর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ই না।[৮৩]

কানাডাসহ কয়েকটি দেশ বিএসএফ কর্মকর্তাদের ভিসা নাকচ করেছে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে, যদিও তাদের একজন নাগরিকও বিএসএফ-'র গুলিতে মারা যায়নি।

**১.৯ সীমান্ত সন্ত্রাস : বাংলাদেশ ভারতের টার্গেট কেন?**

ভারতীয় নেতৃত্বের শীর্ষ পর্যায় থেকে প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও সীমান্তে বিএসএফ'র হাতে বাংলাদেশের নাগরিকদের হত্যা ও নির্যাতনের মতো মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের ঘটনা কেন বেড়ে যাচ্ছে, তার কোনো সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। সীমান্তে গুলি বন্ধ হবে না বিএসএফ প্রধানের এমন আগ্রাসী মন্তব্যের পর কোনো অফিসিয়াল চিঠি দেয়নি বা দিচ্ছে না বাংলাদেশ।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এক প্রতিবেদনে বলেছে, গত এক দশকে বিএসএফ নয় শতাধিক বাংলাদেশী নাগরিককে হত্যা করেছে। এতে বলা হয়েছে, সীমান্তে হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফকে দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এই দায়মুক্তির ব্যবস্থা বাতিল করে মারাত্মক মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ী বিএসএফ সৈন্যদের বিচার করার জন্য ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। বিএসএফকে ট্রিগারহ্যাপি ও নিয়ন্ত্রণহীন দাবি করে বলা হয়েছে, সন্দেহভাজন যেকোনো ব্যক্তির ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে এই বাহিনীকে। যাদের ওপর গুলি চালানো হচ্ছে তারা দোষি না নির্দোষ তা সামান্যতমও আমলে নেয়া হবে না। বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশের মানুষ বিএসএফ'র মাত্রাতিরিক্ত বল প্রয়োগের শিকার হচ্ছে বলে এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

৮৩. ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন, দেখুন, দৈনিক যুগান্তর, ২ ফেব্রুয়ারী ২০১২, পৃ-১, ১৪।



www.pathagar.com

দুর্ভাগ্যজনক দিক হচ্ছে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো যখন বিএসএফ'র নির্বিচারে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সোচ্চার তখন বাংলাদেশের সরকার তার নাগরিকদের রক্ষার ব্যাপারে সোচ্চার নয়। অন্যায়ভাবে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যার ব্যাপারে সামান্যতম প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারছে না। সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী-এমপি এমনকি প্রধানমন্ত্রী যখন ভারত সফরে ছিলেন তখনো বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশ সরকার তার প্রতিবাদ জানাতে পারেনি। ভারতের প্রতি কোন দায় থেকে সরকার তার নাগরিকদের হত্যার প্রতিবাদ করতে পারছেন না তা স্পষ্ট নয়। তবে এ ধরনের ঘটনা প্রমাণ করে সরকার শুধু তার নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে না- দেশের সার্বভৌমত্ব এখন হুমকির মুখে। রাষ্ট্র তার নাগরিকদের বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করতে পারছে না।

সাধারণভাবে ভারতের উপাধি হলো 'বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী'। সম্মানজনক উপাধিই বটে। একজন ইংরেজ কবি সুন্দর বলেছেন, 'Friendship may grow into love but love never subsides into friendship' বন্ধুত্ব থেকে ভালবাসা গড়ে ওঠে কিন্তু ভালবাসা থেকে আর বন্ধুত্বে ফিরে যাওয়া যায় না অর্থাৎ ভালবাসা ভেঙ্গে গেলে যা হয় তা হলো, অনিবার্য অসুখ, অনিবার্য বিবমিষা। এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতির কথা ভারত-বাংলাদেশ উভয়েরই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মনে রাখা উচিত। এই সেই ভারত যে কাঁটাতার দিয়ে পুরো বাংলাদেশকে ঘিরে (পড়ুন, আবদ্ধ করে) রেখেছে। মানুষ  তো দূরের কথা, অবলা গরু-ছাগলেরও সুযোগ নেই ভারতীয় বেড়া ডিঙানোর। তারপরও সীমান্তে এতগুলো বাংলাদেশীকে আহত-নিহত হতে হচ্ছে কেন? সীমান্তের কাছে কোনো নাগরিক তো অস্ত্র নিয়ে যায় না। ভারতীয় পক্ষের প্রতি এমন কোনো আচরণ করে না, যার জন্য গুলি ছুড়তে হবে? নিরীহ সাধারণ মানুষকে গুলি করে হত্যা করার আরেক নাম বর্বরতা। বর্বরতা আর বন্ধুপ্রতিম শব্দ দুটি এক সঙ্গে ব্যবহার করা যায় না। বাংলাদেশ ছাড়া বিশ্বের অন্য কোথাও কী সীমান্তে পাখির মতো গুলি করে এত মানুষ মারা হয়? 'পাখির মতো গুলি করে' উদাহরণটা গ্রহণ করেছি বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যম থেকে। এদেশের প্রায় সব পাঠকই এর সঙ্গে পরিচিত। কারণ সীমান্তে পাখি শিকারের মতো মানুষ শিকারের বিষয়টি আকসার পত্রিকায় ছাপা হয় এবং তখন উপমা হিসেবে ব্যবহার করা হয় 'পাখির মতো গুলি করে' হত্যার বিষয়টি।

বাংলাদেশ ছাড়া এমন হত্যাকাণ্ড ঘটে একমাত্র ফিলিস্তিনে, যেখানে যায়নবাদী ইসরাইলিরা মুসলিমদের 'পাখির মত গুলি করে' হত্যা করে। ইসরাইল তো ফিলিস্তি



www.pathagar.com

নের শত্রুরাষ্ট্র, সেখানে হত্যা-পাল্টা হত্যা চলতেই পারে। দেশ দুটি পরস্পরে অলিখিত যুদ্ধে জড়িত। ভারত তো আমাদের শত্রুরাষ্ট্র নয়– 'বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র'। তাহলে এখানে হত্যার বিষয় কেন।'[৮৪] কার্যত ভারতীয় পক্ষের আচরণ অবন্ধুসুলভ এবং আগ্রাসী। বিশ্বের প্রতিটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি সীমারেখা বা সীমানা থাকে। এই সীমারেখা বা সীমানার উভয় পাশের দেড়শ গজ ভূমিকে চিহ্নিত করা হয় নোম্যানস ল্যান্ড হিসেবে, যার ওপর কোনো স্থাপনা নির্মাণ করা চলবে না এবং যেখানে কোনো ব্যক্তি অনুমতি বা পারস্পরিক সম্মতি ছাড়া দাঁড়াতে বা অবস্থান করতে পারবে না। স্থলপথে এক দেশ থেকে অন্যদেশে যাতায়াতের জন্য সংশ্লিষ্ট দুটি দেশের স্বীকৃত স্থলবন্দর বা ইমিগ্রেশন স্টেশন থাকে। সেই স্থল বন্দর দিয়ে পূর্ব অনুমতি ভিসাসহ বা ভিসা ছাড়া অন্য কোনো দলিলের ভিত্তিতে লোকেরা শুধু যাতায়াতের সুযোগ পেয়ে থাকে। ভারতের সাথে বিশাল স্থল সীমার (৩,৯৩৩ কিলোমিটার, ২২৩ কিলোমিটার নৌসীমা, ৩৬ কিলোমিটার অচিহ্নিত এবং সমুদ্র সীমানা অচিহ্নিত) মধ্যে উভয় দেশের স্বীকৃত বেশক'টি স্থল বন্দর বা ইমিগ্রেশন স্টেশন রয়েছে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যবর্তী সীমারেখার উভয় পাশের দেড়শ' গজের মধ্যে কোনো দেশই কোনো ধরনের স্থাপনা বা সড়ক নির্মাণ করতে পারবে না। কিন্তু ভারত সেদেশে অবৈধভাবে বাংলাদেশীরা প্রবেশ করছে এ অভিযোগে অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় নোম্যান্স ল্যান্ডের ভেতরে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করছে। এসবের মধ্যে রয়েছে নিরাপত্তা চৌকি, টাওয়ার, কাঁটাতারের বেড়া এবং পাকা রাস্তা। এছাড়াও শুধু হত্যা ও আহত করাই নয়, বিএসএফ বরাবরই সীমান্ত আইন লংঘন করে নানা ধরনের দুষ্কর্মে লিপ্ত রয়েছে। বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ভারতীয়দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে চাষাবাদ, সীমান্ত পিলার ভাঙ্গা, নদী থেকে জোর করে মাছ লুট, বাংলাদেশ এলাকার নদীতে জেগে উঠা চর জবরদখল ইত্যাদি অনৈতিক কাজে বিএসএফ লিপ্ত রয়েছে।

সম্প্রতি তার আর একটি দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে সীমান্ত এলাকায়। সারাদেশের মানুষ যখন স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পূর্তি উৎসব করছে, ঠিক সেই সময় চরম উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটিয়েছে আখাউড়া সীমান্তবর্তী মুগদা ইউনিয়নের মানুষ। আখাউড়া স্থলবন্দরের ঠিক দক্ষিণ পাশে জিরো পয়েন্টে রাস্তা নির্মাণ শুরু করেছে বিএসএফ। স্থানীয় বিজিবি জওয়ানরা বাধা দিলে বিএসএফ জানায়, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে তারা রাস্তা নির্মাণ করছে। বিজিবি বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে

৮৪. ড. মাহফুজ পারভেজ, সীমান্ত সমাচার, দৈনিক আমার দেশ, ২৯ মার্চ ২০১১, পৃ-৭।



www.pathagar.com

জানিয়ে তখন পর্যন্ত কোনো সিগন্যাল না পেয়ে রাস্তা নির্মাণের কাজ বন্ধ করার পদক্ষেপ নিতে পারছে না।[৮৫]

বিডিআর ম্যাসাকারের পর অনেক দিন পর্যন্ত তো সীমান্তে বাংলাদেশের কোনো প্রহরা ছিলো না। অরক্ষিত সীমান্ত তখন নাকি এককভাবে সামাল দিয়েছে বিএসএফ। সামাল দিয়েছে এবং সঙ্গতভাবেই বলা যায় সীমান্তে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। যার পরিণতিতে আজ দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে তাদের বেপরোয়া অনুপ্রবেশ। সিলেটের জৈন্তাপুর সীমান্ত তারা দখলে নিয়েছে। সেখানে তাদের প্রহরায় ভারতীয়রা বাংলাদেশ ভূখণ্ডের প্রায় তিনশ একর জমির ধান কেটে নিয়ে গেছে। ওদের প্রতিরোধ করতে পারেনি বাংলাদেশ, রক্ষা করতে পারেনি নিজের জমির ধান। এর বিরুদ্ধে সরকারিভাবে কোনো প্রতিবাদ জানানো হয়েছে, এমনটিও শুনিনি।

প্রতিবাদ জানানো হয়নি ফেলানীর নির্মম হত্যাকাণ্ডের। শুধু দুই দেশের মধ্যে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সচিব পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতি ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সরকারি সূত্রে বলা হয়েছে, ভারত এ ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করেছে এবং এ ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে তার জন্য সতর্ক থাকার আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু তারপরও ঘটনা ঘটছে। ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শাহজাহান রাশুকে। সার্বিক পরিস্থিতিতে এই সত্যই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ভারতের এসব তৎপরতার কাছে বাংলাদেশ আজ বড় অসহায়। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজনীতিক এবং বিশেষ করে আওয়ামী লীগ সমর্থক বুদ্ধিজীবীরা একটি আওয়াজ দিচ্ছেন- তারা ভারত সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

এই বন্ধুত্বেরই মূল্য দিতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। এই বন্ধুত্বেরই মূল্য দিয়ে গেল ফেলানি। এই বন্ধুত্বের মূল্য দিতেই ভারতের আধিপত্যের কবলে আজ বাংলাদেশ। জন্মগত দায় পরিশোধে আজ ভারতের কাছে বাংলাদেশ নতজানু। মাথা উঁচিয়ে ভারতের কোনো অপকীর্তির প্রতিবাদ জানাবার ক্ষমতাও বাংলাদেশ আজ হারিয়ে ফেলেছে।[৮৬]

ভারতের সাথে সাতটি দেশের যেমন : চীন, মায়ানমার, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, ভূটান,

---

৮৫. সীমান্তে ফের রক্তপাত- ভারতীয় প্রতিশ্রুতির পুরোটাই প্রহসন! (সম্পাদকীয়), দৈনিক আমার দেশ, ১৮ ডিসেম্বর ২০১১, পৃ-৬।

৮৬. মনজুর আহমদ, ফেলানীর লাশ, নতজানু দেশ, দৈনিক আমার দেশ, ৩০ জানুয়ারী ২০১১, পৃ-৬।



www.pathagar.com

নেপাল, বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ ছাড়া অন্যসব দেশের সীমান্তে বিএসএফ গুলি করে মানুষ মারতে সাহস পায় না। কই সেগুলোতে তো অপরাধী দমনে গুলি চালানোর কথা শোনা যায় না। শুধু বাংলাদেশ সীমান্তেই হত্যাযজ্ঞ ও নির্যাতন চালাচ্ছে বিএসএফ। বাংলাদেশের ব্যর্থ পররাষ্ট্রনীতির কারণে প্রতিনিয়ত সীমান্তে বাংলাদেশীকে বিএসএফ গুলি করে ও নির্যাতন করে মারতে সাহস দেখাচ্ছে। এসব ভারতের উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।

তাছাড়া ভৌগোলিক গঠনগত অবস্থানের কারণে এই অঞ্চলে বাংলাদেশের একটি 'স্ট্র্যাটেজিক' অবস্থান রয়েছে, যা ভারতের জন্য উদ্বেগের কারণ। স্ট্র্যাটেজিক অবস্থানের পাশাপাশি বাংলাদেশের রয়েছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক এবং জাতিগত অবস্থানের দিক। এসব ক্ষেত্রে সারা দুনিয়ায় বাংলাদেশের বিদ্যমান একটি অবস্থান রয়েছে যা ভারতের ভয়ের কারণ। বাংলাদেশের পশ্চিম দিকে রয়েছে ভারত এবং পূর্বদিকেও ভারত। তারপর দক্ষিণ-পূর্বে মিয়ানমার। আর উত্তরে হিমালয়ের সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গ। এ পর্বতমালার এক পাশে রয়েছে ভূটান, নেপাল, সিকিম আর অন্য প্রান্তে রয়েছে গণচীন। আরও রয়েছে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়া। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে এই প্রতিটি দেশ খুব সন্নিকটবর্তী। বাংলাদেশ থেকে নেপালের দূরত্ব মাত্র ১৮ মাইল, ভূটানের ৪৫ মাইল এবং চায়নার বর্ডার বড়জোর ৪০-৪৫ মাইল হতে পারে। তাছাড়া বাংলাদেশ সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশ, আমাদের রাষ্ট্রীয় সীমানা শুরু সমুদ্রের জলরাশি দিয়ে। আমাদের এসব 'স্ট্র্যাটেজিক' দিক থাকা, এজন্যই আমরা বলি বাংলাদেশ হলো দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সংযোগস্থল। আমাদের এ উক্তি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে। আর এজন্যই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ও বিশ্ব রাজনীতিতে বাংলাদেশের এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এ কারণে বাংলাদেশ ভারতের এক নম্বর টার্গেট। এজন্য ভারত সীমান্তজুড়ে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে আমাদের আবদ্ধ করে ফেলছে এবং আমাদের কব্জা করে রাখছে।

ভারতের ভয় হলো গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান ও 'স্ট্র্যাটেজিক' কারণে এবং বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামী ভূমিকা ও ঐতিহ্যের কারণের সঙ্গে যদি সাহসী ও দূরদর্শী নেতৃত্ব যোগ হয়, তাহলে এ দেশের কোটি কোটি মানুষ জেগে উঠবে। এসব ভয় থেকেই ভারত সীমান্তজুড়ে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করছে।[৮৭]

---

৮৭. মো. বেলায়েত হোসেন, সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া ও নিরীহ মানুষ হত্যা, দৈনিক আমার দেশ, ৩০ জানুয়ারী ২০১১, পৃষ্ঠা-৬।



www.pathagar.com

## ১.১০ উপসংহার ও সুপারিশমালা

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহ একাধিকবার সীমান্ত হত্যা বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু সীমান্ত হত্যা বন্ধ হয়নি। বর্তমানে বিএসএফ কর্তৃক নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড রীতিমতো অনিয়ন্ত্রিত ও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে বিডিআরের সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) আ.ল.ম. ফজলুর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত আসলে একটি মৃত্যুপ্রাচীর। এটি বিদেশী পত্রিকার ভাষ্য। ভারত সরকারের সম্মতিতেই সীমান্তে হত্যা চলছে।

বাংলাদেশের মানুষের ওপর একটি মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টির জন্য ভারত এটা করছে। ভারতের ধারণা, এভাবে একের পর এক হত্যার কারণে একদিন বাংলাদেশের মানুষ মনে করবে সীমান্তে যা হচ্ছে তা আমাদের নিয়তি। আর তাহলে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে সবকিছুর অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হবে বাংলাদেশ। তখন বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন দেশ থাকবে, আর সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ করবে ভারত। ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদকের মন্তব্যে এ সম্ভাবনা আরো তীব্র হয়ে উঠেছে।[৮৮] সীমান্ত হত্যা বন্ধে ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য ভারতীয় পণ্য বর্জনসহ সব ধরনের প্রীতি আয়োজন বন্ধ করা উচিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা কারো দয়া বা করুণার দান নয়। তাই আজকের এই কঠিন দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে সচেতন দেশপ্রেমিক জনসাধারণকে ঐকমত্য প্রদর্শন করে দৃঢ় মনোবল নিয়ে সকল প্রকার অনিয়ম ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

এ বিষয়ে সুপারিশ সমূহ নিম্নরূপ "

১. আসলে ভারতকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা বাংলাদেশের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক চায়। ভারতের সাথে সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সৎ মানসিকতার কোন অভাব নেই বাংলাদেশের। কিন্তু ভারতের তেমন মানসিকতার পরিচয়

---

৮৮. ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের বক্তব্য খুবই দুঃখজনক যা দেশবাসীর মনে ক্ষোভ ও নিন্দার সৃষ্টি করেছে। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'সীমান্তে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলোর সাথে অনেক কিছু জড়িত। এগুলো রাষ্ট্রীয় কোন বিচারযোগ্য বিষয় নয়। দুই দেশের পক্ষ থেকেই চোরাকারবারী, মাদক পাচার ও গরু চুরি হচ্ছে। এসব ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে। আগেও ঘটেছে। ভবিষ্যতেও ঘটবে। এটা নিয়ে রাষ্ট্র খুব চিন্তিত নয় বরং সব কর্মকাণ্ড ফেলে রেখে এসব বিষয়ে রাষ্ট্রের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি আরো বলেন, তিলকে তাল করার কোন প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন না। দেখুন, ড. কে. এম. শাহাদাত হোসেন মন্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ-৯।



www.pathagar.com

পাওয়া যায় না। শুধু সীমান্তে বর্বরতাই নয়, তিস্তার পানি বন্টন, সমুদ্রসীমা নির্ধারণ, টিপাইমুখ বাঁধসহ বিভিন্ন ইস্যুতে এটি পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, ভারত বাংলাদেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চাচ্ছে না। তারপরও বাংলাদেশবাসী আশা করবে, ভারত আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান মেনে বাংলাদেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলবে।

২. আমরা মনে করি, ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে এদেশের নাগরিকদের রক্ষার জন্য সরকারের এখনই পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। এ ধরনের হত্যাকাণ্ড বন্ধে ভারতের কাছে প্রতিবাদ জানানো দরকার। একই সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে এ ব্যাপারে আরো সক্রিয় করা দরকার। তাদের সামনে সীমান্ত পরিস্থিতি তুলে ধরতে হবে, যাতে আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে এ ধরনের হত্যাকাণ্ড বন্ধে ভারতের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করা সম্ভব হয়। সরকারকে মনে রাখতে হবে, প্রতিবেশী রাষ্ট্র যত বড় ও শক্তিশালী হোক না কেন এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করা সংবিধান, মানবাধিকার এবং নৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত জরুরী। এ দেশের মানুষ দেশের সার্বভৌমত্ব ও নাগরিকের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার গঠন করে থাকে, নিজ দেশের বিরুদ্ধে অন্যায় কর্মকাণ্ডে নীরব থাকার জন্য নয়।

৩. সীমান্তবর্তী এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এতে বাংলাদেশী নাগরিকদের সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে কাজ করতে যাওয়া বন্ধ হবে।

৪. বাংলাদেশের নিজস্ব কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার একমাত্র চাবিকাঠি হল রাষ্ট্রটির মর্যাদাবোধ, নৈতিক অনুভূতি, জাতীয় চেতনা ও সাহসী ভূমিকা নেয়া। রাষ্ট্র পরিচালনা এবং আন্ত:রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে কৌশলসমূহ এসব চাবিকাঠির আলোকেই নির্ধারণ করতে হবে।

৫. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কূটনীতিকে বাংলাদেশের পক্ষে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। সীমান্তে মানবাধিকার লংঘনকারী ও সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের বিষয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমর্থন সহযোগিতা লাভে বাংলাদেশকে সফল হতে হবে।

৬. দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে ভারতের দাদাগিরিই বড় বাধা। ভারত উচ্চাকাঙ্ক্ষায় সুপার পাওয়ার সুলভ দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করেছে। এ ধরনের



www.pathagar.com

দৃষ্টিভঙ্গী, আচরণ ও প্রবণতা সুবন্ধুসুলভ বা সৎপ্রতিবেশীসুলভ নয়। ভারতকে তার মনোভাব পাল্টাতে হবে। আস্থা স্থাপনের ক্ষেত্রে বড় দায়িত্বটি পালন করতে হবে বড় দেশ হিসেবে ভারতকেই। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের মানুষ যুগ যুগ ধরে শান্তি ও সমৃদ্ধির যে আকাঙ্ক্ষা লালন করে আসছে তা পূরণের জন্যই এ ভাবনা আজ জরুরী।

৭. সীমান্তে বাংলাদেশের নাগরিক হত্যা বন্ধে ভারতকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৮. অন্ধ ভারত প্রীতি একটি ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী। এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

৯. ২০০১ সালে পাদুয়া ও বড়াইবাড়ী যুদ্ধে ভারতীয় আগ্রাসী অনুপ্রবেশকারী বাহিনীকে সমূলে পরাজিতকারী বীরদের বীরোচিতভাবে জাতীয় খেতাবে ভূষিত করে বীরের আসনে অধিষ্ঠিত করতে হবে এবং ১৫ এপ্রিলকে পাদুয়া পুনরুদ্ধার দিবস এবং ১৮ এপ্রিলকে জাতীয় সীমান্ত রক্ষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে দিন দুটিকে জাতীয় ভাবে পালন করতে হবে। এটা মনে রাখা প্রয়োজন, যে দেশে বীরকে সম্মান দেয়া হয় না, সে দেশের বীরের জন্ম হয় না।

১০. ভারতের সচেতন নাগরিকদের মাঝেও সীমান্ত সন্ত্রাস নিয়ে তীব্র ক্ষোভ, নিন্দা ও প্রতিবাদ সৃষ্টি হয়েছে। ভারত সরকারকে বাংলাদেশের জনগণের অনুভূতি (Pulse) অনুধাবন করে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে পানি ও সীমান্তসমস্যাসহ সকল সমস্যা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে অতিদ্রুত সম্মানজনক সমাধান করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ভারত ভালোভাবে জানে, বাংলার মানুষ ৭১-এ বুকের রক্ত দিয়ে যে দেশ স্বাধীন করেছে ৭১-এর চেয়ে শতগুণ বেশি রক্ত দিয়ে হলেও ভারতীয় পানি আগ্রাসনে সৃষ্ট মরুকরণের হাত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করবে। রক্ষা করবে বাংলার ১৫ কোটি মানুষকে আর্সেনিক আক্রান্ত হওয়া এবং পথের ফকিরে পরিণত হওয়ার হাত থেকে। বাংলাদেশের মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে ভারতীয় নিষ্ঠুর ও অমানবিক পানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যাতে রুখে দাঁড়াতে এবং প্রয়োজনে যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে না পারে সে জন্য সীমান্ত সন্ত্রাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের মনোবল ভেঙে দেয়ার এক দীর্ঘ মেয়াদী ও সুদূরপ্রসারী আগ্রাসী পরিকল্পনা নিয়েছে ভারত। এ শিক্ষা ভারত পেয়েছে বিশ্ব আগ্রাসনের গুরু ইসরাইলের কাছ থেকে। কিন্তু ভারতের জানা উচিত বাংলাদেশ প্যালেস্টাইন নয়। বাংলাদশের জনসংখ্যার ১৫ কোটির মধ্যে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান মিলে সাড়ে চৌদ্দ কোটি মানুষ বাঙালি। তন্মধ্যে ১৩ কোটি মানুষ মুসলিম।



www.pathagar.com

এক ভাষা, এক সংস্কৃতি, এক ধর্মবিশ্বাস এবং এক জাতি। আমরাই পারি নিজের শক্তিতে নিজেকে এবং নিজের দেশকে রক্ষা করতে। আমরাই ভারতকে পরাজিত করেছি পাদুয়া এবং বড়াইবাড়িতে। প্রয়োজনে ভারতীয় আগ্রাসনের মুখে দেশ, জাতি এবং ধর্ম বাঁচাতে আবারো ৭১-এর অবতারণা করবো ইনশাআল্লাহ। জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে এই অধিকার আমাদের বিশ্ব সভায় স্বীকৃত।[৮৯]

---

**লেখক-পরিচিতি :** ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। বিশিষ্ট লেখক, প্রাবন্ধিক ও এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

**লেখা পরিচিতি :** প্রবন্ধটি ২৮ জুলাই, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার আয়োজিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসাবে পঠিত হয়।

---

৮৯. মেজর জেনারেল (অব.) আ.ল.ম. ফজলুর রহমান এনডিসি পিএসসি, ভারতীয় সীমান্ত সন্ত্রাস : কিসের আলামত, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৩ মার্চ ২০০৫, পৃ-৯।



www.pathagar.com

# ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষানীতি

মোহাম্মদ ইমতিয়াজ উদ্দীন চৌধুরী

## ১. ভূমিকা ঃ

মানুষ "আশরাফুল মাখলুকাত", সৃষ্টির সেরা জীব। আর এই সেরা বা শ্রেষ্ঠত্ব জন্মগত নয় বরং তা অর্জন করতে হয় যা শিক্ষার মাধ্যমেই সাধিত হয়। শিক্ষা এমন এক প্রণালী যা মানুষের অন্তর্নিহিত জ্ঞান প্রতিভাকে জাগ্রত করার মাধ্যমে মনুষ্যত্ববোধ উজ্জীবিত করে নৈতিকতার চোখে বিশ্বকে দেখায়। ফলস্বরূপ সে সহজে ভাল মন্দ উপলব্ধি করতে পারে যা তাকে গুনাহের পথ থেকে বাঁচিয়ে ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। মোটকথা শিক্ষা মানুষের পাহারাদার যেমন মানুষ তার সম্পদের পাহারাদার। শিক্ষা মানুষের জ্ঞানের ক্ষুধাকে নিবৃত করে অন্তরে পবিত্রতা দান করে। শিক্ষার মূলত কোন বয়স নেই মানুষ জন্মপরবর্তী শিশুকাল থেকে মৃত্যুপূর্ব বার্ধক্যকাল পর্যন্ত শেখে। জ্ঞান শিক্ষার বেশ কিছু প্রকার আছে, যেমন কিছু জ্ঞান মানুষ প্রতিকূল পরিবেশে বাঁচার তাগিদে শেখে, এক্ষেত্রে প্রস্তর যুগের সভ্যতার কথা বলা যায়, আবার কিছু জ্ঞান জীবনকে সুন্দর, সময়কে সংক্ষেপ ও যাতায়াতকে করে সহজ, আবার কিছু জ্ঞান মানুষের চিন্তার জগতকে প্রসারিত করে, ঈমানকে মজবুত করে অন্তরকে নৈতিকতার আলোকে জীবন্ত করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে শিক্ষা একটি ব্যাপক প্রক্রিয়া যা মানুষের বস্তুগত প্রয়োজনের সাথে আত্মিক উন্নতি সাধনে প্রধান ভূমিকা পালন করে। তাই জাতির নতুন প্রজন্মকে ভবিষ্যতের সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি যুগোপযোগী নৈতিকতাপূর্ণ শিক্ষানীতি প্রণোয়নের কোন বিকল্প নেই।



www.pathagar.com

**২. শিক্ষার সংজ্ঞা ঃ**

বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ (In Broad Sense) থেকে বিচার করলে প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষা একটি কর্ম বা অভিজ্ঞতা যাতে ব্যক্তির মন, চরিত্র ও শারীরিক ক্ষমতার একটি দিক নির্দেশনামূলক প্রতিফলন থাকে। প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজ ইচ্ছাপ্রণোদিতভাবে এর সঞ্চিত জ্ঞান, যোগ্যতা ও মূল্যবোধ এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে স্থানান্তর করে। শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী ইংরেজী ভাষার Education শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Educare থেকে এসেছে যার অর্থ Bring up যা ল্যাটিন শব্দ Educere-এর সাথে সম্পর্কিত যার অর্থ Bring out বা Bring forth what is within বা Bring out potential এবং ল্যাটিন শব্দ Ducere-এর সাথে সম্পর্কিত যার অর্থ To lead.[১] বাংলা ভাষার শিক্ষা শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত 'সাস' ধাতু থেকে। সাধারণভাবে বলা যায় মানুষের আচরণের কাঙ্ক্ষিত, বাঞ্চিত এবং ইতিবাচক পরিবর্তনই হলো শিক্ষা। যুগে যুগে নানা মনীষী শিক্ষাকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আবার সময়ের সাথে সাথে শিক্ষার সংজ্ঞা বা ধারণায়ও পরিবর্তন এসেছে।[২] বিশিষ্ট রাজনৈতিক, ভাষাসৈনিক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক গোলাম আযম (জন্ম ঃ ০৭ নভেম্বর, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ) শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'প্রয়োজনীয় গুণাবলি ও জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ব্যবস্থার নামই শিক্ষা'।[৩] কবি ও দার্শনিক আল্লামা ইকবাল (০৯ নভেম্বর, ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ - ২১ এপ্রিল, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ) বলেছেন, 'মানুষের খুদির বা রূহের উন্নয়নই আসল শিক্ষা'। বিশিষ্ট গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৬৯ অব্দ - ৩৯৯ অব্দ) শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'নিজেকে জানার নামই শিক্ষা।' হারম্যান হর্ন (১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ - ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ) লিখেছেন, 'শিক্ষা হচ্ছে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে মুক্ত সচেতন মানবসত্তাকে সৃষ্টিকর্তার সাথে উন্নত যোগসূত্র রচনা করার একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া, যেমনটি প্রমাণিত রয়েছে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগগত ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধীয় পরিবেশ'।

শিক্ষার ইতিহাস খুঁজতে হলে আমাদের পৃথিবীর প্রথম মানুষটির কাছে যেতে হবে। নবী আদম (আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হচ্ছেন মানবজাতির প্রথম ও আদি শিক্ষাগুরু। আর তিনি যে উৎস থেকে জ্ঞান লাভ করেন তা হচ্ছে ওহি। তারপর দীর্ঘ পথপরিক্রমা। মানুষ যখনই ওহির শিক্ষা ভুলে অশিক্ষার অন্ধকার তথা জাহিলিয়াতে লিপ্ত হয়েছে, তখনই আবার ওহির জ্ঞান দিয়ে আল্লাহ কোন নবী বা রাসূলকে পাঠিয়েছেন কোন

---

১. Education, http://en.wikipedia.org/WiKi/Education

২. শিক্ষা-উইকিপিডিয়া, http://bn.wikipedia.org/WiKi/শিক্ষা

৩. অধ্যাপক গোলাম আযম, শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামী রূপরেখা, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, মুদ্রন ঃ এপ্রিল ২০১০, ঢাকা, পৃষ্ঠা ০৯।



www.pathagar.com

নির্দিষ্ট কাওমকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এভাবে যুগে যুগে অসংখ্য নবী রাসূল এসেছেন অধপতিত মানব জাতিকে সঠিক পথের শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এ ধারায় সর্বশেষে আইয়্যামে জাহিলিয়াতের অমানিশার ঘোর অন্ধকার ভেদ করে জন্ম নিলেন জগতের শ্রেষ্ঠতম মানুষ, বিশ্বের আলোকবর্তিকা, সমগ্র পৃথিবীর রাহ্‌মাত, রাহ্‌মাতুল্লিল 'আলামিন, মানবজাতির মহান শিক্ষক শ্রেষ্ঠ দার্শনিক নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।[৪] আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের কাছে তাই শিক্ষকগণ উঁচু মর্যাদার অধিকারী। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর শিক্ষার্থীদের মন-মগজে একথা বদ্ধমূল করার চেষ্টা করেছেন যে, শিক্ষকই হলেন সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী। তাঁরা মানব জাতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এ কারণে আল্লাহ ও সৃষ্টিকুলের শিক্ষকের মর্যাদা অত্যুচ্চে। তাই সৃষ্টিকুল শিক্ষকমন্ডলীর জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ ও ইসতিগফার করে। তিনি সাহাবীদেরকে বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতামন্ডলী, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অধিবাসীগণ, এমনকি গর্তে অবস্থানরত পিঁপড়া এবং মাছ পর্যন্ত মানুষকে সৎ ও কল্যাণের কথা শিক্ষাদানকরীদের জন্য অবশ্যই দু'আ ও ইসতিগফার করে।[৫] মানবজাতির সর্বাধিক ও সর্ববিভাগের শ্রেষ্ঠ মডেল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। সত্য সুন্দর, মঙ্গল ও কল্যণের শিক্ষক মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এত জ্ঞান দান করেন যে, মানব জাতির মধ্যে অন্য কাউকে তা দান করেননি। একটি ব্যক্তি সত্তাকে যে সকল গুণ-বৈশিষ্ট্য অনন্য ও অতুলনীয় করে তোলে তার সবই তাঁকে পরিপূর্ণরূপে দান করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি কৃত অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا-

"তুমি যা জানতে না তিনি তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তোমার প্রতি আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে।" (সূরা আন নিসা, আয়াত ঃ ১১৩)

বর্ণনার সৌন্দর্যে, ভাষার প্রাঞ্জলতায়, কথার স্পষ্টতায়, নিয়ম পদ্ধতির মাধুর্যে, ইশারা ইঙ্গিতের চমৎকারিত্বে, প্রাণের আলোকচ্ছটায়, অন্তরের কোমলতায়, বক্ষের প্রশস্ততায়, দয়া-মমতার প্রাচুর্যে, কঠোরতার বিজ্ঞতায়, সতর্কতার মহানুভবতায়, মেধার প্রখরতায়, যত্ন-তত্ত্বাবধানের পরিপক্কতায় এবং মানুষকে সঙ্গদানের পর্যাপ্ততায় তিনি ছিলেন এই পৃথিবীতে সত্যিকার অর্থে প্রথম শ্রেষ্ঠ কল্যাণকর শিক্ষক। আর এ কারণে তিনি

৪. মানুষ গড়তে ইসলামী শিক্ষা, http://sodeshbangla.wordpress.com
৫. জামি'আত তিরমিযী, হাদীস নং - ২৬৮৩।



www.pathagar.com

বলতেন, "আমি শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি।"[৬] তাঁর উপর যে ওহি আসত, আমাদের যা শিক্ষণীয় তা হলো মুসলিম মিল্লাতকে শত ভাগ শিক্ষিত হতে হবে। আল্লাহর কালাম এবং হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শিক্ষার যে গুরুত্ব তাকে খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই। অথচ মুসলিম শাসকরা এ বিষয়ে যথার্থ গুরুত্ব দিচ্ছেন কি? 'সাঈদ ইবন্ 'উফায়র (রাদিআল্লাহ্ আনহু).......হুমাইদ ইবন্ 'আবদুর রহমান (রাদিআল্লাহ্ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি মু'আবিয়া (রাদিআল্লাহ্ আনহু)-কে বক্তৃতারত অবস্থায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন। আমি তো কেবল বিতরণকারী, আল্লাহই দানকারী। সর্বদাই এ উম্মাত কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহর হুকুমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'[৭]

বর্তমান বিশ্বে কর্তৃত্বের যে লড়াই তার মূল হচ্ছে ইলম বা জ্ঞান। আমরা তাকে যেভাবেই দেখি না কেন, এ লড়াই হচ্ছে মূলত জ্ঞানের লড়াই। আমাদের সর্বদিকে জ্ঞানী হতে হবে। আর এ শিক্ষা আমরা প্রত্যেক নবী ও রাসূলের কাছ থেকে পাই। ইতিহাসের আলোকে আমরা দেখতে পাই, প্রত্যেক নবী-রাসূলকে সমসাময়িক কালে সব বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ করে পাঠানো হয়েছে। আর আমরা মুসলিম মিল্লাত সমকালীন বিদ্যা অর্জনের ক্ষেত্রে কত যে পিছিয়ে আছি তা আমাদের বর্তমান অবস্থাই বলে দেয়। এ দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন 'ভিখারীর বেশে খলিফা যাদের/শাসন করিল আধা জাহান, তারা আজ পড়ে ঘুমায় বেহুঁশ/বাইরে বইছে ঝড়-তুফান।'

### ৩. শিক্ষার উদ্দেশ্য পর্যালোচনা ঃ

আমাদের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কি? এ সম্পর্কে অনেক শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ মন্তব্য পেশ করেছেন। তাদের মধ্যে আল্লামা ইকবাল (০৯ নভেম্বর, ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ, ২১ এপ্রিল, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ) বলেছেন 'পূর্ণাঙ্গ মুসলিম তৈরি করাই হচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য।' অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ কুতুব (জন্ম ঃ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ) Concept of Islamic Education প্রবন্ধে বিস্তারিত লিখেছেন, যার সারমর্ম আমরা এভাবে উল্লেখ করতে পারি 'শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানসিক উৎকর্ষ সাধন'। গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর (খ্রিস্টপূর্ব ৪২৭ অব্দ-৩৪৭ অব্দ) মতে, 'শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো মিথ্যার বিনাশ আর সত্যের

---

৬. অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিক্ষাদান পদ্ধতি, বিআইসি, প্রকাশ ঃ মে ২০১১, পৃষ্ঠা - ১৫-১৬।

৭. সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং - ৭১, পৃষ্ঠা - ৫৮।



www.pathagar.com

আবিষ্কার।' গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪ অব্দ-৩২২ অব্দ) বলেছেন, 'শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো ধর্মীয় অনুশাসনের অনুমোদিত পবিত্র কার্যক্রমের মাধ্যমে সুখ লাভ করা।' মহাকবি জন মিল্টন (০৯ ডিসেম্বর, ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দ-০৮ নভেম্বর, ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দ) শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, 'শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহ, মন ও আত্মার সমন্বিত উন্নতি সাধন।' এভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যত মতামত এসেছে সব কথার মূল হচ্ছে নৈতিক আচরণ, আত্মপরিচয় ও দায়িত্বানুভূতি বিকাশে সাহায্য করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।[৮]

শিক্ষার উদ্দেশ্য হল 'যোগ্য নাগরিক' সৃষ্টি করা, যদিও নাগরিক ও তার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও অভিন্ন কোন সংজ্ঞা নেই। কেননা, বিভিন্ন জাতির নিকট এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। কোন দেশে এর অর্থ হল অন্যায় ও বিদ্রোহ দমন করা কিংবা বিদ্রোহ দমনে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করা অথবা সে এমন একজন ভাল লোক যে অন্যায় ও বাড়াবাড়ি পছন্দ করে না, কোন সময় সে আবেদ হয় যে পার্থিব জগত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ এড়িয়ে চলে, কোন সময় সে দেশপ্রেমিক হয় ও নিজস্ব বর্ণ রক্ষার জন্য উন্মাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এতদসত্ত্বেও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এরা সবাই দেশের যোগ্য নাগরিক। ইসলাম নিজেকে এহেন সংকীর্ণতার মধ্যে নিক্ষেপ করেনি। ইসলাম শিক্ষার মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক নয় বরং 'যোগ্য মানুষ' গড়ার ব্যাপক লক্ষ্য অর্জন করতে চায়। মানুষ শব্দটি ব্যাপক মনুষত্ব 'অর্থবোধক'। এই অর্থে মানুষ শুধু নির্দিষ্ট কোন ভূ-খণ্ডের নাগরিকই নয়, এরও ঊর্ধ্বে উঠে সে হচ্ছে কেবল 'মানুষই'। ইসলামের এই শিক্ষা মানুষের জ্ঞান, আত্মা, বৈষয়িক ও নৈতিক সর্বদিক ব্যাপৃত। ইসলাম মানুষকে শরীর জ্ঞান ও আত্মার সমন্বিত এক পূর্ণ অবয়ব মনে করে। এগুলোসহ তাদের বৈষয়িক ও নৈতিক যাবতীয় কাজের সর্বাত্মক উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন করাই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য।[৯]

মানুষ কেবল চোখ দিয়েই দেখেনা, এর পেছনে রয়েছে তার সক্রিয় মন ও মগজ। রয়েছে তার একটা দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামত। জীবনের একটা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে তার। সমস্যাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার একটা প্রক্রিয়া তার আছে। মানুষ যা কিছু দেখে, শুনে এবং জানে, সেটাকে সে নিজের মৌলিক চিন্তা ও ধ্যান ধারণার সাথে সামঞ্জস্যশীল করে নেয় এবং সেই চিন্তা ও ধ্যান ধারণার ভিত্তিতেই তার জীবন পদ্ধতি গড়ে উঠে। এই জীবন পদ্ধতিই হলো সংস্কৃতি। যে জাতি একটা স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, আকিদা বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য লক্ষ্যের অধিকারী এবং যাদের রয়েছে নিজস্ব জীবনাদর্শ,

---

৮. মানুষ গড়তে ইসলামী শিক্ষা, http://sodeshbangla.wordpress.com

৯. ফুয়াদ আবদুল হামীদ আল খতীব, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, পঞ্চম প্রকাশ ঃ অগাস্ট, ২০০৬, পৃষ্ঠা-১৩



www.pathagar.com

তাদেরকে অবশ্যই তাদের নতুন প্রজন্মকে সেই স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, আকিদা বিশ্বাস, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও জীবনাদর্শের রক্ষাণাবেক্ষণ এবং তার বিকাশ ও উন্নয়নের যোগ্য করে গড়ে তোলা কর্তব্য। আর সে উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে তুলতে হবে তাদের শিক্ষাব্যবস্থা।[১০]

এ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে চিন্তাশীলতার ক্ষমতা অর্জন করা যাতে সে সত্য-মিথ্যার ব্যবধান উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। 'এ জ্ঞান ও অবগতি ছাড়া মানুষ নিজে সঠিক পথে চলতে পারে না, অন্যকেও পথ দেখাতে পারে না এবং সমাজ পরিগঠনের জন্য যথার্থ পথে কোন কাজ করতেও সক্ষম হয় না। আধুনিক চিন্তা ও কর্মের ক্রুটিপূর্ণ অংশকে ক্রুটিহীন অংশ থেকে আলাদা করার মতো সমালোচনার যোগ্যতা তাদের মধ্যে থাকতে হবে।[১১]

## ৪. মানব জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব ঃ

পশু সমাজে শিক্ষার কোন প্রাতিষ্ঠানিক প্রচলন দেখা যায় না। একটি ছাগল-ছানা কিংবা একটি ছোট্ট বাছুরকে খাবার সংগ্রহ বা জীবন-পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া এবং তাদের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য বিকাশের জন্য পশুসমাজে শিক্ষা আদান-প্রদানের কোন ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাই না। তার কোন প্রয়োজনও নেই; কারণ জন্মগত ভাবেই তারা পশুত্বের স্বভাব পেয়ে থাকে এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই তাদের পশুত্বের বিকাশ হয়। মানুষের স্বভাবের মধ্যেও একটি পাশবিক সত্তা রয়েছে এবং মানব-প্রকৃতির এই পাশবিক সত্তার বিকাশও অন্যান্য পশু-পাখি ও জীব-জানোয়ারের মতই প্রাকৃতিক নিয়মে আপনা-আপনি হয়ে থাকে। পশু প্রবৃত্তি অর্জন করার জন্য কাউকেই কোন কষ্ট করতে হয় না। পশুত্ব বিনা পরিশ্রমেই অর্জন করা যায়। কিন্তু মানুষ কোন পশুর নাম নয়।'[১২] 'শুধু মানুষেরই জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন। অন্যান্য প্রাণীকূল পরিবেশ থেকেই তাদের সহজাত জীবন পদ্ধতি ও নিয়মাবলী পর্যাপ্তভাবে জানতে পারে, যা তাদের স্রষ্টা তাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন। তারা কখনই ভুল জ্ঞান বা অজ্ঞতার ফলস্বরূপ ক্ষতিগ্রস্থ হয় না।'[১৩] 'অন্যান্য জীব-জানোয়ার ও পশু-পাখির তুলনায় সৃষ্টিকর্তা মানুষকে বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। বলাবাহুল্য সৃষ্টি জগতের অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব হল তার মনুষ্যত্বের কারণে। আর মানবশিশুকে এই মনুষ্যত্ব রীতিমত অর্জন করতে হয়।

---

১০. সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী, শিক্ষা, শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মৌলিক শিক্ষার গুরুত্ব; সূত্র ঃ http://www.somewhereinblog.net/blog/amiree/29606657

১১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি), ইসলামী আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলী, প্রকাশ ঃ এপ্রিল, ২০০৭, পৃষ্ঠা-১০

১২. মুহাম্মদ আবুল হুসাইন, ছাত্রজীবনে ইসলামের দাবী, প্রকাশ ঃ মে-২০১১, পৃষ্ঠা ০৯।

১৩. অধ্যাপক গোলাম আযম, Islam the Only Divine & Complete Code of Life, প্রকাশ ঃ নভেম্বর ২০০৯, ঢাকা, পৃষ্ঠা - ১২।



www.pathagar.com

মনুষ্যত্ব হচ্ছে মানব-প্রকৃতিতে সুপ্তাবস্থায় বিদ্যমান মৌলিক মানবীয় ও সৎ গুণাবলী, তার বিবেকবোধ ও জীবনবোধ এবং সুকুমার বৃত্তি ও সৃজনশীলতা। এসবের যথার্থ বিকাশের উপরই মানব সন্তানের মনুষ্যত্ব অর্জন নির্ভর করে। মানব সন্তানকে তার জীবিকা অর্জন বা রুটি-রুজির জন্যও ব্যাপক কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। একজন মানুষ তার জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন্ ধরণের পেশাকে বেছে নিবে তা তার জীবনের কৈশোর কাল থেকেই নির্ধারণ করে নিতে হয় এবং সে অনুযায়ীই তাকে পড়াশোনা ও অধ্যয়ন করতে হয় এবং হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়।'[১৪] জ্ঞানসাধনাই সৃষ্টিলোকে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছে।[১৫] বস্তুতান্ত্রিক প্রয়োজনের সাথে সাথে মানুষের আত্মিক উন্নয়নের জন্যও জ্ঞান শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। 'মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ ইলম তালাশ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। এখানে ইলম অর্থ যদি সব বিদ্যাই হয় তবে কেউ এই ফরয আদায় করতে পারবে না। ডাক্তারি বিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা, কৃষি বিদ্যা ইত্যাদি শেখা সবার উপর ফরয হতে পারে না। তাই এই হাদীসে যে ইলম হাসিলের কথা বলা হয়েছে তা অবশ্যই ওহির ইলম।'[১৬] একথা অবশ্যই মানতে হবে যে সকল জ্ঞানের মূলেই আছে ওহির জ্ঞান বা ইলম অর্থাৎ জীবিকার জন্য মানুষ যে সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা করে তার সবকিছুর মূলেই আছে ওহির জ্ঞান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে হালাল রুজী তালাশ করার জন্য আমরা যে বিদ্যা শিক্ষা করি তাও পরোক্ষভাবে ফরয। 'সুতরাং দেখা যাচ্ছে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে উন্নয়নের প্রধান নিয়ামক হল শিক্ষা। তাই প্রতিটি দেশেই উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে শিক্ষাকে।'[১৭]

**৫. শিক্ষার ধরণ ঃ**

শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। মানুষ জন্মের পর থেকে মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত শেখে। তাই শিক্ষা লাভের ধরণ বিভিন্ন। শিক্ষার ধরণ মূলতঃ তিনটি ঃ[১৮]

(ক) আনুষ্ঠানিক শিক্ষা

(খ) অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও

(গ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা।

---

১৪. মুহাম্মদ আবুল হুসাইন, ছাত্রজীবনে ইসলামের দাবী, প্রকাশ ঃ মে-২০১১, পৃষ্ঠা ০৯।

১৫. অধ্যাপক গোলাম আযম, ইসলাম ও দর্শন, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, মুদ্রণ ঃ জুন ২০১২, ঢাকা, পৃষ্ঠা - ০৫।

১৬. অধ্যাপক গোলাম আযম, পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসাবে ইসলামের সহজ পরিচয়, মুদ্রণ ঃ জুন ২০১২, ঢাকা, পৃষ্ঠা - ৪৮।

১৭. ডক্টর মাহরুফ চৌধুরী, বাংলাদেশের শিক্ষা: জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০৯ সম্পর্কে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া, http://www.sonarbangladesh.com/article.php?ID=1255

১৮. শিক্ষা-উইকিপিডিয়া, http://bn.wikipedia.org/WiKi/শিক্ষা



www.pathagar.com

**(ক) আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ঃ**

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ধারাবাহিক এবং ক্রম উচ্চস্তরে বিন্যস্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে বুঝানো হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো থাকে। শিক্ষার্থী একটি বয়সে আনুষ্ঠানিক উপায়ে শিক্ষা অর্জন শুরু করে এবং ধারাবাহিকভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থাকে।[১৯]

**(খ) অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ঃ**

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য ধরণ। মানুষ তার জন্মের পর থেকে এটি নানাভাবে শিখছে। এই শিক্ষা তার সমাজের কাছ থেকে হচ্ছে, পরিবারের কাছ থেকে হচ্ছে, আবার গুরুজনের কাছ থেকে কিংবা বিশিষ্ট বা সাধারণ ব্যক্তির কাছ থেকে এবং বন্ধু-বান্ধবের মাধ্যমেও হচ্ছে। আবার প্রকৃতির কাছ থেকেও মানুষ শিখছে। প্রতিনিয়ত তার শিক্ষার চেষ্টা অব্যাহত থাকে। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে শিখে। এই যে অনির্দিষ্ট নানা উপায়ে মানুষ শিখছে এটাই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাই আমাদের শিক্ষার বা আচার-আচরণের অনেক বৈশিষ্ট্য ঠিক করে দেয়। জন্মের পর একটি শিশুর কিভাবে কথা বলতে হবে তাকে আলাদা করে শিখাতে হয় না, সে নিজে নিজে তার পরিবারের সবাইকে দেখেই শিখে। এইভাবেই সূচনা হয় অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার। প্রাচীন সমাজে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাই ছিল শিক্ষা লাভের একমাত্র উপায় এবং এ শিক্ষা ছিল সর্বজনীন। বাঁচার জন্য এবং বাঁচার মধ্যে দিয়ে এ শিক্ষা অর্জিত হতো। তখন সামাজিকীকরণ ও শিক্ষার মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। আধুনিক সমাজে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আধিপত্য সত্ত্বেও পারিবারিক শিক্ষাই এখনো শিশুর মানসিক বিকাশ ও চরিত্র গঠনে মূখ্য ভূমিকা পালন করে।[২০]

**(গ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ঃ**

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা শিক্ষার একটি অন্যতম ধরণ। মূলত: উন্নয়নশীল দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের আলোকে এই ধারার উৎপত্তি। সাধারণতঃ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতি বা প্রতিষ্ঠানের বাইরে সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠির জন্য বিশেষ উদ্দেশ্যে সংগঠিত এবং বিশেষ শিখন চাহিদা পূরণের জন্য আলাদাভাবে বা সমন্বিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরিচালিত শিক্ষামূলক কার্যক্রমই হচ্ছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (Non formal education)।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ধারণা নতুন নয়। উন্নয়নশীল দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার আগেই অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে (drop out) বা কোন না কোন কারণে প্রাথমিক

---

১৯. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-ইউকিপিডিয়া, http://bn.wikipedia.org/WiKi/আনুষ্ঠানিক_শিক্ষা
২০. প্রাগুক্ত



www.pathagar.com

শিক্ষাচক্র (Primary Education Cycle) সমাপ্ত করার আগেই স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। ফলে এইসব দেশে এইভাবে নিরক্ষর জনগণের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। তাই তাদের মাঝে এইসব দেশের বিশাল নিরক্ষর জনগোষ্ঠির অন্তর্গত সুবিধাবঞ্চিত (Disadvantaged) ছেলে-মেয়ে, কিশোর-কিশোরী এবং বয়স্ক লোকদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ (Second Chance of Education) প্রদান করা যায়। তাই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ দানকারী কার্যক্রমও বলা হয়।

আবার উন্নয়নশীল দেশসমূহে দেখা যায় সরকারের একার পক্ষে সকল শ্রেণীর সকল মানুষের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় না। তাই সেসব ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সহায়ক/সম্পুরক ও পরিপূরক (Supplementary and Complementary) হিসেবেও কাজ করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। তবে কখনই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করতে পারে না।

**উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উল্লেখযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্য ঃ**[২১]

১. এটি একটি সুশৃঙ্খল নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত উন্মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা।
২. শিক্ষাক্রম নির্দিষ্ট নয়, আর থাকলেও শিথিলযোগ্য।
৩. ডিগ্রীমুখী বা সার্টিফিকেটমুখী শিক্ষা নয়।
৪. এটি স্থানীয় সুযোগ সুবিধা ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম।
৫. শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুসারে বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়।
৬. ব্যবহারিক দিকগুলোর প্রতি বেশি লক্ষ্য রাখা হয়।
৭. আলাদাভাবে পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থা নেই তবে ধারাবাহিক মূল্যায়ণের ব্যবস্থা আছে।

## ৬. প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠন প্রচেষ্টার ইতিহাস ঃ

ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশ শাসন পূর্বকালে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল তা ছিল সে সময়ের সমাজ-রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বৃটিশ আগমনের পর এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে তাদের প্রয়োজন অনুসারে নতুন সাজে সাজাবার তারা নানা প্রচেষ্টা চালিয়েছে। ১৭৫৭ সাল হতে ঐ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ইংরেজগণ ভারতবাসীদের শিক্ষার জন্য আদৌ মাথা ঘামাননি। ১৭৯২ সালে সর্বপ্রথম মিষ্টার অলিভার

---

২১. উপানুষ্ঠানিকশিক্ষা-উইকিপিডিয়া, http://bn.wikipedia.org/WiKi/উপানুষ্ঠানিক_শিক্ষা



www.pathagar.com

ভারতবাসীদের শিক্ষার জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। অবশেষে ১৮১৩ সালে ভারতবাসীদের শিক্ষা সম্পর্কে বিবেচনা ও সুপারিশ করার জন্য এক শিক্ষা কমিটি নিয়োজিত হয়। ১৮১৪ সালে কমিটির সুপারিশ অনুসারে ভারতবাসীদের শিক্ষার জন্য বড় লাটের নামে এক আদেশ জারি করা হয়। ১৮২৩ সালে গঠিত হয় শিক্ষা কমিটি। এই কমিটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু কলেজগুলোকে উৎসাহ দানের প্রতি লক্ষ্য রাখা। উক্ত কমিটির মাধ্যমে এদেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় তা ছিল মুসলিমদের জন্য প্রতিকূল, নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় মুসলিম ছাত্রদের জন্য ধর্ম সম্পর্কীয় প্রাথমিক জ্ঞান লাভের কোন ব্যবস্থা ছিল না। তা ছিল মুসলিমদের পক্ষে একটা অসহনীয় ব্যাপার। এই শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল শুধু পার্থিব স্বার্থের উপর ভিত্তি করে রচিত। এরপর পুনরায় ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই পরিষদের নিয়মাবলী ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সঙ্গে যুক্ত। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে কোন মনীষার বাহনরূপে নয়, ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বের সর্বময় প্রকাশ-মাধ্যমরূপে দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষা গভীরভাবে জীবনের সাথে গ্রথিত হোক এবং তা ছড়িয়ে যাক সর্বস্তরে। লোক শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে যে এদেশের আর্থসামাজিক বিবিধ সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব এ বিশ্বাসে তিনি ছিলেন দৃঢ়মূল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (০৭ মে, ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ-০৭ অগাস্ট, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ) নেতৃত্বে শিক্ষা কারিকুলামে তেমন কোন উন্নতি ঘটেনি। পরবর্তীতে শিক্ষাব্যবস্থার উপরে মহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর (০২ নভেম্বর, ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ-৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ) নেতৃত্বে গ্রহণ করা হয় বরদা পরিকল্পনা। এ গোটা পরিকল্পনা যে মৌলিক আদর্শ ও নীতিমালার ভিত্তিতে রচিত তার প্রধান দিকটি ছিল জাতির শিশুদের ভালো ব্যবসায়িক যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। পরিকল্পনা প্রণয়নকারীদের দৃষ্টিতে মনুষ্যত্ব ও উপার্জনের যোগ্যতা সমার্থক শব্দ। বস্তুবাদী ও ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমগ্র পরিকল্পনাটিকে এমনভাবে প্রভাবিত করে রেখেছে যে, এর মাধ্যমে যে বংশধর শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করবে, তারা নিরেট বস্তুবাদী হয়ে গড়ে উঠবে। বরদা শিক্ষা পরিকল্পনা থেকে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাদ দেয়া হয়। বাদ দেয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে মহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (মহাত্মা গান্ধী) বলেন: "আমরা বরদা শিক্ষা পরিকল্পনা থেকে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাদ দিয়েছি; কেননা, আজকাল ধর্মীয় শিক্ষা যেভাবে দেয়া হয় এবং যেভাবে তার বাস্তব অনুশীলন হয়ে থাকে, তাতে ঐক্যের পরিবর্তে বিভেদ সৃষ্টি হয়।" সকল ধর্মকে বাদ দিয়ে মহত্মাগান্ধীর ধর্মের শিক্ষা পাঠ্য তালিকাভূক্ত করা হয়। কারণ, এরপর যে বংশধর ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষিত হয়ে বের হবে, তাদের নৈতিক মত, বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার উৎস হবে একমাত্র গান্ধীর ধর্ম। এর ফলে পরবর্তী বংশধর, যারা বরদা পরিকল্পনাভূক্ত বিদ্যালয় সমূহ থেকে শিক্ষা লাভ করে



www.pathagar.com

বেরিয়ে আসবে, তাদের উপর বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং নতুন ভারতীয় জাতীয়তার ধারণা এত প্রবল হবে যে, তারা আপন সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষা দেয়ার তেমন ধার ধারবে না। সুতরাং এটা নিশ্চিতভাবেই ধরে নেয়া উচিৎ যে, তৃতীয় বংশধর পর্যন্ত পৌঁছাতে পৌঁছাতে ভারত সত্যিকার অর্থে এক জাতিতে পরিণত হয়ে যাবে।

একই সময় মধ্য প্রদেশে অন্য একটি শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল, যা ছিল বিদ্যামন্দির পরিকল্পনা নামে খ্যাত। এর প্রণেতা ছিলেন প্রাদেশিক মূখ্যমন্ত্রী মিস্টার শুকলা। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৯৩৭ সালের ৩০শে জুলাই মিস্টার শুকলাকে সভাপতি করে পল্লী অঞ্চলে বাধ্যতামূলক সর্বজনীন শিক্ষা চালু করার উপযোগী পরিকল্পনা তৈরি করার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করে। মধ্যপ্রদেশ বিধান সভায় কংগ্রেস সংসদীয় দল ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে পরিকল্পনাটির মঞ্জুরি দেয়। পরিকল্পনাকে মঞ্জুর করার পর যে সিলেবাস পরিষদ গঠিত হয়, মধ্য প্রদেশের একজন মুসলিমকেও তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। টেক্সটবুক কমিটিতেও একজন মুসলিম রাখা হয়নি। ফলে মধ্যপ্রদেশের শাসনাধীন মুসলিমদের আপন ভবিষ্যৎ বংশধরদের শিক্ষার ব্যাপারে কিছুই বলার স্বাধীনতা রইল না। বরোদার বিদ্যামন্দিরগুলোর জন্য শিক্ষক তৈরির ব্যবস্থা নিতে একটা ট্রেনিং স্কুল স্থাপন করা হয়। উক্ত স্কুলে মুসলিমদের অবস্থা ছিল বড়ই করুন। মধ্য প্রদেশের বিধান সভার সদস্য মৌলভী আবদুর রহমান সাহেব উক্ত ট্রেনিং স্কুল পরিদর্শনে গেলে দেখতে পান হিন্দু ও মুসলিম সকলেই ধূতি পরা। সেখানে সকল পাঠ্য বিষয় হিন্দী ও মারাঠী ভাষায় পড়ানো হয়। কেবলমাত্র উর্দূ বর্ণমালা শিখানোর জন্য একজন মুসলিমকে নিয়োগ করা হয়েছে। মুসলিম ছাত্ররা সেখানে অস্পৃশ্যদের মত থাকে, তারা আলাদা খাওয়া দাওয়া করে। পানি খাবার পাত্র পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারে না। প্রতিদিন বন্দে মাতরম সঙ্গীত দিয়ে স্কুল শুরু হয়। মুসলিম ছাত্রদেরকে প্রার্থনার ভংগীতে হাত জোড় করে ও মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়।

এ দুইটি শিক্ষানীতিই ছিল মুসলিমদের বিপক্ষে। বরদা পরিকল্পনা ও বিদ্যামন্দির পরিকল্পনার বিরুদ্ধে মুসলিমদের পক্ষ থেকে যেসব আপত্তি তোলা হয়েছে তার জবাবে অন্যান্য কথার সাথে সাথে একথাটিও বরাবর বলা হচ্ছে যে, যে দেশে বহুসংখ্যক ধর্মের অনুসারীরা বাস করে সেখানে সকলের ধর্মের শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারের পক্ষে করা সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে কেবলমাত্র সাধারণ বৈষয়িক শিক্ষার ব্যবস্থাই করা যেতে পারে। আর সর্বজনীন শিক্ষা চালুর জন্য ব্যাপক ভিত্তিক বাধ্যতামূলক ও ধর্মহীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা ছাড়া অন্য কোন কৌশল অবলম্বন করার



www.pathagar.com

থাকে না। অথচ ইউরোপের যেসব সুসভ্য দেশে ধর্মের কোনই গুরুত্ব নেই, সেসব দেশের মধ্যে ফ্রান্সসহ অন্যান্য দু'চারটা দেশ ছাড়া কোন দেশই ভারতের মত নীতি অবলম্বন করেনি। যেমন ইংল্যান্ডে ধর্মীয় সংগঠনগুলোর আপন উদ্যোগে নিজস্ব বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনায় অধিকার রয়েছে। সরকারী শিক্ষা বিভাগ শুধু তার তদারক করে থাকে এমনকি এ ধরনের বিদ্যালয়কে সরকার সাহায্যও দিয়ে থাকে। লিথুনিয়ার সরকারী বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক রাখা হয়েছে। কেবলমাত্র যেসব ছেলেমেয়ের পিতামাতা ধর্মীয় শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক নয় তারাই এর ব্যতিক্রম। তাছাড়া সেখানেও ধর্মীয় সংগঠনগুলোর নিজস্ব উদ্যোগে আপন বিদ্যালয় স্থাপনের অধিকার রয়েছে এবং সরকার তাদের এ শর্তে সাহায্য দিয়ে থাকে যে, ঐ সব বিদ্যালয়ে সরকারী শিক্ষানীতি অনুসারে বৈষয়িক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। পোল্যান্ডের যাবতীয় সরকারী বিদ্যালয়ে ও সরকারী আনুকূল্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক। বিভিন্ন ধর্মের স্বীকৃত সমিতিগুলোকে আপন আপন ধর্মের অনুসারীদের জন্য পাঠ্যসূচি নির্ধারণ ও বিদ্যালয়গুলোতে তাদের ধর্মীয় শিক্ষা তদারক করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।[২২]

১৯৪৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা লাভের পর এতদাঞ্চলের জাতি ও রাষ্ট্র যেসব গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তন্মধ্যে এখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থাই ছিল প্রধান। যার মৌলিক সমাধান হওয়া অপরিহার্য ছিল সর্বপ্রথম। কেননা একটা আদর্শবাদী দেশ ও রাষ্ট্রের পক্ষে শিক্ষা সমস্যাই হয় জীবন মরণের সমস্যা। বিশেষ করে এ কারণে যে, উত্তরাধিকার সূত্রে এতদাঞ্চলের জনগণ যে শিক্ষা ব্যবস্থা লাভ করেছিল, তার প্রতিষ্ঠা ও রূপকার ছিল তাদেরই প্রাক্তন প্রভু সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ। তারা এদেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিল তার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করার জন্য তিনটি কথা মৌলিকভাবে মনে রাখতে হবে। একটি হল এই যে, ইংরেজ ছিল তখন পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতার অগ্রণী। একটি বস্তুবাদী সাম্রাজ্যবাদী জাতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা অবশ্যই বস্তুবাদী চিন্তা ও দর্শনমূলক হবে; নিতান্ত বৈষয়িক ও উপস্থিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ এবং নীতিহীন ভোগবাদ ও স্বার্থবাদই হবে সে শিক্ষাব্যবস্থার মৌল দৃষ্টিকোণ। এটি খুবই স্বাভাবিক কথা এর ব্যতিক্রম ধারণামাত্র করার যেতে পারে না। আর দ্বিতীয় কথা হল, ইংরেজ ছিল এদেশের বিজয়ী প্রভু, মালিক-মুখ্তার। সেই প্রভুরা এতদঞ্চলের অধিবাসীদের, যাদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করেছিল, তারা ছিল তাদের

২২. মনসূর আহমদ, ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষানীতির ব্যর্থতা-আমাদের শিক্ষানীতি যা চূড়ান্ত হতে যাচ্ছে! ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি আমাদের জন্য কি আনবে? অকটোবর ১৭, ২০০৯। সূত্রঃ http://www.sobewhovrinblog.net/blog/rajniti007blog/29027580



www.pathagar.com

বিজিত গোলাম। গোলাম জাতির জন্য এমন শিক্ষাব্যবস্থা তারা স্বভাবতই চালু করতে পারে না, যা গোলামদেরকে প্রভু বানিয়ে দিতে পারে কিংবা প্রভু হওয়ার স্বপ্ন দেখাতে পারে। অন্য কথায়, গোলাম জাতিকে আরো গোলাম বানানোর উপযোগী শিক্ষাই তারা দিতে চেয়েছে, প্রভু বা স্বাধীন জাতির উপযোগী শিক্ষা নিশ্চয়ই দিতে চায়নি। আর তৃতীয়ত, একথাও উপেক্ষণীয় নয় যে, ইংরেজরা ছিল কট্টর খৃস্টান; তারা এই বিশাল অঞ্চলের রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল মুসলিমদের কাছ থেকে। আর এ রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নেবার সময় তারা প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল কেবলমাত্র মুসলিমদের তরফ থেকেই। এ কারণে খুব স্বাভাবিকভাবেই তারা ছিল চরম মুসলিম বিদ্বেষী এবং মুসলিমদের ঘোরতর দুশমন। তারা স্পষ্টত বুঝতে পেরেছিল, মুসলিমদের জিহাদী শক্তির উৎস যে জীবন-দর্শন ও শিক্ষা ব্যবস্থা, তাকে নিঃশেষে খতম না করা পর্যন্ত এই লোকদের উপর ইংরেজ শাসনের মজবুত বুনিয়াদ কায়েম হতে পারে না।

তাই একথা পরিষ্কার যে, ইংরেজের প্রবর্তিত সে শিক্ষা ব্যবস্থা স্বাধীন দেশ ও জনগণের জন্য কোন দিক দিয়েই উপযুক্ত ছিল না। দেশ-বিভাগের পর তা এখানে একদিনের তরেও চালু থাকা উচিত ছিল না, বরং অনতিবিলম্বে সে শিক্ষা ব্যবস্থা বদল করে এদেশের জনগণের উপযোগী একটি আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা একান্ত কর্তব্য ছিল। কিন্তু এ জাতির দুর্ভাগ্যই এখানে যে, এদেশে তা করা হয়নি। পাকিস্তান উত্তরকালে শাসকরা নিজেদের ক্ষমতা নিশ্চিত ও নিষ্কন্টক করার জন্যই দিন-রাত ব্যতিব্যস্ত ছিল। মুসলিম জাতির আদর্শিক ভবিষ্যত নির্মাণের জন্য অপরিহার্য ছিল যে শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন, তার প্রতি একবিন্দু দৃষ্টি নিক্ষেপের ফুরসতও তাদের হয় নি, কিংবা বলা যায় ইংরেজের নিকট থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাব্যবস্থার কোন পরিবর্তন সাধনেরই প্রয়োজন বোধ করেন নি তারা এবং তা করতেও চাননি। প্রয়োজন মনে করেননি এ কারণে যে, শাসনযন্ত্রের সাথে জড়িত সব লোকই ছিল ইংরেজের অনুরূপ জীবন-দর্শন ও জীবন-ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট ও আস্থাবান। ফলে স্বাধীন দেশ ও জনগণের বেলায় যে তার ব্যতিক্রম কিছু হওয়া দরকার, তার চেতনাটুকু তাদের মনে জাগেনি। তারা এ কাজ করতে চাননি এজন্য যে, তারা স্পষ্টত বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুসলিম নাগরিকদের উপযোগী এবং তাদের আদর্শিক চেতনার অনুরূপ শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে চালু করা হলে তা শাসকদেরই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের ভবিষ্যতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলবে।

পাকিস্তান উত্তর যুগে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য যে কোন চেষ্টাই হয়নি, তা অবশ্য বলা হচ্ছেনা। এ পর্যায়ে যা চেষ্টা হয়েছে, সংক্ষেপে তা এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে সর্বপ্রথম একটি নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান কায়েমের চার বছর পর ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে নিখিল



www.pathagar.com

পাকিস্তান ভিত্তিক এক শিক্ষা পরিকল্পনা রচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই সময় এ্যাডভাইজারী বোর্ড, কাউন্সিল অব টেকনিকাল এডুকেশন এবং ইন্টার ইউনিভার্সিটি বোর্ড-এর এক মুক্ত অধিবেশন হয়। এরপর ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে কমার্শিয়াল এডুকেশন কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হয়। ১৯৫৫ সালে প্রথম রচিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা সম্পর্কেও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৫৬ সালে লাহোরে সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ড একটি কমিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার সম্পর্কিত প্রস্তাবাদি পেশ করে। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) সরকার শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠন করে ও তার রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। ১৯৫৯ সালে ফীল্ড মার্শাল জেনারেল আইয়ুব খান নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকার সমগ্র দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পর্যালোচনা করে দেশ ও জাতির প্রয়োজনের দৃষ্টিতে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা রচনার লক্ষ্যে একটি 'শিক্ষা কমিশন' নিয়োগ করেন। এ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে সারাদেশে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।[২৩]

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর জাতিকে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠিকে জনসম্পদে পরিণত করার জন্য শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ লক্ষ্যে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ১৯৭২ সালে এক আদেশে ডক্টর কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন নামে একটি কমিশন গঠন করে। কমিশনের সদস্যগণ ১৯৭৩ সালে ভারত সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ভারত সফর করেন। এক মাসব্যাপী এ সফরে কমিশনের সদস্যগণ সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৯৭৪ সালে কমিশন সরকারের কাছে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে।

রিপোর্টটি প্রকাশিত হবার পর পরই এটি বিতর্কিত হয়ে পড়ে। কমিশনের সুপারিশমালায় বেশ কিছু সুপারিশ ছিল যা প্রকৃতপক্ষে দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর ও যুগোপযোগী এবং শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও সংস্কার বলা যায়। আবার সুপারিশমালার মধ্যে এমন কিছু মৌলিক দিক ও বিষয় ছিল যা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপরীত এবং জনগণের চিন্তা-চেতনা, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিক জীবনবোধের পরিপন্থী।[২৪]

---

২৩. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি), শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ৫ম প্রকাশ ঃ মে, ২০১১, পৃষ্ঠা-৩১, ৩২ ও ৩৩

২৪. একেএম আজহারুল ইসলাম ও শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম, প্রকাশ ঃ জুন ২০০৩, দি ইসলামিক একাডেমী, কেম্ব্রীজ, যুক্তরাজ্য, পৃষ্ঠা-৪-৫



www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে কুদরত-ই-খুদা কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য ছিল একটি বিশেষ রাজনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করার লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন। অর্থাৎ ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির উপযোগী ধর্মবোধ বিবর্জিত একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা। কমিশন নিষ্ঠার সাথে সে দায়িত্ব পালন করছে। কমিশন শিক্ষার যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছে তাকে আদর্শিক দিক থেকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়; যথা- (১) সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির কর্মী তৈরি ও (২) ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা বিবর্জিত সেক্যুলার চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি ও তার আলোকে ব্যবহারিক জীবন গড়ে তোলা।[২৫] এ পর্যায়ে সরকারের শিক্ষা যা কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট থেকে প্রমাণিত হয়েছে তা পূর্বাপেক্ষা অধিক মারাত্মক রূপে দেখা দিয়েছে এ জাতির পক্ষে এবং সেই সাথে দীন-ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের দৃষ্টিতে এ রিপোর্ট হচ্ছে চরম কলঙ্কজনক ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক। যেখানে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন ব্যবস্থার ভিত্তিতে পুনর্গঠন করার দায়িত্ব ছিল, সেখানে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেই দাবি করা হল যে, আদর্শ জাতি গঠনই এ সরকারের লক্ষ্য। অথচ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে যে দাবি করা হচ্ছে তাও আদৌ যথার্থ নয়।[২৬] যাইহোক এরপর 'মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের আমলে ১৯৭৬ সালে প্রফেসর মুহাম্মদ শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে "জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি" গঠন করা হয়। ১৯৭৮ সালে শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমদের নেতৃত্বে শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ. এইচ. এম. এরশাদের আমলে ১৯৮৩ সালে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর আব্দুল মজীদ খানের নেতৃত্বে 'মজীদ খান কমিটি' গঠন করা হয়। ১৯৮৭ সালে অধ্যাপক মফিজুদ্দীন আহমদকে চেয়ারম্যান করে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বেগম খালেদা জিয়ার আমলে কোন শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়নি। তখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং বেসরকারী উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য কমিশন গঠিত হয়। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত শেখ হাসিনার আমলে ডক্টর কুদরত-ই-কুদা রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রফেসর মুহাম্মদ শামসুল হকের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষানীতি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিকে শিক্ষানীতি প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২০০১ সালে ৪ দলীয় জোট সরকার কায়েম হবার পর ডক্টর মুহাম্মদ মনীরুজ্জামান মিঞাকে চেয়ারম্যান করে 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩' গঠন করা হয়। এমনকি ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচিত বর্তমান শেখ হাসিনার মহাজোট সরকারও যে শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছেন তার পুরোটাই ধর্মনিরপেক্ষ। এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশের ইংরেজী মাধ্যমের স্কুলগুলোতে যে লেখাপড়া ('ও'

---

২৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫

২৬. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি), শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ৫ম প্রকাশ : মে, ২০১১, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩৩-৩৪



www.pathagar.com

লেভেল এবং 'এ' লেভেল পর্যায়ের শিক্ষা) প্রচলিত আছে তা সম্পূর্ণই পশ্চিমা শিক্ষানীতিতে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। আবার মাদ্‌রাসা শিক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় তাতেও দু'টি ধারা বিদ্যমান একটি প্রাচীনতম 'কওমী' ধারা এবং অপরটি তুলনামূলকভাবে আধুনিক 'আলীয়া' ধারা।

এখানে উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত শিক্ষা কমিশন ও কমিটিসমূহের রিপোর্ট ও সুপারিশমালার কোনটাই যথাযথ বাস্তবায়িত হতে পারেনি। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথেই পূর্ববর্তী সরকারের আমলে প্রণীত শিক্ষা-ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায় এবং নতুন ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়। ঐ সব সুপারিশে যারা একমুখী শিক্ষাব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছেন তারা ধর্ম শিক্ষাকে বলতে গেলে বাদই দিয়েছেন। আর যারা ধর্ম-শিক্ষাকে বাদ দেননি তারা ধর্মীয় শিক্ষাকে ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার লেজুড় হিসেবে রেখেছেন।[২৭] এ সব চেষ্টা-প্রচেষ্টা সম্পর্কে একটি কথা বলাই যথেষ্ট এবং তা এই যে, বাংলাদেশের শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থায় সেই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষ গতানুগতিকতার প্রবল প্রাধান্য অপরিবর্তিতই রয়েছে। তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, 'জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পরও আজ পর্যন্ত এখানে আদর্শভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়নি।'[২৮]

### ৭. মুসলিম সমাজে ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষানীতির বিরূপ প্রভাব ঃ

ইংরেজ জাতি যখন মুসলিমদের উপর প্রভুত্ব করার সুযোগ পেলো তখন তা সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করলো তা ছিল মুসলিমদেরকে শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের মানসপুত্রে পরিণত করা। তাদের সে চেষ্টা সফল হয়েছে। তারা জানতো যে, মুসলিমদেরকে যদি কুরআন-হাদীসের শিক্ষা থেকে ফিরানো না যায়, তাহলে তাদের উপর প্রভুত্ব করা যাবে না। তাই ভিক্টোরিয়ান যুগের প্রধানমন্ত্রী মিষ্টার গ্লাডস্টোন হাউস অব কমন্সে দাঁড়িয়ে পবিত্র কুরআন মাজিদ হাতে নিয়ে বলেছিল "যতদিন না মুসলিমদের এই কুরআন থেকে বিমুখ করা যাবে ততদিন তাদের উপর শান্তির সঙ্গে প্রভুত্ব করা যাবে না।" তাই তারা মুসলিমদেরকে কুরআন বিমুখ করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তাতে সফলকাম হয়েছে। অত:পর তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা নিম্নের কাজগুলো শুরু করেছিলঃ

১. ইসলামী আইন-কানুন ও ইসলামী আদর্শকে কুৎসিৎ থেকে কুৎসিতরূপে সমাজের

---

২৭. অধ্যাপক গোলাম আযম, শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামী রূপরেখা, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, মুদ্রণ ঃ এপ্রিল ২০১০, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৬-১৭

২৮. অধ্যায় ০৫ঃ বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা,
সূত্রঃ www.priyoboi.com/2003/08/blog-post_6575.html



www.pathagar.com

সম্মুখে তুলে ধরা, যেন মুসলিমদের মনে ইসলাম সম্পর্কে যে পবিত্র ধারণা ছিল তা নষ্ট হয় এবং ইসলামের প্রতি যেন প্রত্যেকেরই একটা ঘৃণাভাব সৃষ্টি হয়।

২. ইসলামকে একটা আনুষ্ঠানিক ধর্ম হিসেবে প্রচার করা।

৩. আল-কুরআন শুধু বানান করে পড়লেই অনেক সওয়াব হবে, তা অর্থ বুঝে পড়ার দরকার নেই- এ কথা বুঝানো। আমরা প্রত্যেকেই বুঝি যে, পড়ার অর্থ হলো বুঝে পড়া। কিন্তু একমাত্র আল-কুরআন যা বুঝে পড়ার বেলাতেই আমাদের ভুল ধারণা যে, তা বুঝে পড়ার পরিবর্তে শুধু বানান করে পড়লেই কুরআন তিলাওয়াতের হক আদায় হয়ে যায়।

৪. তারা মুসলিম ছাত্রদের আরো শিখালো– (ক) ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থাই উত্তম; (খ) তাদের অর্থব্যবস্থাই উন্নততর; (গ) তাদের সমাজব্যবস্থাই আদর্শস্থানীয়; (ঘ) তাদের গণতন্ত্রই যুক্তিগ্রাহ্য ও গ্রহণযোগ্য; (ঙ) ফরাসী বিপ্লবই মানবাধিকারের প্রতি প্রথম স্বীকৃতি দেয়।[২৯] অথচ এই প্রত্যেকটি পাশ্চাত্যরীতিই ঘৃণিত যেমন তাদের সমাজব্যবস্থায় মূলত: পারিবারিক অশান্তির বীজ রোপিত যেখানে সমাজ ভাঙ্গার করুণসুর রণিত। তাদের অর্থব্যবস্থা যার ভিত্তি মূলত: সুদের উপর প্রতিষ্ঠিত যা দরিদ্রকে আরো দরিদ্র ও ধনীকে আরো ধনী করে সমাজে সম্পদের অসমবন্টন নিশ্চিত করে। পাশ্চাত্যের সমাজব্যবস্থা মূলত: অশ্লীলতার স্রোতে ভাসমান। তাদের গণতন্ত্র সমাজে আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির প্রসার করে। আর ফরাসী বিপ্লবতো সেদিনের ঘটনার তারও বহু আগে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক প্রণীত মদীনা সনদই হচ্ছে পৃথিবীতে মানবাধিকারের প্রথম স্বীকৃতি।

অথচ, তারা এই ধরণের শিক্ষার মাধ্যমে কৌশলে ও চুপিসারে মুসলিম ছাত্রদের ব্রেন ওয়াশ করে দেয়। ফলে ইসলামের সঙ্গে শত্রুতার ব্যাপারে আজ অমুসলিমদের চেয়েও মুসলিম শিক্ষিত সমাজই হলো বেশি তৎপর। তারা শিক্ষাগার থেকে বের হয়েই ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।[৩০] তেহরানে ২৮তম আন্তর্জাতিক কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাক্তিদের সঙ্গে এক সাক্ষাতে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ্ আলী খামেনী বলেনঃ "আল-কুরআনের মহান শিক্ষা এড়িয়ে জাতিগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা খুবই কঠিন কাজ।" তেহরান বেতারের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা ইরনা এ কথা জানিয়েছে।[৩১] যার বাস্তব উদাহরণ আল-কুরআনের

---

২৯. খন্দকার আবুল খায়েব, ইসলামী জীবন দর্শন, প্রকাশ ঃ নভেম্বর ২০০৯, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৮-১৯।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯।

৩১. সালমা আক্তার মেরী, ইসলামী শিক্ষা থেকেই মধ্যপ্রাচ্যে গনজাগরণ, ০৭ ই জুলাই, ২০১১, সকাল ০৯:৫২, সূত্রঃ www. sonarbangladesh.com/blog/salmaaktermerry/49795



www.pathagar.com

শিক্ষা বর্জিত পাশ্চাত্য শিক্ষিত মুসলিম নামধারী ব্যাক্তিদের মধ্যে আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি।

**৮. বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন ধারার শিক্ষাক্রম ঃ**

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাক্রম মূলতঃ তিন প্রকার ঃ (ক) বাংলা মাধ্যমের সাধারণ শিক্ষা, (খ) মাদ্‌রাসার ইসলামী শিক্ষা এবং (গ) পাশ্চাত্য মডেলের ইংরেজী মাধ্যমের শিক্ষা।

**৮.১ বাংলা মাধ্যমের সাধারণ শিক্ষা ঃ**

বাংলাদেশ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের অধীনে পরিচালিত প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের কলেজগুলো সবই এই শিক্ষাবোর্ডের অধীনে বাংলা মাধ্যমের সাধারণ শিক্ষার আওতাভূক্ত। এ শিক্ষাক্রমের অধীনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্য ব্যতীত প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভূগোল, সামজবিজ্ঞান, পৌরনীতি, ইতিহাস, দ্বীনিয়াত প্রভৃতি। এক্ষেত্রে প্রণীত পাঠ্যপুস্তক সমূহ সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত। এমনকি জীবন-দর্শন, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কিত লেখাগুলোও সম্পূর্ণ ইসলাম ধর্ম নিরপেক্ষ এবং সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন। এই শিক্ষানীতিতে মক্কা ঘোষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কোন প্রতিফলন ঘটে নি। বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষানীতিকে মক্কা ঘোষণার সাথে সঙ্গতিশীল করতে হলে শিক্ষানীতির কিছু শব্দ বা বাক্য পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজনের মাধ্যমে সম্ভব নয়। এর জন্য চাই শিক্ষানীতির সার্বিক পুনর্গঠন। ১৯৮১ সালের আন্তর্জাতিক ফোরামে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে মুসলিম দেশের রাষ্ট প্রধানগণ শিক্ষা সম্পর্কিত পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের বিষয়ে যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন দীর্ঘকাল যাবৎ বলতে গেলে এটা প্রকাশ না করে চেপে রাখা হয়েছে। শুধু আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগ ও সরকারী প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে নিজেরা নিশ্চেষ্ট থাকলেই সচেতন নাগরিকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। জনমত সৃষ্টির জন্যে ইসলামী শিক্ষার রূপরেখা ও তার মডেল সামজে স্থাপন করতে হবে। সে লক্ষ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্ঠা অব্যাহত রাখতে হবে এবং তাদের পারস্পরিক যোগাযোগ থাকতে হবে। একটা সঠিক নীতিমালা তৈরি ও তদানুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন এবং সে আলোকে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে মডেল সৃষ্টি করতে হবে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদ, ইসলামকি এডুকেশন সোসাইটি, আল-হিক্‌মাহ্‌ সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা এই লক্ষ্যে তাদের প্রচেষ্ঠা অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু প্রচেষ্ঠা খুবই অপ্রতুল।[৩২]

---

৩২. এ.কে.এম আজহারুল ইসলাম ও শাহ্‌ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্‌রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম, প্রকাশ ঃ জুন ২০০৩, দি ইসলামিক একাডেমী, কেম্ব্রীজ, যুক্তরাজ্য, পৃষ্ঠা-৭৮,৭৯ ও ৮০।



www.pathagar.com

### ৮.২. মাদ্‌রাসার ইসলামী শিক্ষা ঃ

বাংলাদেশের মাদ্‌রাসা শিক্ষা দু'টি ধারায় বিভক্ত ঃ (ক) বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে আলীয়া মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও (খ) বাংলাদেশ কাওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে কাওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষা।

### ৮.২.১. আলীয়া মাদ্‌রাসা শিক্ষাক্রম ঃ

বাংলাদেশের সমস্ত আলীয়া মাদ্‌রাসাগুলো জাতীয় সরকার নিয়ন্ত্রীত বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে পরিচালিত। 'এ বোর্ডের আওতাভূক্ত মাদ্‌রাসার সংখ্যা বর্তমানে ৬৮৩৮ টি।'[৩৩] 'উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন আমলে ১৭৮১ সালে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস মুসলিম যুবকদিগকে আইন-আদালতের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আরবী ও ফারসি শিক্ষার জন্য বিখ্যাত কলিকাতা মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন।'[৩৪] এটিই ছিল উপমহাদেশের প্রথম আলীয়া মাদ্‌রাসা যার উত্তরসূরী বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের আলীয়া মাদ্‌রাসা গুলো। যাইহোক এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় 'বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড' - এর আওতাধীন আলীয়া মাদ্‌রাসা গুলো। 'বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড নিম্নস্তরের জন্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে সক্ষম হলেও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই রচনা করতে সক্ষম হয় নি। এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড প্রণীত পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করা হয়। ১৯৮৩ সালের পর সরকারীভাবে মাদ্‌রাসা শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকায়নে আর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ১৯৯৯ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে আট শতাধিক মাদ্‌রাসার অনুদান বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়। মাদ্‌রাসা শিক্ষার ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত একমাত্র মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ডটিও সরকারী বৈষম্যের শিকার।'[৩৫]

### ৮.২.২. কাওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষাক্রম ঃ

বাংলাদেশের বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সমস্ত কাওমী মাদ্‌রাসাগুলো বাংলাদেশ কাওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ডের আওতাধীন। ১৮৭০ সালের দিকে উত্তর ভারতে দেওবান্দ, সাহারানপুর, মুরাদবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসা সমূহের অনুকরণে এদেশের কওমী মাদ্‌রাসা সমূহ পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে দারুল

---

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৬।

৩৪. অধ্যাপক কে. আলী, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস, মুদ্রণ ঃ ১৯৮৯, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৫৭৩।

৩৫. এ.কে.এম আজহারুল ইসলাম ও শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্‌রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম, প্রকাশ ঃ জুন ২০০৩, দি ইসলামিক একাডেমী, কেমব্রীজ, যুক্তরাজ্য, পৃষ্ঠা- ২০৫ ও ২০৬।



www.pathagar.com

উলূম দেওবান্দের আদর্শ, উদ্দেশ্য, নিসাব ও শিক্ষাব্যবস্থা অনুসরণে স্থাপিত সর্বপ্রথম কওমী মাদ্‌রাসা হলো মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্‌রাসা। চট্টগামরে অন্তর্গত হাটহাজারী থানায় ১৯০১ সালে এই মাদ্‌রাসা স্থাপিত হয়। কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ইসলামিয়াতের দিকে গভীর জ্ঞান অর্জনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তাদের গৃহীত শিক্ষাপদ্ধতি প্রচীনতম। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে কওমী মাদ্‌রাসা বাংলার পাশাপাশি আরবী, উর্দু ও ফারসি ভাষায় লিখিত বই পাঠ্য করা হয়েছে। কোন কোন বিষয়ের পাঠ্য বইসমূহ শতাব্দী প্রাচীন। তবে কাওমী মাদ্‌রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করলে যুগোপযোগী শিক্ষিত না হতে পারলেও একজন খাঁটি মুসলিম ও ইসলামী পন্ডিত হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার মতো পর্যাপ্ত সুযোগ এর পাঠ্যসূচীতে রাখা হয়েছে।[৩৬]

**৮.৩. পাশ্চাত্য মডেলের ইংরেজী মাধ্যমের শিক্ষা ঃ**

আমাদের দেশের বেসরকারী ইংরেজী মাধ্যমের স্কুলগুলোতে যে লেখাপড়া ('ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল পর্যায়ের শিক্ষা) প্রচলিত আছে তা সম্পূর্ণই পশ্চিমা শিক্ষানীতিতে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। এক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা ঢাকাস্থ ব্রিটিশ কাউন্সিলে কেন্দ্রিয় পরীক্ষাগুলোতে অংশ গ্রহণ করে যা দেশের বাইরে থেকে প্রধানত লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়। 'এই ইংরেজী মাধ্যম শিক্ষায় বাংলা ও আরবী ছাড়া সমস্ত কোর্সগুলোই ইংরেজী বইয়ের মাধ্যমে ইংরেজীতে শিক্ষা দেওয়া হয়।'[৩৭] এগুলোর অধিক পরিমাণ ব্যয়বহুল হওয়ার শুধু সমাজের বিত্তশালী পরিবারের ছেলে মেয়েরাই এর শিক্ষা সুবিধা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

**৯. একমুখী ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ঃ**

এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কাওমী মাদ্‌রাসা বোর্ড (বেফাক) এর আওতাভূক্ত কাওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষাক্রম, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা বোর্ড এর অধীনে সমস্ত আলীয়া মাদ্‌রাসা শিক্ষাক্রম এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের আওতাভূক্ত স্কুল-কলেজের শিক্ষাক্রমকে ঢেলে সাজিয়ে, এখানে পরবর্তী ২০ নং অংশে বর্ণিত, উল্লেখিত সুপারিশমালার আলোকে নৈতিকতাপূর্ণ যুগোপযোগী একমুখী ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণোয়ন অধিক যুক্তিযুক্ত যা একই ইসলামী মনোভাব সম্পন্ন নতুন মুসলিম প্রজন্ম তৈরির লক্ষ্য অর্জনে অধিক ফলপ্রসু হবে। তবে আমাদের দেশের ইংরেজী মাধ্যমের

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৫, ১৯৪ ও ২০৫।

৩৭. English Medium Educaton, Source: http://www.en.wikipedia.org/wiki/Engilish_medium_education



www.pathagar.com

স্কুলগুলোতে যে লেখাপড়া ('ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল পর্যায়ের শিক্ষা) প্রচলিত আছে তা যেহেতু সম্পূর্ণই পশ্চিমা শিক্ষানীতিতে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত সুতরাং এগুলোকে আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতির বাইরে রাখাই বাঞ্ছনীয়।

**১০. প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির সাধারণ ত্রুটি ঃ**

শিক্ষা অর্থ জানা, বুঝা বা হৃদয়ঙ্গম করা। আজানাকে জানা, অবোধ্যকে বুঝা আর অশেখাকে শেখা। বস্তুত শিক্ষাই মানুষকে মানুষ করে। শিক্ষা ব্যতিরেকে মানুষ মানুষ নামের অযোগ্য হয়ে পড়ে। তাই শিক্ষা মানুষের জন্য অপরিহার্য মৌলিক প্রয়োজন।

মানুষের বস্তুগত দিকটাকে বড় করে দেখে পাশ্চাত্যদর্শন আমাদেরকে শিক্ষা দিল- মানুষ জন্তু-জানোয়ারের একটি পরিবর্তিত স্তর বৈ আর কিছু নয়। সমগ্র জীবজগতে বেঁচে থাকার একটা প্রতিযোগিতা চলছে। যার শক্তি আছে সেই টিকে থাকবে, অর্থাৎ যোগ্যতমেরই উদ্ধর্তন! সবল দুর্বলকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, এটাই নাকি নিয়তি। তাই ভোগের সংসারে বেঁচে থাকা বা টিকে থাকার জন্য যত ইচ্ছা ভোগবিলাস করে যাও। পক্ষান্তরে আরেকটি দল মানুষের বস্তুগত দিকটাকে বাদ দিয়ে আধ্যাত্মবাদের দিকে চরমভাবে ঝুঁকে পড়েছে। তারা মানুষের দেহের দাবির প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে। তারা বলে, সংসার ঝামেলার স্থান তাই এখান থেকে পালাও।

এ দুই প্রান্তিক দলের কেউই আসল মানুষের সন্ধান পায়নি। মানুষ তো শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমষ্টির নাম নয়। আবার আত্মাই মানুষের একমাত্র পরিচয় নয়। দেহ হচ্ছে আত্মার বাহন আর আত্মা দেহের সহিস। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দেহটি দান করেছেন এ সৃষ্টিকে উপভোগ করার জন্য। দেহের তাগিদেই সৃষ্টিকে তন্নতন্ন করে নানা রহস্য উদঘাটন করতে পারবে মানুষ! আবার দেহের পবিত্রতার জন্য আত্মাকেও সে সজীব ও প্রাণবন্ত রাখবে। ইসলামী শিক্ষাদর্শন মানব মনের সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। শুধু উত্তরের জন্যই উত্তর দেয়া হয়নি, সত্যকে সত্য বলে ঘোষণা করেছে আর মিথ্যাকে মিথ্যা বলে চিহ্নিত করেছে। মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনকে অতিসতর্কতা সহকারে বিবেচনা করে সামঞ্জস্য বিধানের একটা সুষ্ঠু ও সঠিক চেষ্টা করা হয়েছে।

ইসলাম বলে, এ সৃষ্টিলোক কোন আকস্মিক বস্তু নয়, বরং সুপরিকল্পিত। এর পেছনে একজন শক্তিশালী সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এটির অস্তিত্ব দান করেছেন। সৃষ্টির সেরা মানবগোষ্ঠি; মানুষের উপকারের জন্য সারা বিশ্ব, সৃষ্টিরাজিকে ব্যবহার করতে হবে- কাজে লাগাতে হবে। বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষ সৃষ্টিকে বিভিন্ন আকারে ও প্রকারে ব্যবহার করতে পারে। মানুষ তার বস্তুগত প্রয়োজন মেটাতে কিংবা মানসিক উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে এ সৃষ্টিলোক নিয়ে চিন্তা-গবেষণা কিংবা কারিগরি শিল্পের উন্নতি সাধন করতে পারে।



www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ একটি নৈতিক জীব। নৈতিকতাই তার বৈশিষ্ট্য। তাই তার জ্ঞানের বিকাশের সাথে থাকবে নীতিবন্ধন। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে তাকে অনেক বিষয়েই জ্ঞান আহরণ করতে হবে, জানতে হবে অনেক কিছু। কিন্তু এ কাজ করতে গিয়ে কোথাও নৈতিকতা হারালে বা ভুলে গেলে চলবে না। সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তাকে রাজনীতি চর্চা করতে হবে। তার বস্তুগত প্রয়োজন মেটাতে তাকে অর্থনীতির চর্চা করতে হবে। স্বাস্থ্য রক্ষার খাতিরে তাকে চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চা করতে হবে। এ ধরণের অসংখ্য প্রয়োজনে অসংখ্য শাস্ত্র তার অধ্যয়ন ও অনুশীলন করতে হবে। কিন্তু সবকিছু আলোচনা ও চর্চা হতে হবে ঐ একই জীবন-দর্শনের ভিত্তিতে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার প্রথম শ্রেণী হতে শেষ পর্যন্ত যা কিছু পড়ানো হয় তাতে ইসলামের জীবন দর্শন আদৌ প্রতিফলিত হয়না।

প্রতিটি বিষয় আলোচনাকালে যদি নৈতিক দৃষ্টিকোণ না থাকে, যদি সেগুলো নৈতিকতার রসে সিঞ্চিত না হয়, তবে শুধু আলাদাভাবে দীনিয়াত বা ইসলামিয়াতের লেজুড় জুড়ে দিলেই সাধারণ শিক্ষা ইসলামী শিক্ষা হয়ে যায় না; তা বরং কাকের পুচ্ছে ময়ূরের পালক জুড়ে দেয়ার মতোই হাস্যকর হয়ে দাঁড়াবে। এ ধরণের সংমিশ্রণে হিতে বিপরীত ফলই হয়ে থাকে। এর ফলে ধর্ম ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষার্থী আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতের প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তার সন্ধান পায় না; বরং অন্যান্য ক্ষেত্রে তাকে দেখানো হয় এ বিশ্ব-চরাচরে আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতের কোন প্রয়োজন নেই। এগুলোকে বাদ দিয়েও আমরা সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি। প্রকারান্তরে শিক্ষার্থীকে এ কথাই শিখিয়ে দেয়া হয়– আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতের কোন অস্তিত্ব নেই, আর থাকলেও তাদের কোন প্রভাব মানব জীবনে নেই। মানুষ স্বাধীন সত্তা নিয়ে স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের অধিকারী। আল্লাহকে যদি একান্তই মানতে হয়, তবে তাঁকে আকাশরাজ্যেই স্থান দাও, জমিনে তাঁর কোন প্রভুত্ব নেই।

ঐ একই শিক্ষার্থী যখন ইসলামের সবক নেয় তখন সে জানতে পায়, এ আকাশ-পৃথিবী ও এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর আইনে চলছে আর মানুষকেও তাই সেই আল্লাহর আইন-কানুনেই চলতে হবে। ক্লাসের সাতটি পিরিয়ডের ছয়টি পিরিয়ডেই সে যে বাস্তব শিক্ষা পেল তা আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতের প্রভাবমুক্ত। আর মাত্র একটি পিরিয়ডে সে শিখল আল্লাহকে উপাস্য ও প্রভু হিসেবে জীবনে মেনে চলতে হবে। তাই পরস্পর বিরোধী এ দু'টি দর্শনের সংঘর্ষে থিওরী পর্যায়ে নামমাত্র ইসলামী শিক্ষারই হার মানতে হয়। বর্তমানে ধর্ম শিক্ষাকে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করার যে গালভরা বুলি শুনতে পাওয়া যায় তা এমনিভাবেই অর্থহীন- শুধু অর্থহীনই নয়, মারাত্মক হয়ে দেখা দেয় শিক্ষার্থীর জীবনে। দীর্ঘ ষোলটি বছর ধরে একজন শিক্ষার্থী দেখা ও শেখার মাধ্যমে বুঝে নিল যে, ব্যাংক ব্যতীত দুনিয়া চলে না



www.pathagar.com

আর সুদ ব্যতীত ব্যাংকও চলে না। অতএব সুদ ব্যতীত দুনিয়া অচল। প্রচলিত অর্থনীতি এ ধরণের চিন্তাধারাই সৃষ্টি করে। এই শিক্ষার্থীকে যখন ইসলামিয়াতে শিখানো হয় যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন, তখন সে দিশেহারা হয়ে যায়।

আমাদের দেশে প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা যদিও একদিক দিয়ে কুরআন-হাদীসের জ্ঞানকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তবুও এ শিক্ষা জাতির পথ-নির্দেশ করতে সক্ষম হচ্ছে না। জীবন পরিক্রমাকে পারছেনা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। এ শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামকে অত্যন্ত পঙ্গু ও খোঁড়া হিসেবে পেশ করছে। ইসলাম যে সামগ্রিক জীবন-বিধান এবং যুগ-সমস্যার একমাত্র সমাধান- এ কথা বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে মাদ্রাসা হতে পাশ করে যারা বেরুচ্ছে, তারা জাতির নেতৃত্বদানে অক্ষমতা প্রদর্শন করছে। তাই আমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের পরিচয় পাচ্ছি না তাদের মধ্যে- না তাদের জ্ঞানে, না তাদের কর্মজীবনে।

তাই আমাদের শিক্ষা সমস্যার একমাত্র সমাধান হল এই যে প্রচলিত দু'টি শিক্ষাব্যবস্থাকে একত্রিত করে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে, যেখানে একটি স্বাধীন মুসলিম দেশের শিক্ষার্থীরা চলতি দুনিয়ার সর্বস্তরে নিজেদের আসন গেড়ে বসতে পারে। আমাদের জাতীয় আদর্শ যে ইসলাম, শিক্ষা সংস্কারের নামে সে কথা ভুলে গেলে চলবে না। অতএব, আমাদের শিক্ষার এ মৌল সমস্যার সমাধান হতে হবে সর্বাগ্রে- সর্বপ্রথম। এ সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কোন সমস্যারই সমাধান হতে পারে না। এ কথা আমরা-দেশের শাসন কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও দেশবাসী- যতো তাড়াতাড়ি বুঝতে পারব, ততই মঙ্গল।[৩৮]

## ১১. সহশিক্ষার কুফল ঃ

'সহশিক্ষা মানে ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই একই বিষয় একই কক্ষে পাশাপাশি বসিয়ে শিক্ষা প্রদান। এ পর্যায়ে প্রথম কথা হলঃ ছেলে ও মেয়ে জন্মগতভাবেই স্বতন্ত্র দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা এবং ভাবধারার ধারক হয়ে থাকে। জীবনের পরিণত স্তরে স্বাভাবিক দায়িত্ব বোধের তাগিদেই তারা স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র গ্রহণে বাধ্য হয়। এ ব্যাপারে কোন মিলই থাকে না ছেলে ও মেয়ের জীবনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উভয়কে ঠিক একই বিষয় একই ধারায় শিক্ষা দেয়ার পরিণাম যে কত ভয়াবহ, তা ভাষায় প্রকাশ করা চলে না।'[৩৯] এখানে সবার প্রথমে যে বিষয়টি আসে তা হচ্ছে আল-কুরআনে মুসলিম

---

৩৮. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি), শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ৫ম প্রকাশ ঃ মে ২০১১, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ৩৪ ও ৩৫।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৯।



www.pathagar.com

নারীদের জন্য নির্দেশিত আবশ্যকীয় বিষয় 'পর্দা'-র খেলাপ। 'আপন স্ত্রী কিংবা কোন মুহাররাম মহিলাকে ছাড়া অপর কোন মহিলাকে নজর ভরে দেখা কোন পুরুষের জন্য জায়েয নয়।'[৪০] 'আল-কুরআনে প্রথমেই নারী ও পুরুষকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা এইযে, 'দৃষ্টি অবনমিত কর'। অর্থাৎ কারো মুখমন্ডলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে তা নিম্নমুখী করতে হবে। এটা আল-কুরআনের 'গাদ্দে বাছার' শব্দের শাব্দিক অর্থ। কিন্তু এর দ্বারা পূর্ণ মর্ম পরিষ্কার হয় না। আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই নয় যে, মানুষ সকল সময় নীচের দিকে দেখবে এবং উপরের দিকে কখনও তাকাবে না। বরং প্রকৃত উদ্দেশ্য এইযে, মানুষ ঐ বস্তু থেকে নিজেকে রক্ষা করুক যাকে হাদীসের পরিভাষায় 'চোখের ব্যভিচার' বলা হয়েছে। অপর নারীর রূপ-সৌন্দর্য দর্শন করে আনন্দ উপভোগ করা পুরুষের জন্য যেমন আনাচার সৃষ্টিকারী তেমনি অপর পুরুষের প্রতি তাকিয়ে দেখাও নারীর জন্য অনাচার সৃষ্টিকারী। অনাচার-বিপর্যয়ের সূচনা স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিগতভাবে এখান থেকেই হয়। এজন্য ইসলাম সর্বপ্রথম এই পথ বন্ধ করে দিয়েছে। দৃষ্টি আবনমিত করণের আসল উদ্দেশ্য এটাই।'[৪১] 'নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইউরোপের বিভিন্ন জাতির সভ্যতা ও সমৃদ্ধির বড় সর্বনাশ সাধন হয়েছে যেমন এ কথা ঐতিহাসিকভাবে সুবিদিত যে, গ্রীক সভ্যতার পতনের একটি অন্যতম প্রধান কারণ ছিল নারীর বেলেল্লাপনা, পুরুষদের সাথে তাদের অবাধ মেলামেশা এবং অতিমাত্রায় প্রকাশ্য সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রদর্শনী।'[৪২] 'বিখ্যাত ফরাসী চিন্তাবিদ আলেকসিম ক্যারেল (২৮ জুন, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ-০৫ নভেম্বর, ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ) ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত তাঁর বই "Man the Unknown"-এ লিখেছেন ঃ "পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে পার্থক্য তা মৌলিক পর্যায়ের। তাদের দেহের শিরা উপশিরা, স্নায়ূ সবকিছু ভিন্নরূপ বলেই তাদের এই পার্থক্য বিদ্যমান। নারীর ডিম্বকোষ থেকে যে রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয় তার প্রভাব নারী দেহের প্রতিটি অংঙ্গে প্রতিফলিত হয়। নারী ও পুরুষের স্বভাবগত ও মনস্তাত্বিক বিভিন্নতার কারণও একই।" পুরুষ ও নারী মানুষ হিসাবে অভিন্ন হলেও তাদের দৈহিক ও মানসিক গঠন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এর থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, প্রকৃতি তাদের থেকে পৃথক ধরনের কাজ নিতে ইচ্ছুক।

---

৪০. অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ, পর্দার আসল রূপ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ৪র্থ প্রকাশ ঃ জুন ২০১১, পৃষ্ঠা-১৫।

৪১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি), পর্দার বিধান, মুদ্রণ ঃ এপ্রিল ২০০৪, ঢাকা, পৃষ্ঠা-০৪।

৪২. ডক্টর মুস্তাফা আস্ সিবায়ী, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, ৩য় প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ২০০৪, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১২৭।



www.pathagar.com

একই ধরনের কাজ প্রকৃতি তাদের কাছ থেকে নেওয়ার পক্ষপাতি নয়। এবং এই সৃষ্টি রক্ষার প্রয়োজনেই উভয়ের স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদান রাখা একান্ত জরুরী।'[৪৩] রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিদ্যা- এ ধরণের সব বিষয়েই যে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্যই শিক্ষণীয় জিনিস রয়েছে, তা অনস্বীকার্য। কিন্তু সে শিক্ষায় ছেলে ও মেয়ের স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গি একরূপ হয়না কখনো। কাজেই একই কক্ষে বসিয়ে, একই ভঙ্গিতে একই বই পড়ানো ও একই দৃষ্টিকোণ দিয়ে একই বিষয় ছেলে ও মেয়েকে শিক্ষা দেয়ার মানে হল ছেলে ও মেয়েকে মনন ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে এক ও অভিন্ন করে তোলা। আর এটা যে স্বভাব ও প্রকৃতির শুধু বিপরীতই নয়, মানবতার পক্ষে মারাত্মকও, তাতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। এর ফলে ছেলেরা মেয়েলী স্বভাব-প্রকৃতির ধারক হবে-পৌরুষ হারিয়ে ফেলবে আর মেয়েরা পুরুষোচিত মন-মেজাজ লাভ করবে, হারিয়ে ফেলবে সব নারীসুলভ কমণীয়তা, তা বর্তমানের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেও অনায়াসে বুঝা যায়। বলা বাহুল্য যে, শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের বর্তমান উচ্ছৃংখলতার মূলে প্রধানত এ কারণই নিহিত। দ্বিতীয়ত: ছেলে ও মেয়েকে একই কক্ষে বসিয়ে শেখানোর পরিণাম হল, হয় ছেলে ও মেয়েদের স্বাভাবিক যৌনবোধকে চিরতরে নির্মূল করে দেয়া এবং মানব সমাজে ক্লীব লিঙ্গের প্রাদুর্ভাব ঘটানো, না হয় যৌনবোধের উস্কানি সৃষ্টির মাধ্যমে যৌনচর্চা ও যৌন পরিতৃপ্তির এক অশ্লীল প্রবাহ সৃষ্টি- যার ফলে নৈতিকতার সব বাঁধনই ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে যাবে। আর মানবাকৃতির এ জীবগুলো এক নতুন পশু শ্রেণীর রূপ ধরে সমাজে পাশবিকতার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে। মনে রাখতে হবে, এ সহশিক্ষা নীতি মুসলিম জাতি কোনদিনই গ্রহণ করেনি, তারা তা চালুও করেনি। আমাদের নীতিহীন ও চরিত্রহীন ইংরেজ প্রভুরাই এ গোলাম জাতির চরিত্র ধ্বংস করার কু-মতলবে এবং আমাদের ভবিষ্যত বংশধরকে সম্পূর্ণ চরিত্রহীন রূপে গড়ে তোলার চক্রান্ত হিসেবে এদেশে এ সহশিক্ষার প্রচলন করেছিল। বস্তুত এ সহশিক্ষা নীতিতে সত্যিকারের জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না কিছুই, বরং সমাজের যুবক-যুবতীদের পশুত্বের নিম্নতম পংকে ডুবে যাবার উৎসাহই দেয়া হচ্ছে সর্বতোভাবে।[৪৪] একশ্রেণীর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী পাশ্চাত্যপন্থী বুদ্ধিজীবিদের প্ররোচনায় আধুনিক এবং সহশিক্ষার নামে আমাদের দেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে নিয়মিত চলছে নগ্নতা ও বেহায়াপনা, চলছে ভাব বিনিময়,

---

৪৩. শামসুন্নাহার নিজামী, পর্দা একটি বাস্তব প্রয়োজন, মুদ্রণ ঃ এপ্রিল ২০০৪, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৭ ও ৮।
৪৪. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি), শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ৫ম প্রকাশ ঃ মে ২০১১, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩৯-৪০



www.pathagar.com

নষ্টামী চর্চা এবং বেলেল্লাপনা। কোথায় তাদের লেখাপড়া ? কোথায় তাদের সাহিত্য চর্চা? এগুলো সবই তথাকথিত আধুনিক এবং সহশিক্ষার কুফল।[৪৫] তারা কি জানে না তাদের দেবতূল্য পাশ্চাত্য প্রভূদের দেশের শিক্ষাঙ্গনে সহ শিক্ষার নামে আজ কি চলছে? যৌন নিপীড়নের ঘটনা সেখানকার স্কুল-কলেজ গুলোতে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ইউরো-আমেরিকান সমাজের 'মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপর পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে ২৩% থেকে ৪৪.৮% ছাত্রী ছেলে বন্ধুদের দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে।'[৪৬] এখানে সবচেয়ে মর্মাহত হওয়ার মত ব্যপার এই যে, শিশুরাও যৌন নিপীড়ন থেকে রেহাই পাচ্ছে না। কানাডার ৫৪% নারী বলছে তারা ১৬ বছর বয়সে পদার্পণের আগেই যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে (সূত্র ঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩১ জুলাই, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ)। ১৯৯৪ সালে বিশ্ব ব্যাংক এক জরিপের ফলাফল প্রকাশ করে। এতে বলা হয় নরওয়ে, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, বার্বাডোস ও নেদারল্যান্ডের নারীদের প্রতি তিন জনের একজন শৈশবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। (সূত্র ঃ Social Problems. Page-92)[৪৭]

**আমাদের সমাজে দৃশ্যমান সহশিক্ষার মৌলিক ক্ষতিকর দিকগুলো নিম্নে দেখানো হলোঃ**

(ক) তরুণ শিক্ষিত প্রজন্মের মধ্যে আল-কুরআনে কঠোর ভাষায় নিষিদ্ধ 'যিনা-ব্যভিচার'- এর ব্যাপক চর্চা ঘটছে।

(খ) অবৈধ যৌনাচারের ফলে যুবক-যুবতীদের মধ্যে নানাবিধ জটিল যৌন রোগের প্রার্দুভাব ঘটছে।

(গ) সামজে 'ধর্ষণ', 'জারজ সন্তান' এবং 'ভ্রূণ হত্যা' ব্যাপক ভাবে বেড়ে যাচ্ছে।

(ঘ) বিপদগামী যুবতীদের আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(ঙ) যুবক-যুবতীরা শিক্ষাগারে একে ওপরের সান্নিধ্যে এসে পরস্পর অবৈধ প্রণয়নের শিকার হচ্ছে।

(চ) তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে 'লিভিং টুগেদার' নামক ঘৃণীত পাশ্চাত্য রীতির ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটছে।

(ছ) 'ইভ টিজিং' নামক সামাজিক সমস্যার ব্যাপক বিস্তার ঘটছে।

---

৪৫. ফাহিম আহমদ, মাদ্রাসার শিক্ষা নাকি চার দেয়ালে ঘেরা বন্দি জীবন। এটা কি শুনালেন। সূত্রঃ http://www.amarbornomala.com/details3338.html

৪৬. Ammerman & Hersen. Assessment of Family Violence. 2nd ed. Page 212, John Wiley & Sons.

৪৭. অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান, ইউরো-আমেরিকান সমাজের অন্ধকার দিক, সেমিনার স্মারক-গ্রন্থ (২০০৭), বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৯-১০।



www.pathagar.com

(জ) বিপরীত লিঙ্গের প্রতি সহজাত আকর্ষণে প্রায়শই ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত পাঠ্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটছে।

(ঝ) লাজুক ছাত্র-ছাত্রীরা এতে অস্বস্তী বোধ করে বিধায় প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিসর থেকে তাদের আশানুরূপ ফল আসছে না।

## ১২. শিক্ষাব্যবস্থায় সেক্যুলারিজমের প্রভাব ঃ

ধর্মীয় প্রবণতাকে মানুষের ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজ জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার নামই হচ্ছে সেক্যুলারিজম (Secularism) যার বাংলা অর্থ ধর্মনিরপেক্ষতা। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধর্মকে পরিত্যাগ করাই এর লক্ষ্য। সে হিসেবে এ মতবাদকে ধর্মহীনতা বলাই সমীচীন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের বিধান মেনে চলার বিরুদ্ধে এর কোন বিশেষ আপত্তি নেই বলে এ মহান 'উদারতার' স্বীকৃতি স্বরূপ এর নাম ধর্মনিরপেক্ষতা রাখা হয়েছে।[৪৮]

ধর্মমুক্ত সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা পরজীবনের ধারণা থেকে মুক্ত। সেক্যুলার জীবন-দর্শন মানুষকে বানরের বংশধর মনে করে। এ শিক্ষা মানুষকে ইতর প্রাণীর থেকে খুব বেশি মর্যাদা দেয় না। মানুষের সত্যিকার পরিচয়, তার মর্যাদা এবং দায়িত্ব-কর্তব্য এ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে নির্ণিত হয় না। যার কারণে নাস্তিক্যবাদী সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে শুধু ভোগবাদী ও দুনিয়া পূজারীই করে তোলে। বস্তুবাদী শিক্ষা ও জীবন দর্শন মানুষের দুনিয়াবী জিন্দেগী ও দৃশ্যমান জগতকেই একমাত্র সত্য ও চূড়ান্ত বলে মনে করে। এই দৃশ্যমান জগতের বাইরের বিশাল-বিস্তীর্ণ পারলৌকিক জীবনের অস্তিত্ব ধর্মমুক্ত সেক্যুলার শিক্ষা-দর্শন স্বীকার করতে চায় না। যার কারণে সেক্যুলার শিক্ষা ও দর্শনে শিক্ষিত লোকেরা দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও বিত্ত-বৈভবকেই জীবনের চূড়ান্ত সফলতা মনে করে এবং তাদের শিক্ষা-দর্শনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়ে ওঠে অর্থ উপার্জন। এ ধরণের শিক্ষা দিয়ে অনেক তথাকথিত জ্ঞানী-গুণী তৈরি হলেও প্রকৃত মানুষ তৈরি হয় খুবই কম। জ্ঞানী হওয়ার পাশাপাশি সত্যিকার মানুষ হয়ে ওঠার জন্য ধর্মভিত্তিক শিক্ষা অপরিহার্য। মানুষের সত্যিকার পরিচয় এবং মানবীয় বৈশিষ্ট্যগুলোর যথার্থ বিকাশ আমরা কেবল ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমেই লাভ করতে পারি।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ডারউইনের অনুসারীরা মনে করেন মানুষ বানরের বংশধর এবং মানুষের আদিপুরুষ কোন মানুষ ছিল না, মানুষ প্রথমে ছিল ইতর প্রাণী মাত্র। বিবর্তন প্রক্রিয়ায় ইতর প্রাণী বানর এক সময় মানুষে পরিণত হয়েছে। বস্তুবাদী জ্ঞান ও

---

৪৮. অধ্যাপক গোলাম আযম, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ, প্রকাশ ঃ এপ্রিল ২০০৩, ঢাকা, পৃষ্ঠা-০৬।



www.pathagar.com

মতবাদগুলোর কাছ থেকে আমরা মানুষ সম্পর্কে উচ্চতর কোন ধারণা, মানুষের কোন মহত্তর পরিচয় ও আদর্শ যেমন পাই না, তেমনি এ পৃথিবীতে মানব জীবনের বিশেষ কোন মিশন আছে কিনা তাও আমরা জানতে পারি না। সেক্যুলার শিক্ষা-দর্শন মানুষকে বড়জোর পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী মনে করে থাকে।[৪৯] মানুষ সম্পর্কে যদি এ রকম ধারণা দেওয়া হয় যে, মানুষের সৃষ্টি বানর বা পশু থেকে তাহলে মানুষ নিজের মধ্যে পশু প্রবৃত্তির লালন-পালনে তৎপর হলে সেক্ষেত্রে মানুষকে কি দোষী সাবস্ত করা যায়? ডারউইনের থিওরি Survival of the fittest যা কিনা বন্য প্রাণির (Wild life) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু শিক্ষাবিদগণ সেটাকেই মানুষের ওপর প্রয়োগের চেষ্টা চালিয়েছেন। ফলে আধুনিক শিক্ষার সামনে বৈষয়িক লক্ষ্য ছাড়া আর কিছু নেই।[৫০] আসলে এটা বস্তুবাদী শিক্ষা ও আদর্শের সীমাবদ্ধতা মাত্র। ধর্মকে যদি আমরা অস্বীকার করি, তাহলে আমাদের চর্মচোখে এবং আমাদের সীমাবদ্ধ উপলব্ধির সাহায্যে মানুষ সম্পর্কে এর বেশি কিছু তো আমরা আসলেই জানতে পারি না। কিন্তু মহাগ্রন্থসমূহ বিশেষ করে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মানুষকে শুধু উন্নত পরিচয় ও মর্যাদাই প্রদান করেনি, অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, দায়িত্ব ও কর্তব্যও জানিয়ে দিয়ে মানব জীবনের এক মহত্তর আদর্শও নির্ধারণ করে দিয়েছে।[৫১] আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ-

"আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন ঃ আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতারা বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা নিয়ত তোমার গুনকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমার জান না।" (সূরা আল বাকারা-৩০)

মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রথম কথাই বলেছেন যে, "প্রতিনিধি" প্রেরণ করেছি। এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, প্রতিনিধি শব্দ ব্যবহারের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলার

---

৪৯. মুহাম্মদ আবুল হুসাইন, ছাত্রজীবনে ইসলামের দাবী, প্রকাশ ঃ মে ২০১১, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৮।
৫০. ডক্টর আহমেদ ইমতিয়াজ, বাংলাদেশের শিক্ষা সংস্কার ও প্রসঙ্গিক ভাবনা, সূত্র ঃ http://www.sonarbangladesh.com/article.php?ID=1135
৫১. মুহাম্মদ আবুল হুসাইন, ছাত্রজীবনে ইসলামের দাবী, প্রকাশ ঃ মে ২০১১, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২৩।



www.pathagar.com

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য পরিস্ফুট। আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়ার কারণেই মানুষের মর্যাদা দুনিয়ার সকল সৃষ্টির চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং উন্নত। দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুই তার অধীন এবং তার ব্যবহারের জন্য নিয়োজিত। আল্লাহর নির্ধারিত পন্থায় তা থেকে সে খিদমাত গ্রহণ করার অধিকারী।[৫২]

## ১৩. উদার মতাবলম্বী শিক্ষার ব্যর্থতা ঃ

আধুনিককালে উদার মতাবলম্বী শিক্ষা উদ্দেশ্যমূলক এবং আদর্শের প্রতি নিরপেক্ষ হয়ে পড়ে। অন্য সব বিবেচনার বিপক্ষে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের উপর জোর দেয়া হলো। শিক্ষাকে ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ থেকে পৃথক করা হলো। স্বাধীনতাই হলো শেষ কথা। বিষয় ও পাঠ্যসূচীতে নৈর্বাচনিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলো। এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হলো যে, একজন ছাত্রকে তার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ও উন্নত করার জন্যে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে হবে এবং তার চিন্তাধারা চরিত্রকে বিশেষ ছাঁচে গড়ে তোলার জন্য বাইরের প্রভাব বিস্তার করা যাবে না। এ ধরনের শিক্ষা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহুল প্রচলিত এবং আনেক ইউরোপীয় দেশেও তা সমাদৃত হয়েছে।

উদার মতাবলম্বী শিক্ষা যে ফল উৎপাদন করেছে তা মোটেই উৎসাহ ব্যঞ্জক নয়। গুরুত্বপূণ কয়েকটি পরিণতি নিম্নে বর্ণিত হচ্ছে ঃ

(ক) এ শিক্ষা ছাত্রদের মধ্যে সামাজিক দৃষ্টি বা ধারণা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। যখন কোন জাতি তাদেরকে ত্যাগ ও কর্মে উদ্দীপিত করার মতো আদর্শের অভাবে পড়ে তখন ক্রমশ তারা ইতিহাসের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং তাদের পতন শুরু হয়।

(খ) এ শিক্ষা নতুন প্রজন্মের আত্মা ও অন্তরে নৈতিক মূল্যবোধ প্রবেশ করাতে ব্যর্থ হয়। মনের চাহিদা পূরণ নিয়েই সে ব্যস্ত। আত্মার চাহিদার প্রতি তারা উদাসীন। এ দু'য়ের মাঝে একটা বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়।

(গ) এ শিক্ষার অন্যতম পরিণতি হলো বিভাগীয় পৃথকীকরণে অর্থাৎ জ্ঞানকে সমন্বিত করে পূর্ণাঙ্গ এককে পরিণত করতে ব্যর্থ হয়েছে। ছাত্রগণ ছোট ও অসংগত টুকরোরূপে জগতকে দেখে ও বিভিন্ন টুকরো তথা বিভাগীয় জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হৃদয়ংগম করতে ব্যর্থ হয়। তারা গাছ দেখে কাঠ দেখে না।

(ঘ) এ শিক্ষা এমন সব লোক সৃষ্টি করে জীবনের মৌলিক ও জরুরী বিষয়গুলোর

---

৫২. অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, একাদশ প্রকাশ ঃ জুন ২০১২, ঢাকা, পৃষ্ঠা - ১০ ও ১৩।



www.pathagar.com

উপর যাদের সুগভীর পান্ডিত্য থাকে না। বস্তুত তাদের জ্ঞান অত্যন্ত অগভীর একে অভিজ্ঞতা লব্ধ গভীর জ্ঞান বলে বিবেচনা করা চলে না। জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ শিক্ষা ইপ্সিত ফলোৎপাদন করতে ব্যর্থ হয়।[৫৩]

## ১৪. ইসলামী শিক্ষা কি ঃ

ইসলামী শিক্ষা বলতে বুঝতে হবে যে শিক্ষার প্রতিটি বিভাগই কুরআন ও হাদীসভিত্তিক, অর্থাৎ যার কোন একটি দিকও ইসলামী আকিদাবিরোধী নয় এমন শিক্ষার নামই হলো 'ইসলামী শিক্ষা'।[৫৪]

ইসলামের জ্ঞান লাভ করা অর্থাৎ দ্বীনের আবশ্যকীয় বিষয়গুলো একজন মানুষের মুসলিম হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম শর্ত। এ কারণেই হাদীস শরীফে বলা হয়েছেঃ "দীনী ইল্‌ম তলব করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয তথা আবশ্যকীয়।" (ইবন মাজাহ ও বাইহাকী শরীফ)[৫৫] অনেকেই হয়তো মনে করেন ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা মানেই হল বিজ্ঞান শিক্ষা না করা, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করা। তারা মনে করে থাকেন ইসলামে মুক্তচিন্তার কোন সুযোগ নেই, অন্ধবিশ্বাসই হচ্ছে ইসলামের মূল কথা। অথচ এ ধারণাগুলো বাস্তবিকই অবান্তর। আসলে এ ধরনের ধারণাও তৈরি হয়েছে কুরআন-হাদীসকে যথাযথভাবে না জানার কারণেই। কারণ কুরআন কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসের কথা বলেনি, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য মানুষকে বাধ্য করার কথাও বলেনি। বরং আল-কুরআনের পরতে পরতে আল্লাহর অস্তিত্ব উপলব্ধির জন্য মানুষের বিবেকবোধকেই নাড়া দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার আহ্বান জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে সৃষ্টির মধ্যেই নিহিত রয়েছে স্রষ্টার নিদর্শন। স্রষ্টার অস্তিত্ব উপলব্ধির জন্য বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণও উপস্থাপন করা হয়েছে। মানুষের বিবেক ও চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগানোর আহ্বানের মাধ্যমে মূলতঃ মুক্তচিন্তা ও যুক্তিবাদকেই উৎসাহিত করা হয়েছে। এভাবে আল-কুরআনের পরতে পরতে স্রষ্টার নিদর্শন তুলে ধরার পাশাপাশি বলা হয়েছে- "দীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। হিদায়াতের পক্ষ থেকে গোমরাহিকে পৃথক করে দেখানো হয়েছে। এখন যে কেউ

৫৩. অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ, অনুবাদ ঃ অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ, ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি; প্রকাশ ঃ মার্চ ২০০৮, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৮-৯।

৫৪. খন্দকার আবুল খায়ের, ইসলামী জীবন দর্শন, প্রকাশ ঃ নভেম্বর ২০০৯, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৮।

৫৫. মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নুমানী, ইসলামী জীবন, প্রকাশ ঃ ২৩ শে মার্চ, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৪।



www.pathagar.com

'তাগুত'-কে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে সে এমন একটি মজবুত রজ্জু অবলম্বন করেছে যা কখনও ছিড়ে যাবে না। আর আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন ও জানেন।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৫৬)

আবার কেউ কেউ হয়তো মনে করেন শুধু কুরআন-হাদীস পড়াই হচ্ছে ইসলামী শিক্ষা। এর বাইরে আর সব শিক্ষাই ইসলাম বিরোধী শিক্ষা। এ ধারণা যে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রসূত তা বলাইবাহুল্য কারণ কুরআন বিজ্ঞান চর্চার জন্য নিরন্তর নির্দেশ দেয়, যার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। শুধু তাই নয় কুরআনই বলে, যারা সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে অর্থাৎ বিজ্ঞান চর্চা করে, তারাই জ্ঞানী সম্প্রদায় এবং এই জ্ঞানী সম্প্রদায়ই আল্লাহকে বেশি চিনতে পারে এবং তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে মূলত: জ্ঞানী লোকেরাই।[৫৬] আল-কুরআনে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

'তোমাদের মধ্যে যে সর্বাধিক আল্লাহ্ভীরু সে আল্লাহর নিকট ততবেশী সম্মানিত'। (সূরা আল হুজরাত ৪৯ ঃ ১৩)

আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে যারা মানবজাতিকে সৎ পথ দেখাবার জন্য এগিয়ে এসেছেন তারা ইতিহাসের প্রচীনতম যুগ থেকে একই সত্য পেশ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও যে ব্যক্তি এ জ্ঞানের উৎস থেকে লাভবান হয়ে কিছু পেশ করবেন তিনিও এ একই পুরনো কথার পুনরাবৃত্তিই করবেন।[৫৭] ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল মানুষের মাঝে এক আল্লাহর গোলামী করার প্রবণতা সৃষ্টি করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের মুক্তিলাভের প্রেরণা সৃষ্টি করা, আল্লাহ প্রদত্ত সত্যের সাক্ষ্য হিসেবে নিজেদেরকে পেশ করার যোগ্যতা অর্জন এবং খিলাফাত পরিচালনা ও মানবতার সেবা করার দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন।[৫৮] আল-কুরআন মানুষকে ইসলামী শিক্ষার এই ব্যাপক ধারণা দান করতে গিয়ে বলছে ঃ

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ

'এটি হচ্ছে গোটা সৃষ্টি জগতের জন্য উপদেশ'। (সূরা আত্ তাকবীর ৮১ ঃ ২৭)

---

৫৬. মুহাম্মদ আবুল হুসাইন, ছাত্রজীবনে ইসলামের দাবী, প্রকাশ ঃ মে ২০১১, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৬৭-৬৮।

৫৭. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি), তাফহীমুল কুরআন (৩য় খণ্ড), ১৬শ প্রকাশ ঃ মে ২০১১, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৯৩।

৫৮. এ.কে.এম. আজহারুল ইসলাম ও শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম, প্রকাশ ঃ জুন ২০০৩, দি ইসলামিক একাডেমী, কেম্ব্রীজ, যুক্তরাজ্য, পৃষ্ঠা-৯২।



www.pathagar.com

'ব্যক্তিদের উপর ইসলাম কতগুলো কর্মসীমা ও বাধ্যবাধকতা আরোপ করে, যেন তা সামগ্রিক স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর না হয়ে ইতিবাচকভাবে তা কল্যাণকর ও সাহায্যকারী হতে পারে।'[৫৯]

## ১৫. ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী ঃ[৬০]

১. শিক্ষার্থীদেরকে মানুষ ও এই বিশ্বজগতের সর্বশক্তিমান স্রষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক, মালিক, মনিব, শাসক, মা'বুদ, সার্বভৌম ও সর্বময় কর্তৃত্বশীল মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানদার, আস্থাশীল, অনুগত ও বিনীত করে তোলা তথা তাদেরকে এক আল্লাহমুখী করে গড়ে তোলা।

২. শিক্ষার্থীদেরকে রিসালাতে বিশ্বাসী করে গড়ে তোলা এবং তাদের মাঝে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে মানার ও তাঁকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার মানসিকতা সৃষ্টি করা।

৩. শিক্ষার্থীদেরকে পরকালের জীবনের প্রতি বিশ্বাসী করে তোলা এবং তাদের মধ্যে পরকালের সাফল্য ও ব্যর্থতাকেই প্রকৃত সাফল্য ও ব্যর্থতা হিসেবে গ্রহণ করার স্বচ্ছ জ্ঞান ও বোধ সৃষ্টি করা এবং তাদের মধ্যে পরকালের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও উদ্বেগ সৃষ্টি করা।

৪. আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে শিক্ষার্থীদের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক পূর্ণ বিকাশ সাধন করা।

৫. শিক্ষার্থীদের মধ্যে আল্লাহর দাস (আব্দ) ও প্রতিনিধি (খলিফা) হিসেবে দায়িত্ব পালনের প্রেরণা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করা।

৬. শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র বিবেকবোধ ও বলিষ্ঠ নৈতিক চেতনা জাগ্রত করে দেয়া।

৭. শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মচেতনা, আত্মোপলব্ধি, আত্মসম্মানবোধ ও আত্মপর্যালোচনার ভাবধারা সৃষ্টি করা।

৮. সময় ও সমাজ চাহিদার প্রেক্ষিতে দক্ষ, জীবন ও কর্মমুখী, সৎ, চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ, বিশ্বস্ত, উদ্যমী ও সাহসী মানুষ সৃষ্টি করা।

৯. সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার যথাযোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করা।

---

৫৯. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি), অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ; প্রকাশনায় ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃষ্ঠা-৮৫।

৬০. এ.কে.এম. আজহারুল ইসলাম ও শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম, প্রকাশ ঃ জুন ২০০৩, দি ইসলামিক একাডেমী, কেম্ব্রীজ, যুক্তরাজ্য, পৃষ্ঠা-৯২।



www.pathagar.com

১০. শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবতাবোধ সৃষ্টি করা এবং তাদের মানবতার কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করা।
১১. জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা।
১২. সময় ও যুগের চাহিদা মাফিক দক্ষ ও যোগ্য গবেষক, আবিষ্কারক, চিন্তাবিদ, লেখক, বিচারক, শিক্ষক, সৈনিক, সমাজকর্মী, প্রশাসক, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, চিকিৎসক, প্রকৌশলীসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি এবং সকল ক্ষেত্র ও বিভাগ পরিচালনার উপযুক্ত লোক তৈরি করা।
১৩. সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর মেধা ও প্রবণতা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ নিশ্চিত করা।
১৪. শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকশিত করা, তাদের মধ্যে ইজতেহাদী যোগ্যতা সৃষ্টি করা।
১৫. সৎ, চরিত্রবান, নীতিবান ধার্মিক ও বিবেকবোধ সম্পন্ন নাগরিক তৈরি করা, উৎপাদন ও কর্মমুখী দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা।
১৬. আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে জীবন, জগত ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যের মাঝে সমন্বয় সাধনের যোগ্যতা অর্জন, জীবনের গুরুত্ব অর্জন এবং জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন।
১৭. নিজস্ব ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জানা এবং তা সংরক্ষণ ও বিকাশের যেগ্যাতা ও প্রেরণা লাভ।
১৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে নিজস্ব বিশ্বাস ও নীতির আলোকে বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা অর্জন করা।

**১৬. জ্ঞান শাখার অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক ঃ**

ইসলামের সঙ্গে সংস্কৃতি, মনোবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাসসহ পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান শাখার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে। সংস্কৃতি হলো মানবের আচরণের বিদ্যা। মনোবিজ্ঞান হলো মানব মনস্তত্ত্বের বিদ্যা। দর্শন হলো বস্তু ও ভাববাদী তত্ত্বের বিদ্যা। বস্তুর ব্যাপারেও ইসলামের স্পষ্ট নির্দেশ আছে। মন বা আত্মার মাধ্যমেই তো মানুষ মূলত জ্ঞান চর্চা, উন্নতি অথবা স্রষ্টাকে চেনার সাধনা করে থাকে। সে জন্য মনোবিদ্যা ও দর্শন - দুটো বিষয় ইসলামের খুবই মূলীভূত বিষয়। মনোবিদ্যা আবার দর্শনের একটি শাখা। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে সমগ্র মানবজাতিকে একই গোত্রভূক্ত করতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা করেননি। বিভিন্ন দেশ, ভাষা, সংস্কৃতি, ভূগোলের মধ্যে তিনি মানুষকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। (সূরা হুজুরাত ঃ ১৩) এই বিষয়টি নৃতত্ত্ব, পরিবেশবিদ্যা, ভূগোল বিষয়ের অন্তর্গত। আল-কুরআনে বলা



www.pathagar.com

হয়েছে, অবিশ্বাসীরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে, অবিশ্বসীদের পরিণতি কি হয়েছিল, সভ্যতার ধ্বংসযজ্ঞ দেখে তা অনুধাবন করে না ? এই প্রশ্নের জবাবের মধ্যে ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও সভ্যতার জ্ঞান বিশেষভাবে নির্দিষ্ট রয়েছে। আল্লাহ মানুষকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন। মহাশূন্যে সব কিছুই ঘূর্ণায়মান। মানুষকে আল্লাহ পুঞ্জিভূত রক্তপিণ্ড (সূরা আল আলাক, আয়াত ঃ ০২) ও বীর্য হতে সৃষ্টি করেছেন - এগুলো আল-কুরআনে রয়েছে। এই বিষয়গুলো জীববিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও জেনেটিক সাইন্সের অন্তর্গত। সেই জন্য এটি স্পষ্ট যে, মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সমস্ত জ্ঞানের স্রষ্টা; তাই বিশ্বজ্ঞানের সব বিষয়কেই আল্লাহ মানুষের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন। আল্লাহ যেহেতু সমস্ত জ্ঞানে জ্ঞানী সেই জন্য ইসলামী জ্ঞানতত্ত্ব সমস্ত জ্ঞানের নিয়ন্ত্রণকারী। সততা ও আল্লাহর উপর বিশ্বাসী থেকে মানব কল্যাণের জন্য নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশিত পথে মানুষ সমগ্র জ্ঞানের সুস্থ ও নৈতিকচর্চা করে যাবে - এটি আল্লাহর নির্দেশ মানুষের কাছে।[৬১]

**১৭. জ্ঞান ইসলামীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ ঃ**

জ্ঞান ইসলামীকরণের জন্য বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে এখানে ডক্টর ইসমাঈল রাজী আল ফারুকীর মতামত তুলে ধরা হল।

আধুনিক বিশ্বে জ্ঞান ইসলামীকরণ আন্দোলনের অগ্রপথিক হলেন ডক্টর ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী। তাঁর মতে আধুনিক জ্ঞানের ইসলামীকরণ একটি মহান পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হবে, যদি সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের অংশ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বাধ্যতামূলক কোর্স হিসেবে চালু করা হয়।

**জ্ঞানের ইসলামীকরণের ক্ষেত্রে কয়েকটি পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে তিনি যেসব মতামত দিয়েছেন, তা অতিসংক্ষেপে নিম্নরূপঃ**

**প্রথম ধাপ ঃ** আধুনিক জ্ঞান আয়ত্তে এনে এর শাখাগুলোকে শ্রেণী, নীতি, পদ্ধতি, সমস্যা ও বিষয়বস্তু অনুযায়ী বিন্যস্ত করতে হবে।

**দ্বিতীয় ধাপ ঃ** জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জরিপ চালিয়ে অর্থাৎ এর উৎপত্তি ও ঐতিহাসিক বিকাশ, বিকাশের পদ্ধতি, দৃষ্টিপাতের ব্যাপকতা এবং এর পক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের অবদানের উপর আলোকপাত করতে হবে।

**তৃতীয় ধাপ ঃ** জ্ঞানের সংশ্লিষ্ট বিষয়টির সাথে ইসলামের বিস্তৃত সামঞ্জস্য অন্বেষণের

---

৬১. ডক্টর রহমান হাবিব, ইসলাম ও জ্ঞানতত্ত্ব, প্রকাশ ঃ ২০১১, ঢাকা, পৃষ্ঠা - ১৩-১৪।



www.pathagar.com

আগেই ঐ বিষয় সম্পর্কে ইসলামী জ্ঞান কি বলতে চায় তা উদঘাটন করা আবশ্যক অর্থাৎ পন্ডিতত্ব আর্জন করতে হবে।

**চতুর্থ ধাপ ঃ** ইসলামী জ্ঞানের বিশ্লেষণকল্পে ইসলামী চিন্তাবিদদেরকে বর্তমান সমস্যার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়গুলোর একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করে ক্রমবিন্যাস করতে হবে।

**পঞ্চম ধাপ ঃ** এখন জ্ঞানের প্রতিটি বিষয়ের সাথে ইসলামী জ্ঞানের সুনির্দিষ্ট প্রাসঙ্গিকতা উভয়ের অভিন্ন অবদানের আলোকে নির্ণয় করতে হবে।

**ষষ্ঠ ধাপ ঃ** এ পর্যায়ে আধুনিক জ্ঞানকে ইসলামের দৃষ্টিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

**সপ্তম ধাপ ঃ** ইসলামী জ্ঞানের উৎস পর্যালোচনা করতে হবে আল-কুরআন ও আল-হাদিস এর সুস্পষ্ট দৃষ্টান্তের আলোকে, বিশ্বব্যাপী উম্মাহর বর্তমান চাহিদা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যাবতীয় আধুনিক জ্ঞান এর ভিত্তিতে।

**অষ্টম ধাপ ঃ** উম্মাহর প্রধান সমস্যাবলী কারণ ও লক্ষণসহ জরিপ করতে হবে।

**নবম ধাপ ঃ** যেহেতু সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের দায়িত্ব ইসলামী দর্শনের উপর ন্যাস্ত সেহেতু আজকের বিশ্বের সমস্যা সমাধানে মানব জাতির সমস্যা জরিপ করতে হবে।

**দশম ধাপ ঃ** সর্বোচ্চ বিচক্ষণতার সাথে সৃজনশীল বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করতে হবে।

**একাদশ ধাপ ঃ** ইসলামী কাঠামোর আওতায় বিভিন্ন বিষয়ের পুনর্বিন্যাস এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক রচনা যা জ্ঞানের ইসলামীকরণ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ধাপ হিসাবে পরিগণিত।

**দ্বাদশ ধাপ ঃ** ইসলামী জ্ঞানের প্রসারের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকগুলো বিভিন্ন দেশের স্ব স্ব ভাষায় মুদ্রিত করে সংশ্লিষ্ট সরকার গুলোকে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানাতে হবে।[৬২]

**১৮. জ্ঞান ইসলামীকরণের পথে সমস্যা ও সম্ভাবনা ঃ**

জ্ঞান ইসলামীকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে যা নিম্নে পর্যায়ক্রমিকভাবে দেখানো হল ঃ

**এক. বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থা ঃ**

জ্ঞানের ইসলামীকরণের পথে একটি প্রকট সমস্যা হচ্ছে দ্বি-মুখী শিক্ষাব্যবস্থা। একমুখী

৬২. ডক্টর ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী, জ্ঞান ঃ ইসলামী রূপায়ন, বঙ্গানু. মুহাম্মদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী, পৃষ্ঠা-৫৮-৬৬।



www.pathagar.com

শিক্ষা হলে দ্রুত সংস্কার করা যেত। দ্বি-মুখী বা বহুমুখী শিক্ষার কারণে সমাজের অধিবাসীদের মধ্যে চিন্তা-চেতনার ফারাক শুধু বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণ শিক্ষায় পশ্চিমা জ্ঞান বিজ্ঞান কোন বাছ বিচার না করেই গ্রহণ করা হচ্ছে। পরিবেশ এমনভাবে তৈরি করা হয়, বিভিন্নমুখী শিক্ষার ফলে জ্ঞানের প্রতি বিভিন্ন ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী লালন করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**দুই. দীর্ঘকালের স্থবিরতা ঃ**

দীর্ঘকালের স্থবিরতার কারণে মুসলিমরা চিন্তা-চেতনায় ইসলামী জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। এখন অ-ইসলামী জ্ঞানই যেন স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি অনীহা উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক চিন্তাভাবনার প্রতি মুসলিম যুব সমাজ ঝুঁকে পড়েছে আধুনিকতার চাকচিক্যে।

**তিন. চাকুরি বা কর্মক্ষেত্রের দৈন্যতা ঃ**

ধর্মীয় জ্ঞানের চর্চায় চাকুরি নেই। আদর্শিক জীবন গঠনে ধর্মীয় জ্ঞানের অবদান থাকলেও তার প্রতি অবহেলা করা হয়। এমনকি ধর্মীয় জ্ঞানের মাঝে নিহিত বৈষয়িক ব্যবস্থা থাকলেও জীবনে কার্যকর করা হচ্ছে না। কারণ সেসব নৈতিকতা পূর্ণ। তাই উপনিবেশিক আমল থেকে দুর্নীতিপরায়ণ প্রশাসনের অধীনে গড়ে উঠা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ইসলামী জ্ঞানের আলোকে চাকুরির ক্ষেত্র নিরূপিত না হওয়ায় এ ক্ষেত্রে দিনদিন সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**চার. মুসলিম নেতৃবৃন্দের উদ্যোগের অভাব ঃ**

মুসলিম নেতৃবৃন্দ ইসলামের কার্যকলাপের প্রতি খুব একটা উদ্যোগী নয়। তাঁদের কার্যকলাপ পরিকল্পনা ভিত্তিক না হয়ে অধিকাংশ সময়ে আবেগতাড়িত বা অন্ধ ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে তারা দ্বিধা দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত হন। জ্ঞান ইসলামীকরণে তেমন উদ্যোগ নেন না বা এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতাও করেন না।

**পাঁচ. আধুনিক পশ্চিমা জ্ঞানের অভাব ঃ**

মুসলিম বিশ্বে পাশ্চাত্যের প্রভাবে ধর্মের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়েছে। অথচ পশ্চিমাদের জ্ঞানের মূল উৎস ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে মুসলিমদের ধারণা থাকলে তারা সে ধরনের চেতনায় প্রভাবিত হতো না।

**ছয়. মিডিয়ায় মুসলিমদের আধিপত্যের অভাব ঃ**

সমগ্র বিশ্বে দ্রুত তথ্য পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মিডিয়া যথা- টিভি, স্যাটেলাইট, মোবাইল, রেডিও, ইন্টারনেট, পত্রিকা ইত্যাদি শক্তিশালী মিড়িয়া ব্যবহৃত হচ্ছে। মিডিয়ায় ইসলাম বিরোধী ইয়াহুদী ব্লক সহ পশ্চিমা বিশ্ব তথা আমেরিকা, ইংল্যান্ডের



www.pathagar.com

একচ্ছত্র আধিপত্যের কারণে মুসলিমদের সম্পর্কে যে কোন বানোয়াট তথ্য মুহূর্তে বিশ্বের আনাচে কানাচে পৌঁছিয়ে দেয়া হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে মুসলিমদের কর্তৃত্ব নেই বললেই চলে। ইসলামী জ্ঞানের প্রতি বিশ্বজনমত বিষিয়ে তোলা হচ্ছে মিডিয়ার মাধ্যমে মিথ্যাচার করে। এটিও একটি বড় সমস্যা।

**সাত. পর্যাপ্ত উপকরণের অভাব ঃ**

ইসলামের আলোকে জ্ঞানতত্ত্বের উপর বইয়ের অভাব রয়েছে। জ্ঞানকে কিভাবে ইসামীকরণ করা যাবে, তার উপর সহজ সাবলীল গ্রন্থ বাজারে তেমনটি নেই। এ বিষয়টি এখনো বিশেষজ্ঞদের কাজ বলে প্রচলিত। সাধারণ শিক্ষিতদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে এর অবস্থান হওয়ার কারণে এটি মুসলিম সমাজকে তেমনভাবে আকৃষ্ট করতে পারছে না। এছাড়া, এ বিষয়ে পত্র পত্রিকা ও জার্নালের অভাব রয়েছে। যে জন্য উন্নয়নকৃত ধারণাগুলো দ্বারা সহজে উপকৃত হওয়া যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে উপকরণসমূহের অভাব রয়েছে এবং যা আছে, তাও দুস্প্রাপ্য। এছাড়া জ্ঞান ইসলামীকরণ প্রক্রিয়ার আলোকে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় রচিত বইয়ের সংখ্যা একান্তই নগণ্য।

**আট. উন্নত ক্যারিকুলাম ও সিলেবাসের অভাব ঃ**

জ্ঞান ইসলামীকরণের আলোকে উন্নত ক্যারিকুলাম ও সিলেবাসের অভাব রয়েছে। এ বিষয়ে শুধু মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোন স্কুল বা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যকর করার মতো পূর্ণাঙ্গ ক্যারিকুলাম ও সিলেবাস নেই। মালয়েশিয়া ও পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েও চাকুরির বাজারের কথা চিন্তা করে ইসলামীকরণের আলোকে সিলেবাস ও ক্যারিকুলাম কার্যকর করা থেকে ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে আসছে।

**নয়. মুসলিমদের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের অভাব ঃ**

মুসলিম সমাজের মূল সূত্র হচ্ছে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ। কিন্তু বর্তমানে এক্ষেত্রেই সংকট বিরাজমান। যেজন্য ইন্টেলেকচুয়াল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিলেও অনৈক্যের কারণে উদ্যোগ সমূহ যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন করা যায় না। মুসলিম সমাজের বাস্তবতার আলোকে তাদের জ্ঞান ও শিক্ষা কাঠামো ও বিন্যাস কি ধরনের হবে এ ব্যাপারে আজোবধি ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না।

**দশ. ইসলামী চেতনার অভাব ঃ**

মুসলিম সমাজে কাঙ্খিত চেতনার অভাব রয়েছে। মুসলিম উম্মাহ নিজেদের ঈমান ও স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন নয়। এমনকি মুসলিমের ঘরে জন্ম নিয়েও ইসলামীকরণের বিরোধিতা করতে কুণ্ঠাবোধ করে না।



www.pathagar.com

**এগার. ইসলাম বিরোধী চক্রান্ত ঃ**

পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সতত মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত অব্যাহত রেখেছে। তাদের ক্রীড়নক হয়ে অনেক বিভ্রান্ত মুসলিম নেতা ও বুদ্ধিজীবি জ্ঞান ইসলামীকরণের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের যৌথ নীলনক্সার সামনে মুসলিমদের বিচ্ছিন্ন উদ্যোগসমূহ ক্রমেই ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

**বার. অর্থনৈতিক সংকট ঃ**

এক সময় আরব বিশ্বের পেট্রো ডলারে জ্ঞান ইসলামীকরণ আন্দোলনটি সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সন্ত্রাসের অপবাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থ সম্পদ আমেরিকা ও ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ আটকিয়ে দিচ্ছে। এমনকি মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সরকার ও জনগণের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চাপ সৃষ্টি করছে সেসব প্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন না করার জন্য এবং সঞ্চালন না করার জন্য। জ্ঞান ইসলামীকরণ প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমানে এ সমস্যার কারণে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

মোটকথা ঃ জ্ঞান ইসলামীকরণ কাজটি ইসলামী দাওয়াতী কাজের অংশ। তাই ইসলামী দাওয়াতকে ঠেকাতে যেয়ে ইসলাম বিরোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ পথে বিভিন্ন বাঁধা সৃষ্টি করেছে। যে কারণে বিভিন্ন দিক দিয়ে জ্ঞান ইসলামীকরণ তৎপরতাটিও আক্রান্ত হচ্ছে।

**সম্ভাবনাগুলো ঃ**

এতকিছুর পরও এক্ষেত্রে সফলতার সম্ভাবনাও বিশাল, যা নিম্নে দেখানো হল ঃ

এক ঃ ইসলাম সম্পর্কে মুসলিমগণ নিকট অতীত থেকে একটু বেশি সচেতন। তাদের এ সচেতনতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দুই ঃ ইসলামের প্রতি ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়াবাসী অমুসলিমদের আগ্রহ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তিন ঃ জ্ঞান ইসলামীকরণে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে কাজ করছে। অতীতে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান দেখা যায় নি।

চার ঃ এ বিষয়ে সম্প্রতি বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাধর্মী জার্নাল প্রকাশিত হচ্ছে।

পাঁচ ঃ এ বিষয়ে গবেষণায় ক্রমেই বুদ্ধিজীবিমহলে আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেই সাথে এ বিষয়ে প্রচুর গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হচ্ছে।

ছয় ঃ জ্ঞানের জগতে পশ্চিমাদের একচ্ছত্র আধিপত্য ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে।

সাত ঃ পশ্চিমা বিশ্বের উন্নত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় মুসলিমরাও কয়েকটি



www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক মানের মডেল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে যা জ্ঞান ইসলামীকরণের পথকে সুগম করছে।

আট : বিশ্বে অনেক মুসলিম দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতি ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে বিন্যাস করতে চাইছে এবং এ লক্ষ্যে নতুন নতুন চাকুরির ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে যা জ্ঞান ইসলামীকরণের পথে একটি ইতিবাচক দিক।

এতসব আলোচনা থেকে এটিই প্রতীয়মান যে জ্ঞান ইসলামীকরণ করতে হবে। পাশ্চাত্যের সবকিছু বিনা বিচারে গ্রহণ করা সঠিক পদ্ধতি নয়। তাদের নির্দিষ্ট দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। সেভাবেই তারা জ্ঞান বিজ্ঞানের বিন্যাস করছে। তাই এটা ইসলামী সমাজ দর্শনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাই মিল না থাকলে বিপর্যয় দেখা দেবে। যেমন : রক্তের গ্রুপ না মিলিয়ে রক্ত পুশ করলে রোগীর মৃত্যু হতে পারে। তাই মেচিং এর গুরুত্ব আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে জ্ঞান ও শিক্ষা উভয়েরই ইসলামীকরণ প্রয়োজন। শুধু জ্ঞান ইসলামীকরণই যথেষ্ট নয়। কারণ জ্ঞান বিতরণ প্রক্রিয়াটি যদি ইসলামীকরণ না হয়, তাহলে জ্ঞান যথাযথভাবে উপস্থাপিত না হয়ে বিকৃত আকারেও উপস্থাপিত হতে পারে।[৬৩]

**১৯. সমন্বিত জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা :**

শিক্ষার আরেকটি নীতি হচ্ছে যে, ছাত্রদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ ও সমন্বিত জ্ঞান প্রদান করতে হবে। তাদের উচিত বিশ্বের দৃশ্যমান বিষয়সমূহের বিভিন্নতা মাঝে বিশ্বের ও জীবনের অদ্বিতীয়ত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হওয়া।

The Report of the Education Commission of India বিবৃত করছে :
"পাশ্চাত্য ও প্রচ্যের পন্ডিত ব্যক্তিদের মতে সর্ববিধ শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বের একটি সুসংগত নকশা এবং একটি সমন্বিত জীবন পদ্ধতি প্রদান। এর মাধ্যমে আমাদেরকে পেতে হবে পরিপ্রেক্ষিতের অনুভূতি, সংক্ষিপ্তাকারের পরিজ্ঞান এবং জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়। অসংলগ্ন কতগুলো তথ্য অবলম্বন করে মানুষ বাঁচতে পারে না। সব জিনিসের সামঞ্জস্য উপলব্ধির একটি সংহত বুদ্ধিবৃত্তিক পরিজ্ঞানের কামনা প্রতিটি মানুষের মাঝে নিহিত আছে। বিচিত্র অভিব্যক্তির মূলে জীবন অদ্বিতীয়। বিভিন্ন তথ্যপূর্ণ সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা পড়তে পারি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে জীবন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে।"

---

৬৩. ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আনওয়ারী, জ্ঞান ইসলামীকরণ স্বরূপ ও প্রয়োগ, প্রকাশ : অকটোবর ২০০৯, ঢাকা, পৃষ্ঠা : ৪৪-৪৭।



www.pathagar.com

ইসলাম মাঝামাঝি পথের পক্ষে। এর আদর্শ হচ্ছে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ। বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী অনুযায়ী চিন্তা ও আচরণের ভারসাম্য নবুওয়াতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিক্ষাকে তাই এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে রাখতে হবে যেন একজন ছাত্র জ্ঞানের ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিত লাভ করতে পারে এবং বিশিষ্টকরণের (Specialization) স্তরে প্রবেশ করার আগে জীবন ও সমস্যাবলীর প্রতি সুসংহত দৃষ্টিকোণ অর্জন করতে পারে।

তাছাড়া ইসলাম জ্ঞানকে সমন্বিত ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সামগ্রিকতা বলেই বিবেচনা করে। একথার সত্যতা এখান থেকে নেয়া যায় যে, আল-কুরআন-ই হচ্ছে সব জ্ঞানের প্রধান উৎস। এ গ্রন্থটিই যে কোন বিভাগীয় জ্ঞানান্বেষণকারীর মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ন্ত্রণ করবে। এ বাস্তবতা আমাদেরকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বিত জ্ঞানের ধারণার দিকে পরিচালিত করছে। জ্ঞান ক্ষুদ্র ও অসংলগ্ন ক্ষুদ্রাংশে বিভক্ত থাকবে না। কিন্তু তা হবে সমন্বিত। একটি মাত্র এককে সম্পৃক্ত। এভাবেই তিরোহিত হবে জ্ঞানকে ক্ষুদ্রাংশে বিভক্ত করা এবং বিভাগীয়রূপে ভাগ করে নেয়ার পদ্ধতি। হয়তো এটাই হবে উচ্চতর পর্যায়ে বিশিষ্টকরণ সূচীত করার পথে সামিল। নিম্নস্তরসমূহে শিক্ষা সমন্বিত থাকা উচিত। এ পদ্ধতির শিক্ষাই যুবকদের দৃষ্টিভঙ্গীর সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হবে এবং তাদের মাঝে বুদ্ধিবৃত্তিক সহনশীলতার গুণ কর্ষণ করবে।[৬৪]

## ২০. শিক্ষা ইসলামীকরণের লক্ষ্যে সুপারিশমালা ঃ

সর্বপ্রথমে সংবিধানের মূলনীতির আলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের দৃঢ় আঙ্গীকার নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে মক্কা ঘোষণার শিক্ষা বিষয়ক মূলনীতির সাথে ঐক্যমত পোষণকারী ও ইসলামের মৌলিক জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিশন গঠন করতে হবে। দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের ধর্মীয় শিক্ষার সঠিক মূল্যায়নের জন্য স্ব-স্ব ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিবর্গকে কমিশনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পর্যায়ক্রমে দূরদর্শী ও বাস্তবধর্মী জাতীয় আদর্শ, ঐতিহ্য, চিন্তা বিশ্বাস ও মূল্যবোধের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুন্ন রেখে দীর্ঘমেয়াদী একক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।[৬৫]

---

৬৪. অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ, অনুবাদ ঃ অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ, ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি; প্রকাশ ঃ মার্চ ২০০৮, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৬-১৭।

৬৫. এ.কে.এম আজহারুল ইসলাম ও শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম, প্রকাশ ঃ জুন ২০০৩, দি ইসলামিক একাডেমী, কেম্ব্রীজ, যুক্তরাজ্য, পৃষ্ঠা-৯৪-৯৫।



www.pathagar.com

এখানে উল্লেখ্য যে, শরী'আ আইনে পরিচালিত ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই রাষ্ট্রে চালু শিক্ষাব্যবস্থা অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করবে। তবে ইসলাম ধর্মীয় বই-পুস্তকাদি পড়তে তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না। দেশের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিংবা তাদের নিজেদের বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজ নিজ ধর্ম শিক্ষার আলাদা ব্যবস্থা করার পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের থাকবে।[৬৬]

প্রতিটি মাসজিদ, মক্তব, হিফযখানা, টোল প্রভৃতি সকল স্তরে ইবতেদায়ী ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে হবে। মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চ শিক্ষার স্তরে বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক অধ্যায়নের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিজ নিজ ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে শিক্ষার সকল স্তরে প্রবর্তনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এটি কার্যকর করার জন্য মুসলিম ছাড়াও হিন্দু, খৃস্টান, বৌদ্ধ সকল ধর্মের নিষ্ঠাবান ধার্মিক জ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তিদের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে। রেডিও টেলিভিশনসহ সকল প্রচার মাধ্যমকে নিছক অশ্লীল বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের পরিবর্তে জাতীয় মূল্যবোধ, আদর্শ, ঐতিহ্য, চেতনা, শিক্ষা বিস্তার ও নৈতিক মূল্যবোধ উজ্জীবিত করার মত শিক্ষামূলক জ্ঞান বিতরণ ও চরিত্র গঠনের উপযোগী অনুষ্ঠান প্রচারের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

যেহেতু জ্ঞানের মূল উৎস আল-কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ ও সংরক্ষিত হয়েছে, তাই আরবী ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শিক্ষাদান করতে হবে। সকল বিভাগের ছাত্রদেরকে ইসলামের মৌলিক ইবাদাতসমূহ অনুশীলন করে শেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এ লক্ষ্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা থাকবে পাশাপাশি। ছাত্রদের স্বাধীনতা রক্ষার সৈনিক, আদর্শের প্রচারক ও সত্যের সাক্ষ্য হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষানীতি হবে ইসলামী সংস্কৃতির উৎসস্থল। শিক্ষার সকল স্তরে ও সকল বিভাগে ইসলামী সংস্কৃতির ব্যাপক চর্চা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।[৬৭]

শিক্ষার্থীকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন ইসলামী আদর্শের আলোকে জীবন পরিচালনা করতে পারে। এই উদ্দেশ্য তখনই সফল হবে যখন সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী আদর্শের আলোকে পরিচালিত হবে। এই জন্য প্রয়োজন সমগ্র কারিকুলামের সংস্কার, নতুন টেক্সটবই প্রস্তুতকরণ এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণের আলোকে অনুকূল

---

৬৬. ডক্টর আহমদ আলী, ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা, প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১০, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩২।

৬৭. এ.কে.এম আজহারুল ইসলাম ও শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম, প্রকাশ : জুন ২০০৩, দি ইসলামিক একাডেমী, কেম্ব্রীজ, যুক্তরাজ্য, পৃষ্ঠা-৯৫।



www.pathagar.com

পরিবেশ সৃষ্টি করা। প্রতিটি বিষয়, বিশেষত সামাজিক বিজ্ঞান-এর শিক্ষণ কার্যক্রমে ইসলামী দৃষ্টিকোণের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, এবং প্রতিটি ধাপেই শিক্ষার্থীর মাঝে নৈতিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার জন্য যথাযথ যত্নবান হতে হবে।[৬৮]

মুসলিম সম্প্রদায় একটি ধর্মতত্ত্ব এবং একটি দৃঢ় বিশ্বাসের মূল্যাবোধ এর উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে যা তার সদস্যদের দিয়েছে সঞ্জীবিত চরিত্র এবং স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। বর্তমানে মুসলিমগণ হয়ে আছে স্থবির কিন্তু ইসলাম তার চিরস্থায়ী গুণাবলী বজায় রেখে সত্য হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত। উম্মাহর প্রতি শিক্ষার দায়িত্ব শুধু এই সংক্ষিপ্ত জীবনে সীমাবদ্ধ থাকা নয় বরং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।[৬৯]

## ২০.১. শিক্ষার মাধ্যম ঃ

প্রাথমিক স্তর (প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী) পর্যন্ত শিক্ষার মৌলিক বিষয়গুলো সর্বাধিক বোধগম্যকরণে মাতৃভাষা 'বাংলা' থাকবে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে।

ইসলাম কোন নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং পৃথিবীব্যাপী মুসলিমরা আজ বিস্তৃত যাদের মুখের ভাষা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে বিভিন্ন হলেও আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজীর মাধ্যমে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ও.আই.সি)-র দ্বারা যোগাযোগ সেতুবন্ধন গড়ে উঠেছে। তাই বৃহত্তর মুসলিম জাতীয়তাবাদকে অধিক পরিমাণ উদ্দীপিত করতে এবং আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের প্রতিযোগীতাপূর্ণ চাকুরির বাজারে মুসলিম নতুন প্রজন্ম নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে মাধ্যমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে আন্তর্জাতিক ভাষা 'ইংরেজী' বাধ্যতামূলক থাকবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, যেহেতু সমস্ত প্রজ্ঞা জ্ঞানের উৎস ভান্ডার আল-কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে সেহেতু আল-কুরআন বুঝে তা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য 'বাংলা' ও 'ইংরেজী'-র পাশাপাশি 'আরবী' ভাষাকে গ্রেজুয়েশন পর্যায় (বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোন অনুসদের প্রস্তাবিত প্রোগ্রামের সাথে আন্ডার গ্রেজুয়েট পর্যন্ত বাধ্যতামূলক থাকবে) পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করতে হবে।

## ২০.২. স্তরভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা (প্রাক-প্রাথমিক-গ্রেজুয়েশন পর্যায়) ঃ

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে জীবনের সকল ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে ও ধাপে ধাপে শিক্ষার কথা বলেছেন। তাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকেও ধাপে ধাপে বিন্যস্ত করতে

---

৬৮. খুরশীদ আহ্মদ, Principles of Islamic Education, op.eit., পৃষ্ঠা-১৮-২০।
৬৯. ডক্টর এম. জাফর ইকবাল, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রেক্ষিত ইসলাম, পৃষ্ঠা-৫৩।



www.pathagar.com

হবে।[৭০] এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা ০৩টি স্তরে বিন্যস্ত থাকবে। যেমনঃ (ক) প্রাথমিক, (খ) মাধ্যমিক, (গ) ও গ্রেজুয়েশন পর্যায়। নিম্নে প্রত্যেকটি স্তরের প্রস্তাবিত শিক্ষা প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো ঃ

**২০.২.১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ঃ**

শিশুদেরকে ভবিষ্যতের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশব্যাপী গ্রামভিত্তিক বা মাসজিদ- কেন্দ্রিক আদর্শ ফোরকানিয়া মক্তব চালু করতে হবে। এসব মক্তবে ১ থেকে ১.৫ ঘন্টা সময় ধরে শিশুরা আল-কুরআন সহীহ্ ভাবে তিলাওয়াত শিখবে ও শরী'আতের প্রাথমিক আহ্কাম জানার সুযোগ পাবে।

**২০.২.২. প্রাথমিক শিক্ষা (১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী) ঃ**

১. প্রাথমিক স্তরে বর্তমান পাঠ্যপুস্তকে প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে স্কুলগুলোতে যা পড়ানো হয় তার প্রায় সবই পড়ান যেতে পারে, কিন্তু পাঁচটি জিনিস সব পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে।

   ক) শিশুমনে এ কথা বদ্ধমূল করে দিতে হবে যে এ দুনিয়া আল্লাহর সাম্রাজ্য। মানবজাতি আল্লাহর প্রতিনিধি। এ কথা শিশু মনে ইসলামী চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা জন্মাতে হবে।

   খ) ইসলাম যে সব নৈতিক ধ্যান-ধারণা ও মূল্যাবোধ পেশ করে তা প্রত্যেক বিষয়ের পাঠ দেয়ার সময় এমনকি অংকের প্রশ্নমালার ভিতর দিয়েও শিশুর মনে বদ্ধমূল করতে হবে।

   গ) এ সময়েই শিশুমনে ইসলামের জ্ঞান, আকীদা ও ঈমানের বিষয়গুলো বদ্ধমূল করে দিতে হবে। এ কাজ প্রয়োজন বোধে প্রাথমিক ভাবে ইসলামিয়াত নামের বইয়ের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। স্মরণ রাখতে হবে ঈমান-আকীদার বিষয়গুলো অন্যান্য বিষয়গুলোর মধ্যেও এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রাণ প্রবাহ ছড়ান থাকে।

   ঘ) শিশুকে ইসলামী জীবন-প্রণালী শেখাতে হবে- যেমন পাক-পবিত্র হওয়ার নিয়ম কানুন, অযুর মাসলা-মাসায়েল, নামায-রোযার নিয়ম, হালাল-হারামের সীমা, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর হক, পানাহারের নিয়ম-কানুন, পোশাক-পরিচ্ছদ সংক্রান্ত বিধান ইত্যাদি।

   ঙ) তাজবিদসহ সহীহ্ করে কুরআন তিলাওয়াত করার যোগ্যতা যাতে সৃষ্টি হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

---

৭০. অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিক্ষাদান পদ্ধতি, বিআইসি, প্রকাশ ঃ মে ২০১১, পৃষ্ঠা - ৩৪২।



www.pathagar.com

২. ইবতেদায়ি মাদরাসা শিক্ষাকে সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার সমমান সম্পন্ন করতে হবে।

৩. প্রাথমিক শিক্ষা আট (৮) বছর মেয়াদী হতে পারে। পাশাপাশি ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষাও আট (৮) বছর মেয়াদী হতে হবে।[৭১] তবে দু'টি ধারাকে একত্রিত করে একমুখী ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করা গেলে তা একই ইসলামী মনোভাব সম্পন্ন নতুন প্রজন্ম তৈরির লক্ষ্য অর্জনে অধিক ফলপ্রসূ হবে।

**২০.২.৩. মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা (৯ম শ্রেণী থেকে ১২তম শ্রেণী)ঃ**

(ক) **আকায়িদ ঃ** এ পর্যায়ে এ বিষয়টি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় জটিলতার নিরস বিস্তারিত আলোচনা পরিহার করতে হবে। এক্ষেত্রে বরং ঈমানিয়াত সহজ সরলভাবে উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীর হৃদয়ঙ্গম করাতে হবে যা স্বাভাবিক অনুভূতি ও বুদ্ধি-বিবেকের কাছে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে।

(খ) **ইসলামী আখলাক ঃ** এ বিষয়টি শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে কেবল নৈতিকতার তাত্ত্বিক ধারণা পেশ করলে চলবে না। বরং রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরামের বাস্তব জীবন থেকে এমন কিছু ঘটনা নির্বাচিত করে তুলে ধরতে হবে, যা দ্বারা শিক্ষার্থী একজন মুসলিমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ কি এবং এক জন মুসলিমের জীবন কেমন তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

(গ) **ফিকাহ্ শাস্ত্রীয় বিধিমালা ঃ** এ বিষয়টি শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সামনে বান্দার হক, আল্লাহর হক এবং ব্যক্তি জীবনের আচরণ সম্পর্কে ইসলামী আইনের এমন কিছু প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় আহ্কাম তুলে ধরতে হবে যা জানা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য।

(ঘ) **ইসলামী ইতিহাস ঃ** এ পর্যায়ে ইসলামী ইতিহাস শিক্ষাদানের পরিসর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবন চরিত্র ও সাহাবায়ে কিরামের যুগ পর্যন্ত সীমিত থাকবে।

(ঙ) **আরবী ঃ এ পর্যায়ে আরবী ভাষার নিছক প্রাথমিক জ্ঞান দান করতে হবে যা আরবী সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করবে।**

(চ) **আল-কুরআন ঃ** কুরআন শিক্ষার ক্ষেত্রে এ স্তরে এতটুকু জ্ঞান দান করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী কুরআন শরীফ দেখে ভালভাবে পড়তে পারে। সহজ সরল যাতে

---

৭১. এ.কে.এম আজহারুল ইসলাম ও শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম, প্রকাশ ঃ জুন ২০০৩, দি ইসলামিক একাডেমী, কেম্ব্রীজ, যুক্তরাজ্য, পৃষ্ঠা-৯৬-৯৭।



www.pathagar.com

আয়াতগুলোকে কিছুটা বুঝতে পারে এবং কয়েকটা সূরা মুখস্থও করে নিতে পারে।

**২০.২.৪. কলেজ স্তরের শিক্ষা (গ্রেজুয়েশন পর্যায়) ঃ**

কলেজ স্তরে শিক্ষাদনের ক্ষেত্রে একটা সাধারণ পাঠ্যসূচী থাকবে যা সব শিক্ষার্থীকে পড়ানো হবে। এই পাঠ্যসূচীতে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো থাকবেঃ

(ক) **আরবী ঃ** একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে আরবি সাহিত্য সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দান করতে হবে। কিন্তু বি.এ. বা স্নাতক পর্যায়ে গিয়ে এ বিষয়টাকে কুরআন শিক্ষার সাথে একীভূত করে নিতে হবে।

(খ) **আল-কুরআনঃ** একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থীকে কুরআন বুঝার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। বি.এ স্তরের মূল কুরআন শিক্ষা দিতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষা পদ্ধতি হবে এমন যাতে শিক্ষার্থীরা নিজে নিজেই কুরআন মাজিদ পড়ে বুঝতে চেষ্টা করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষকগণ শুধু জটিল বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করে বুঝাবেন, প্রশ্নের জবাব দিবেন এবং সন্দেহ নিরসন করবেন।

(গ) **ইসলামী শিক্ষা ঃ** এ বিষয়টি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রের শিক্ষার্থীদেরকে গোটা ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কেই অবহিত করাতে হবে। কি কি মৌলিক ধ্যান ধারণার উপর ইসলামের বুনিয়াদ রচিত হয়েছে সে সব ধ্যান ধারণার ভিত্তিতে ইসলাম আখলাক ও চরিত্র কিভাবে গঠন করে এবং এর অধীনে সমাজ জীবনে লেনদেন, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং আন্তজার্তিক সম্পর্ককে কোন্ নীতিমালা অনুসারে বিন্যস্ত করে, তা অনুধাবন করাতে হবে। সাধারণ বাধ্যতামূলক বিষয়গুলো ছাড়াও ইসলামী বিষয়গুলোকে ভাগ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞ তৈরির কোর্সসমূহে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং প্রত্যেক বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যশীল ইসলামী বিষয়কে তার অঙ্গীভূত করতে হবে।

**২০.২.৫. বিশেষ পাঠক্রম ঃ**

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ বিভাগগুলোকে আলাদাভাবে শিক্ষা দেয়ার দরকার নেই। এর প্রত্যেকটিকে একই ধরনের পাশ্চাত্য বিষয়ের শেষ পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া উচিত যেমন "ইসলামী দর্শন" ইসলামী দার্শনিক চিন্তধারা বিকাশে মুসলিমদের অবদান এবং ইসলামী হিকমাতকে দর্শন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামী ইতিহাস দর্শনকে ইতিহাস বিভাগে, ইসলামী আইনের মূলনীতি এবং ফিকাহ্ শাস্ত্রের ব্যবহারিক কার্যকলাপ সংক্রান্ত অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ সমূহকে আইন বিভাগে, ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতিসমূহ ও অর্থনীতি লেনদেন সংক্রান্ত ফিকাহ



www.pathagar.com

শাস্ত্রীয় অধ্যায় সমূহকে অর্থনীতি বিভাগে এবং ইসলামী রাজনৈতিক মতবাদ সমূহ, ইসলামী রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং দুনিয়ার রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশে ইসলামের অবদানকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। অন্যান্য বিষয়ও একইভাবে পাশ্চাত্য বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

**২০.২.৬. গবেষণা ও ডক্টরেট বিভাগ ঃ**

এই পাঠ্যক্রমের পর ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচ্চতর গবেষণার জন্য একটা বিশেষ বিভাগ থাকা উচিত। এ বিভাগ থেকে পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহেরে মত উচ্চতর তাত্ত্বিক গবেষণার জন্য ডক্টরেট ডিগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা দরকার। এ বিভাগ থেকে তৈরি হবে এমন সব লোক যারা জ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে মৌলিক ও স্বাধীন প্রক্রিয়া অনুসরণের ট্রেনিং লাভ করবে অতঃপর তারা শুধু মুসলিম নয় বরং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে তারা দুনিয়ার তাত্ত্বিক নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে।[৭২]

**২০.৩. নারী শিক্ষা ঃ**

নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ছাত্রীবেতন মওকুফ করতে হবে। ছাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃত্তি ও আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে। উপযুক্ত মান ও মেধা সাপেক্ষে শিক্ষার সকল শাখায় নারীদের যথাযথ অগ্রাধিকার দিতে হবে। মাধ্যমিক পর্যায়ে নারীদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষাঙ্গন গড়ে তোলার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে মাধ্যমিক স্তরে সহশিক্ষার অবসান ঘটাতে হবে। প্রয়োজনে বিভিন্ন শিক্ষায়তনে ছাত্রীদের জন্য আলাদা সিফট চালু করা যেতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকতায় নারীদের অধিক হারে নিয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে উচ্চতর পর্যায়েও শিক্ষকতায় নারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং নারী শিক্ষার্থীদেরকে নারী শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। মাধ্যমিক পর্যায়ে নারীদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শিশু পরিচর্যা, আত্মরক্ষামূলক শারীরিক শিক্ষা, নারী অধিকার সংক্রান্ত আইন ধর্মীয় মূল্যবোধ ইত্যাদি বাধ্যতামূলক থাকবে। প্রকৃতিগত কারণেই নারীদের শিক্ষার মধ্যে এমন উপাদান থাকতে হবে, যা আদর্শ মা হওয়ার পক্ষে সহায়ক হয়।

**২০.৪. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক ঃ**

- উপরিউক্ত সুপারিশসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই শিক্ষাক্রম তৈরি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে।

---

৭২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি), ভাষান্তরে ঃ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক ও হাফেজ আকরাম ফারুক; শিক্ষাব্যবস্থা ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ; প্রকাশনায় ঃ ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা ২৭-৩২।



www.pathagar.com

- বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতি, তথ্য-বিপ্লব, বিশ্বব্যাপী লব্ধ নব নব জ্ঞান, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মন-মানস ও ধর্ম বিশ্বাস ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে।
- বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ ও দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মনমানস ও ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী কোন বিষয় কোন স্তরের কোন পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না।[৭৩]

**২১. উপসংহার ঃ**

ইসলাম এমন একটি ধর্ম যেখানে ব্যক্তিগত, সামাজিক, পারিবারিক সকল বিষয়ে দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। এমন কোন বিষয় বাদ নেই যা সম্পর্কে ইসলাম নির্দেশনা প্রদান করেনি। আমরা যদি ইসলামের নিয়ম-কানুন মুতাবিক জীবন পরিচালিত করি তাহলে সকল প্রকার অকল্যাণ থেকে নিরাপদ থাকতে পারি। আর ইসলামের নবী খাতামান্নাবীঈন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ জীবনে সব বিষয়ে আমল করে দেখিয়ে গেছেন কিভাবে তা পালন করতে হয়।[৭৪] ইসলাম জ্ঞান অর্জনের বিষয়ে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। পবিত্র কুরআনের অবতীর্ণ প্রথম আয়তটিই ছিল শিক্ষা সংক্রান্ত। এখানে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ঃ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

অর্থ ঃ পড়ুন সেই প্রভুর নামে যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আল-আলাক ঃ ১)

মুসলিম সমাজের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দিক দিয়ে কুরআনই হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব।[৭৫] এ শিক্ষা এ অনুভূতি মানুষকে জীবনে যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। দেশ ও জাতির কোন দায়িত্ব পালনে সে নিষ্ঠাবান হবে এবং সে জীবনের সর্বক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ও সৎ নাগরিকের পরিচয় দেবে। সমাজের প্রচলিত অন্যায়, দুর্নীতি, অশ্লীলতা থেকে নিজেকে সে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে।[৭৬]

---

৭৩. এ.কে.এম আজহারুল ইসলাম ও শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম, প্রকাশ ঃ জুন ২০০৩, দি ইসলামিক একাডেমী, কেম্ব্রীজ, যুক্তরাজ্য, পৃষ্ঠা-৯৬-৯৯।

৭৪. মাহমুদ আহমদ সুমন, স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইসলামী শিক্ষা, ১৩ই জানুয়ারী, ২০১১, সূত্রঃ www.dailybdnews.com/bangla/ index.php?moh=article&cat=ধর্মওজীবন&article=985

৭৫. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি), শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ৫ম প্রকাশ ঃ মে ২০১১, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৯৬।

৭৬. হাফেজা আসমা খাতুন, আপনার শিশুকে কী শিক্ষা দিবেন, মুদ্রণ ঃ মার্চ ২০১১, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৮।



www.pathagar.com

সত্যিকার মুসলিম আসলে জীবন বিমুখ হতে পারে না, জ্ঞান-পিপাসার ব্যাপারে নিস্পৃহ হতে পারে না, অজ্ঞানতা ও গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। এ বিষয়টিকে আরো ভালভাবে উপলব্ধি করার জন্য আমরা আল-কুরআনের সেই আয়াতটির দিকে ফিরে যেতে পারি যেখানে বিশ্বকে নেতৃত্বদানকারী মুসলিম উম্মাহ্‌র গুণাবলীর কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে হতে হবে 'শ্রেষ্ঠজাতি'। আর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে থেকে পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেয়ার কথা যে চিন্তা করা যায় না তা বলাইবাহুল্য। আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিই হচ্ছে সভ্যতার সকলক্ষেত্রে উন্নতির পূর্বশর্ত। এ কারণে ইসলামে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার উপর যে কত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা মহাগ্রন্থ আল কুরআন না পড়লে বুঝা যাবে না।[৭৭]

আল-কুরআন হচ্ছে সর্বশেষ আসমানী কিতাব যা যাবতীয় প্রজ্ঞা জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উৎসস্থল। 'আল-কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সাথে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকের কোন সংঘাত বা বিরোধ নেই।'[৭৮] বরং আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের গভীরতার মধ্যে আমরা এই পৃথিবীর সমস্ত সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধান খুজে পাই। যেমন ঃ আধুনিক বিজ্ঞান অনেক গবেষণার পর মাত্র কয়েক বছর আগে বলেছে, প্রাণের উৎস জলীয়।[৭৯] অথচ প্রায় সাড়ে ১৪ শত বৎসর আগে আল-কুরআনে আল্লাহ বলেছেনঃ "অবিশ্বাসীরা কি লক্ষ্য করে না যে, আসমান ও যমিন মিলিত অবস্থায় ছিল, তারপর আমি তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি আর পানি থেকে প্রত্যেক জীবন্ত জিনিস সৃষ্টি করেছি; তারা কি বিশ্বাস করবে না ?" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৩০) আবার 'পদার্থ সম্পর্কে বিজ্ঞান বলছে, সমস্ত পদার্থের মূলে আছে বিদ্যুৎ, অর্থাৎ আকাশ-পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা মূলত আর কিছুই নয় বিদ্যুতেরই লীলাখেলা।

প্রত্যেক বস্তুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হয়েছে। ঠিক এ কথার সাথে কুরআনের আয়াত মিলিয়ে পড়লে দেখা যায় : "সেই আল্লাহর মহিমা যিনি পৃথিবীতে যা উৎপন্ন হয়, সেসব বস্তুর এবং তদ্রুপ অন্যান্য বস্তুর এবং যা তারা (মানুষ) জানে না, এমন বস্তুর প্রত্যেকটিকেই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা ইয়া-সীন : ৩৬) বিজ্ঞান বলছে : সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র মহাশূন্যের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ কোনস্থানে স্থির হয়ে নেই।

---

৭৭. মুহাম্মদ আবুল হুসাইন, ছাত্রজীবনে ইসলামের দাবী, প্রকাশ ঃ মে ২০১১, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৬৮।

৭৮. ডক্টর নাসের বিন আব্দুল করিম আল আকল্, ভাষান্তরে ঃ আবু সালমান মোহাম্মদ মতিউল ইসলাম বিন আলী আহমদ, আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মূল আকীদার সংক্ষিপ্ত পরিচয়, রিয়াদ, সৌদী আরব, পৃষ্ঠা-১০।

৭৯. ডক্টর মরিস বুকাইলি, আল-কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান; আল-কুরআন এক মহাবিস্ময়, অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান, মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০১১, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২১।



www.pathagar.com

আর কুরআন বলছে : "সূর্য চাঁদকে ধরতে পারে না, রাত্রি দিনের নাগাল পায় না, সকলেই মহাশূন্যের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" (সূরা ইয়া-সীন : ৪০)[৮০]

**সুতরাং আল-কুরআনের বাণী থেকে এটিই প্রতিয়মান যে, 'মানুষের জন্য ইসলামই একমাত্র সঠিক জীবনব্যবস্থা কারণ এটাই প্রকৃত তত্ত্ব ও আসল সত্যের অনুরূপ।'[৮১] কাজেই এই বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শিক্ষার কোন বিকল্প মানব জীবনে প্রতিষ্ঠিত নেই। তাই আমাদের মুসলিম নতুন প্রজন্মকে আল-কুরআনের সূরা ফাতিহায় বর্ণিত সিরাতুলমুস্তাকিমের পথে দিকনির্দেশনা দিতে একটি নৈতিকতাপূর্ণ যুগোপযোগী ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন এখন সময়ের দাবী।**

---

**লেখক-পরিচিতি :** মোহাম্মদ ইমতিয়াজ উদ্দীন চৌধুরী- বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক।

**লেখা-পরিচিতি :** প্রবন্ধটি ১১ অগাস্ট, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত হয়।

---

৮০. গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী, প্রকাশ ঃ অগাস্ট ১৯৯৪, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩২০।

৮১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি), অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, একমাত্র ধর্ম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩৭।



www.pathagar.com

# বাংলাদেশে সংবাদপত্র ও সাংবাদিক দলন

ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

**ভূমিকা**

মানব জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত দৈনন্দিন ঘটনা প্রবাহের বিচিত্র তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে যে সব প্রকাশনা রূপলাভ করে সেগুলোকে সংবাদপত্র বলে অভিহিত করা হয়। মানুষের অজানাকে জানার আগ্রহ থেকে এর সৃষ্টি, তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে জ্ঞানের সমৃদ্ধি সাধন এর লক্ষ্য। মানব জীবনের প্রয়োজন আর রুচি-বৈচিত্র্যের জন্য এর ব্যাপক সম্প্রসারণ। মানব জীবনের সঙ্গে সংবাদপত্রের এত বেশি সম্পৃক্ততা যে সংবাদপত্র ছাড়া আধুনিক জীবন অচল হয়ে পড়ার উপক্রম হয়, বিশ্বের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সংবাদপত্র বিশ্বের যাবতীয় সংবাদ আর তথ্যের বাহন হিসেবে প্রতিদিন সকাল বেলায় নিয়মিতভাবে উপস্থিত হয়ে জীবনকে করে তুলেছে যথার্থই গতিশীল। সংবাদপত্র আধুনিক মানুষের নিত্যসঙ্গী। ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে এর প্রভাব অপরিসীম।



www.pathagar.com

আজকের দিনে মানুষের চিন্তা-দৃষ্টিভঙ্গি, মনন-রুচি, বিশ্বাস-মূল্যবোধ সৃষ্টিতে এককভাবে যার প্রভাব সবচেয়ে বেশি তাহলো সংবাদপত্র। রাষ্ট্রের পর এটাই হল সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান যা মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর ভালো-মন্দ দু'দিকই আছে। আর দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার গুরুত্ব এখানেই। সংবাদপত্রের ভূমিকা নিরপেক্ষ ও কল্যাণকর হওয়া বাঞ্ছনীয়। মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা, উস্কানিমূলক সংবাদ প্রকাশ করে বিদ্বেষ ছড়ানো, সংবাদপত্রকে ব্যক্তিগত খেয়াল খুশিমত পরিচালনা করা এবং হলুদ সাংবাদিকতা জাতীয় জীবনে অমঙ্গল বয়ে আনে। সংবাদপত্রকে জাতীয় ও আদর্শিক স্বার্থে কাজে লাগালে তা থেকে যথার্থ সুফল লাভ করা যায়। পরিবেশিত তথ্যের যথার্থতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, পাঠযোগ্যতা ও দ্রুততম পরিবেশন ক্ষমতার নিরিখে সংবাদপত্রের গুণ ও মান নির্ধারিত হয়ে থাকে, তা বলাই বাহুল্য। স্বাধীন, নিরপেক্ষ, দায়িত্বশীল সংবাদপত্র সচেতন পাঠকের আস্থা অর্জন ও গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত মজবুত করে, এটাও একটি অতি বিদিত সত্য। সুতরাং সকল রকম অজ্ঞতা ও গোপনতা বিরোধী, সত্য তথ্যানুসন্ধানী সংবাদপত্র বিশ্ব বিবেক ও সভ্য মানবজাতির বলিষ্ঠ, নির্ভীক ও আপোষহীন কণ্ঠস্বর হবে এটা শুধু কথার কথা নয় একেবারেই সত্য কথা। এমন সংবাদপত্র প্রদত্ত তথ্যের আলোর অনির্বাণ শিখা-শতাব্দী পরম্পরায় সমগ্র ভূবনকে উদ্ভাসিত রাখবে। বিস্ফোরিত তথ্যের সুতীব্র ও সুতীক্ষ্ণ আলো অন্যায়-অবিচার অত্যাচারের অন্ধকার দূর করে সত্য-সুন্দর, ন্যায় ও সুবিচারের প্রশস্ত রাজপথ আলোকিত করবে।

'এ যাবতকালের মধ্যে সংবাদপত্র সম্পর্কে কতো যে আপ্তবাক্য রচিত হয়েছে, তার কোন ইয়াত্তা নেই। কেউ বলেন, সংবাদপত্র হচ্ছে সমাজের দর্পণ। কেউ বলেন, দ্বিতীয় পার্লামেন্ট। কে একজন যেন বলে গেছে, সংবাদপত্র হচ্ছে দেশের চতুর্থ স্তম্ভ (ফোর্থ এস্টেট)। সরকার, আইনসভা, বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্র- 'এই চারটি স্তম্ভ' ছাড়া নাকি কোন দেশ চলতে পারে না, গণতন্ত্র দাঁড়াতে পারে না।'[১]

## বাংলাদেশে সাংবাদিকতা চর্চার ইতিহাস

বাংলাদেশে সাংবাদিকতা চর্চার ইতিহাস খুব সাম্প্রতিক নয়। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাংলাদেশে (সাবেক পূর্ববঙ্গ) সংবাদপত্র প্রকাশনা শুরু হয়। সেই থেকে বাংলাদেশে সংবাদপত্র, সাময়িকী প্রকাশনা ও সাংবাদিকতা একটা বিশেষ বৃত্তি হিসেবে গড়ে উঠেছে। সাংবাদিকতা পেশায় অভিজ্ঞতার মূল্য অপরিসীম। বাংলা-ভারত উপমহাদেশে মুঘল শাসনামলে সংবাদ আদান-প্রদানের একটা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল-

---

১. জিবলু রহমান, শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দীনস্মারক গ্রন্থ, খুলনা সংস্কৃতি কেন্দ্র, খুলনা, ২০০৫, পৃঃ ২২৫।



www.pathagar.com

সুবা (প্রদেশ) বা রাজ্যের খবরাখবর সংগ্রহ করাই ছিল এর লক্ষ্য। এদেশে সংবাদপত্রের প্রসার পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল। বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট'। এই ইংরেজি সাময়িকপত্রটি জেমস অগাস্টাস হিকি কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারী প্রথম প্রকাশিত হয় এবং এর মাধ্যমেই বঙ্গ-ভারত উপমহাদেশে সংবাদপত্র প্রকাশনার যাত্রা শুরু হয়।

প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র 'দিগদর্শন' ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালি পরিচালিত প্রথম পত্রিকা 'সাপ্তাহিক বেঙ্গল গেজেট' গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় প্রথম দৈনিক পত্রিকা ছিল ঈশ্চরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'। সংবাদ প্রভাকর ১৮৩১ সালে প্রথম সাপ্তাহিক হিসেবে, পরে ১৮৩৯ সালে দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৩১ সালে একজন মুসলিম শেখ আলীমুল্লাহর সম্পাদনায় সমাচার সভারাজেন্দ্র প্রকাশিত হয়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র হচ্ছে ঢাকা প্রকাশ, প্রকাশিত হয় ৮ মার্চ ১৮৬১, প্রথম সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। ১৮৭৪ সালে মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১১) সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'আজিজুন্নেহার'। আখবারে মোহাম্মদী প্রকাশিত হয় ৪ঠা জুন ১৮৭৭ সালে। মাওলানা কাজী আবদুল খালেক কলিকাতা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। ১৮৮৫ সালে 'ইসলাম' প্রকাশিত হয় মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের সম্পাদনায়।

শেখ আবদুর রহিমের সম্পাদনায় ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত হয় 'সুধাকর'। এর আগে শেখ আবদুর রহিমের সম্পাদনায় ১৮৯২ সালে মিহির (মাসিক), পরবর্তীতে ১৮৯৬ সালে 'হাফেজ' প্রকাশিত হয়। ১৮৯৮ সালে মো. রওশন আলীর সম্পাদনায় বের হয় 'কোহিনূর', ১৯০০ সালে মোজাম্মেল হকের (শান্তিপুর, ১৮৬০-১৯৩৩) সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'লহরী'। এরপর বাংলাভাষায় মুসলিম সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

| সংবাদপত্রের নাম | প্রথম প্রকাশ | সম্পাদক |
|---|---|---|
| নবনূর | ১৯০৩ | সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-১৯৫৬) |
| মাসিক মোহাম্মদী | ১৯০৩ | মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ |
| বাসনা | ১৯০৮ | শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬) |
| মাসিক আল এসলাম | ১৯১৫ | মাওলানা মোহাম্মাদ আকরাম খাঁ |
| সওগাত | ১৯১৮ | মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন |
| মাসিক সাধনা | ১৯১৯ | মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী |
| মোসলেম ভারত | ১৯২০ | মোজাম্মেল হক |



www.pathagar.com

| | | |
|---|---|---|
| আঙুর (কিশোর পত্রিকা) | ১৯২০ | ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ |
| দৈনিক সেবক | ১৯২১ | মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ |
| ধুমকেতু | ১৯২২ | বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম |
| সাপ্তাহিক মোসলেম | ১৯২২ | মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী |
| মুসলিম জগৎ | ১৯২৩ | খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন |
| সাপ্তাহিক মুসলিম জগৎ | ১৯২৫ | আবুল কালাম শামসুদ্দীন |
| লাঙ্গল | ১৯২৫ | বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) |
| শিখা (প্রথম বছর) | ১৯২৭ | আবুল হাসন |
| শিখা (দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার) | ১৯২৭ | কাজী মোতাহার হোসেন |
| বেদুইন | ১৯২৭ | আশরাফ আলী খান |
| মাসিক আল ইসলাহ | ১৯৩২ | মুহম্মদ নূরুল হক |
| সাপ্তাহিক যুগভেরী | ১৯৩২ | আবদুল মতিন চৌধুরী |
| দৈনিক আজাদ[২] | ১৯৩৬ | মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ |
| চতুরঙ্গ | ১৯৩৯ | হুমায়ূন কবির |
| দৈনিক নবযুগ | ১৯৪১ | বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম |
| বেগম | ২০ জুলাই ১৯৪৭ | বেগম সুফিয়া কামাল (প্রথম সম্পাদক) |
| পাকিস্তান অবজারভার | ১৯৪৯ | আবদুস সালাম |
| ইনসাফ | ১৯৫০ | মহিউদ্দীন |
| দৈনিক ইত্তেফাক | ১৯৫৩ | তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া |
| সমকাল (মাসিক) | ১৯৫৪ | সিকান্দার আবু জাফর |
| মাহেনাও | ১৯৪৯ | আবদুল কাদির |
| মাসিক চলন্তিকা | ১৯৫৯ | আজিজ মিসির |
| জেহাদ | ১৯৬২ | আবুল কালাম শামসুদ্দীন |
| জয়ন্তী | ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ | আব্দুল কাদির |
| সংলাপ | | আবুল হোসেন |
| সৈনিক (সাপ্তাহিক) | ১৪ নভেম্বর ১৯৪৭ | শাহেদ আলী |
| গুলিস্তা | | এস ওয়াজেদ আলী |
| সাম্যবাদী | | খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন |
| সাপ্তাহিক বিচিত্রা | | ফজল শাহাবুদ্দীন |
| কবিত্রাপত্র | | ফজল শাহাবুদ্দীন |
| কবিকণ্ঠ | | ফজল শাহাবুদ্দীন |
| সাহিত্য পত্রিকা | | মুহাম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯) |

পরবর্তী পর্যায়ে অজস্র সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়ে বাংলাদেশের মানুষকে জ্ঞান বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বিপ্লবের পথে পরিচালিত করেছে। এর পেছনে রয়েছে ছাপাখানার বিস্ময়কর উন্নতি।

২. এ পত্রিকার নীতিছিল মুসলিম স্বার্থ, মুসলিম লীগের রাজনীতি সমর্থন ও প্রকার। এটি একমাত্র মুসলিম দৈনিক পত্রিকা তখন। তখনকার মুসলিম পরিবারে আজাদ পড়াটাই ছিল রীতি। দেখুন, সিরাজুর রহমান, একজীবন এক ইতিহাস, ঐতিহ্য, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০১০ , পৃ. ২৭।



www.pathagar.com

## বাংলাদেশে সংবাদপত্র ও সাংবাদিক দলনের ইতিহাস

সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এর মূল কারিগর সাংবাদিকরা অনেক অসহায়। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সাংবাদিকদের জাতির বিবেক হিসেবে আখ্যায়িত করা হলেও এই পেশাটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। অপশক্তির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সাংবাদিকরা সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হন। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পেশাগত সততা ও মর্যাদাকে তারা সমুন্নত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান। মৃত্যুর কিনারায় দাঁড়িয়েও সাংবাদিকরা প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন। ঘটনার যথাযথ প্রকাশেই যেন সাংবাদিকদের শাস্তি। সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে সাংবাদিকরা কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠির রোষাণলে পড়েন। অনেক সংবাদপত্রের ডিক্লারেশনও বাতিল করা হয়। একনায়কতন্ত্র, রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, স্বীয় অভীষ্টসাধনার্থ ভোগবাদী, আত্মস্বার্থে প্রণোদিত গণতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদে শাসকগোষ্ঠির গুণ-কির্তনের ব্যতিক্রমে সাংবাদিক নির্যাতন হয় পেশার লিখন। আর স্রেফ ভোট দেয়া নেয়ার লেবাসধারী পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে হয় ভাগ্যের লিখন।

## ঔপনিবেশিক শাসনামলে সংবাদপত্র ও সাংবাদিক দলন

এটি সুস্পষ্ট যে বৃটিশ শাসনামলে বাংলাদেশে সংবাদপত্র প্রকাশ এবং সাংবাদিকতার বিকাশ সাধিত হয়েছে, সংবাদপত্র ও সাংবাদিক দলনও এ সময়েই শুরু হয়েছে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার ইতিহাসে মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) এক অবিস্মরণীয় নাম। মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও সংহতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি একদিকে নিজ সমাজ এবং অন্যদিকে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ ও ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে রত ছিলেন।[৩] সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তার মৌলিক অবদান স্বীকৃত। তাঁকে 'মুসলিম বাংলার' সাংবাদিকতার 'পথিকৃৎ' এবং 'জনক' হিসেবে অভিহিত করা যায়।[৪] প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন শেষে তিনি সাংবাদিকতার মাধ্যমে কর্মজীবনের সূচনা করেন। 'আহলে হাদিস' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাঁর সাংবাদিকতার হাতে খড়ি। পরবর্তী জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েও তিনি সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত থাকেন। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় সাত বছর অন্যের মালিকানায় ও নিজের সম্পাদনায় কয়েকটি পত্রিকার সাথে যুক্ত থাকার পর ১৯১০

---

৩. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, 'বাঙালী মুসলমানের রাজনৈতিক জনক', উদ্বৃত ঃ আবু জাফর (সম্পাদিত), মাওলানা আকরাম খাঁ, ঢাকা-১৯৮৬, পৃঃ ৭৮।

৪. আবু জাফর (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩ (প্রসঙ্গ কথা)। সহ দ্রষ্টব্য বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউট প্রকাশিত সংকলন, পথিকৃৎ, ঢাকা- ১৯৮৭, পৃঃ ২।



www.pathagar.com

সালে তিনি সম্পূর্ণ নিজ কর্তৃত্বাধীনে 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এরপর থেকে সাংবাদিকতায় তিনি ক্রমাগত সাফল্য লাভ করেন। সাপ্তাহিক মোহাম্মদী ছাড়াও তাঁর মালিকানা এবং সম্পাদনায় একে একে প্রকাশিত হয় দৈনিক জামানা (১৯২০), সাপ্তাহিক ও দৈনিক সেবক (১৯২১), দৈনিক মোহাম্মদী (১৯২২), মাসিক মোহাম্মদী (১৯২৭), দৈনিক আজাদ (১৯৩৬), সাপ্তাহিক কমরেড (১৯৪৬) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা। ১৯১৫ সালে 'আঞ্জুমান ওলামায়ে বাঙালার'[৫] মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত 'আল এসলাম' নামক মাসিক পত্রিকাও তিনি প্রথম সম্পাদনা করেন। ১৯৩৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ সাপ্তাহিক ও মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকার পাশাপাশি 'দৈনিক আজাদ' প্রকাশ করেন। দৈনিক আজাদের প্রকাশনা ছিল তাঁর সাংবাদিক জীবনের প্রধানতম সাফল্য এবং বাংলার মুসলিম রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দীর্ঘ সাংবাদিক জীবনে তাঁকে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, বাধা-বিপত্তি, যুলুম-নির্যাতনের মুকাবিলা করতে হয়।

আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৭-১৯৭৯) বিশিষ্ট সাংবাদিক হিসেবে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি মুসলিম জগত, ছোলতান, সওগাত, দি মুসলমান, সেবক, কৃষক ও দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকার সঙ্গে সাংবাদিক রূপে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর মতো সুপন্ডিত ও সুদক্ষ লেখক সম্পাদক বর্তমান যুগে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮) ছিলেন আর একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। বাঙালী মুসলিম সমাজের কল্যাণ সাধনের মানষে সাংবাদিকতা ও সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৩-এ কলকাতার দৈনিক মোহাম্মদী পত্রিকায় সহযোগী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর ১৯২৪ সালে কলকাতার সাপ্তাহিক 'মুসলিম জগৎ' পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে যোগদান করেন। ১৯২৫-১৯২৯ সালে ইংরেজি সাপ্তাহিক 'দি মুসলমান' (১৯০৬)-এর সহকারী সম্পাদক (১৯২৪ থেকে সপ্তাহে এটি তিনবার প্রকাশিত হত) ছিলেন। সে সময় একযোগে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'সওগাত' (১৯২৬) এর সম্পাদনা বিভাগে, ১৯৩০-এ 'দৈনিক সুলতান' এর সম্পাদনা বিভাগে যোগ দেন। এ পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের পদে কাজ করার পাশাপাশি মাসিক মোহাম্মদী (১৯২৭) এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৭ এ মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত দৈনিক আজাদ (৩১ অকটোবর ১৯৩৬ প্রকাশিত) এর সম্পাদনা বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৪০ এ এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। দীর্ঘ ২২ বছর দৈনিক আজাদ সম্পাদনা করেছেন। এরপর তিনি দৈনিক পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

---

৫. আঞ্জুমান ওলামায়ে বাঙালা ১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।



www.pathagar.com

নিযুক্ত হন। ১৯৭২ এর জানুয়ারি মাসে তাকে এই পদ থেকে অবসর নিতে হয় সরকারী চাপের মুখে।

মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৪-১৯৫০) সাংবাদিক হিসেবে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেন। আঞ্জুমান ওলামার মুখপত্র 'আল-এসলামের' প্রতিষ্ঠা করতে যেয়েই তাঁর প্রকৃত সাংবাদিক জীবন লাভ ঘটে। এটি বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রকাশিত হয়। তিনি সোলতান (১৯০২), নবনূর (১৯০৩), মোহাম্মদী (১৯০৩), কোহিনূর (১৯১১), বাসনা (১৯০৮) প্রভৃতি পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত হন। ইসলামাবাদী যখন সাংবাদিকতায় আসেন তখনকার মুসলিম জীবন, তার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতা ছিল সর্বদ্বার রুদ্ধ কক্ষের মত। কোন হিন্দু পত্রিকাই ইসলামী চিন্তাবিদদের লেখা, আলোচনা ছাপাতো না। কারণ তাতে হিন্দু জমিদার, গাঁতিদার, দরগাঁতিদারদের স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। মাওলানা ইসলামাবাদী কাউকে বড় একটা তোয়াক্কা না করে কথা বলার সাহস রাখতেন। আত্মবলে বলীয়ান, এই নির্ভীক চেতা মহান পুরুষকে কখনো সত্য প্রকাশে তা লেখনীর মাধ্যমে হোক বা বক্তৃতার মাধ্যমে হোক কুণ্ঠা বোধ করতে দেখা যায়নি। হাকিম আলতাফুর রহমান লিখেছেন, ১৯১৯ সালে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী দৈনিক সোলতানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে পত্রিকাটি চট্টগ্রাম হতে তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হওয়ার সময় মুদ্রিত বিষয়ের জন্য বৃটিশ সরকারের রোষাণলে পড়ে বন্ধ হয়ে যায়।[৬] ইসলামাবদী এতে দমে যাননি, কলিকাতা থেকে কিছুদিনের মধ্যে পত্রিকাটি পুনরায় প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। ইসলামাবাদী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সত্যি এক কিংবদন্তি স্বরূপ। মুসলিমদের মধ্যে পত্রিকা প্রকাশের এক ব্যাপক আন্দোলনই তিনি গড়ে তোলেন বলা যায়। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই পরবর্তীকালে তাবলীগ (১৯২৭), মুয়াজ্জিন (১৯৩০), আল ইসলাম (১৯৩২), রওশন, হেদায়েত, আলোক প্রভৃতি ইসলামী ও অন্যবিধ সাময়িকীর আবির্ভাব ঘটে।

বাংলাদেশের জাতীয় কবি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলা সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অপূর্ব বলিষ্ঠ বিদ্রোহের অগ্নিবানী, তিনি অগ্নিবীণা হাতে বজ্র বিদ্যুতের চমক হেনে আকস্মিক ঝঞ্ঝার বেগে বিপ্লবের শপথ সঙ্গীতে জাতির বুকে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন, অসহায়, লাঞ্ছিত মানুষের মনের বনে আগুন ধরিয়ে দিয়ে;

---

৬. মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী রচনাবলী ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, মে ১৯৯৩, পৃঃ ৩৬।



www.pathagar.com

"যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রনভূমে রনিবে না,
বিদ্রোহী রন ক্লান্ত
আমি সেদিন হব শান্ত....."

কবির এহেন ক্ষুরধার ভাষা সাম্রাজ্যবাদী বেনিয়াদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল, এজন্য কবিকে নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। সাংবাদিকতা ও লেখনীর মাধ্যমে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে তিনি কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। কবি নজরুল নির্যাতিত, নিপীড়িত ও পরাধীন জাতির হয়ে কবিতা ও গানে, সাংবাদিকতায়, ধারণা ও ধ্যানে, কথা ও কাজে যে অনল-উদগীরণ শুরু করলেন তার কাছে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত আর ধুমকেতুর দিগন্তজোড়া ধুম্রজালও হার মানলো। 'যারা তেত্রিশ কোটি মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে' খাচ্ছিলো, কবির রক্তলেখা অচিরে তাদের সর্বনাশ ডেকে আনলো। সাম্রাজ্যবাদীরা এ দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হলো, নতুন জীবন লাভ করলো জাতি, স্বাধীন হলো দেশ।

তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার (১৯১১-১৯৬৯) নাম বাংলাদেশের ঘরে ঘরে পরিচিত। গণতন্ত্র ও এদেশবাসীর স্বাধিকারের জন্য যে সংগ্রাম তিনি প্রায় সারা জীবন করে গেছেন এবং সে জন্য পাকিস্তানের সামরিক সরকারের হাতে যে নির্যাতন নিপীড়ন হাসিমুখে সহ্য করেছেন, তা অনাগত যুগ ধরে এদেশের লেখক-সাংবাদিকদের প্রেরণা যুগিয়ে যাবে। মানিক মিয়া এদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

**বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর সংবাদপত্র ও সাংবাদিক দলনের ইতিহাস**

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সংবাদপত্র দলন ও সাংবাদিক নির্যাতনের বহু ঘটনা ঘটে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত তিন আমলের সরকার বন্ধ করেছে প্রায় পাঁচশ পত্রিকার প্রকাশনা। এ সময়ের মধ্যে সরকার গ্রেফতার করে প্রায় অর্ধ শতের বেশি সম্পাদককে। কয়েক হাজার সাংবাদিক নানাভাবে সরকারি নির্যাতন, হামলা ও মামলার শিকার হন। সাংবাদিক আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে কয়েক হাজার, পঙ্গু হন কয়েকশ'। নিহত হন প্রায় অর্ধশত সাংবাদিক। সাংবাদিক, সংবাদকর্মী, পত্রিকার অন্য বিভাগের মিলিয়ে বেকার হন বিশ হাজারের বেশি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে, অথচ সংবাদপত্রের ওপর আঘাত আসেনি-এমন রেকর্ড নেই। সাংবাদিক নির্যাতন, গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণে দলটি ক্ষমতায় গিয়ে পাকিস্তানি সামরিক ও ব্রিটিশ শাসকদের আইনের আদলে একের পর এক আইন প্রণয়ন করে। এসব আইনে চলে সাংবাদিক, সংবাদপত্র দলন।



www.pathagar.com

বিশেষজ্ঞদের মতে, সংবাদপত্র দলন, সাংবাদিক নির্যাতন, হত্যা, লাঞ্ছনা, হামলা, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলায় দলটির ইতিহাস আইয়ুব-ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনের চেয়েও ভয়াবহ।

## আওয়ামী লীগ সরকারের প্রথম আমল (১৯৭২-১৯৭৫)

স্বাধীনতা লাভের পরই মুজিব সরকারের (১৯৭২-১৯৭৫) ফ্যাসিবাদী কর্মকাণ্ডের শিকার হন সাংবাদিক ও সংবাদপত্র। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, স্বাধীনতার পর পরই যে পেশা ও পেশাজীবির উপর সবচেয়ে বেশি রাষ্ট্রশক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিপীড়ন নেমে আসে তা হচ্ছে সাংবাদিকতা এবং সাংবাদিক শ্রেণী। রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ সরকার প্রত্যক্ষভাবে সেন্সরশীপ আরোপ করে সংবাদপত্রের উপর। টেলিফোনে হুমকি দিয়ে, সম্পাদক ও সাংবাদিকদের কারাবন্দী করে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাসীদের দ্বারা পত্রিকা অফিসে হামলা চালিয়ে, সাংবাদিকদের ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে এ পেশাকে করা হয় বিধ্বস্ত। শামছুল হক সম্পাদিত 'বাংলা সাময়িকপত্র ১৯৭২-১৯৮১' বইয়ের তথ্যমতে, 'সরকারের সমালোচনা করায় স্বাধীনতা লাভের বারো মাসের মধ্যে 'গণশক্তি', 'হক কথা', 'লাল পতাকা', 'মুখপত্র', 'বাংলার মুখ', 'স্পোকসম্যান' নামের সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর প্রকাশনা বন্ধ করে সরকার। পত্রিকাগুলোর সম্পাদকদেরও গ্রেফতার করা হয়। ১৯৭২ সালে দশটি পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়। ওই বছর আরেকটি পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১৯৭৩ সালে সরকার বন্ধ করে দেয় ১০৮টি পত্রিকা। ওই বছর 'গণকণ্ঠ', 'দেশবাংলা'র প্রকাশনা বাতিল করে পত্রিকা দুটির সম্পাদকসহ প্রায় বিশ সাংবাদিককে গ্রেফতার করে। ১৯৭৪ সালে সরকারি নির্দেশ মেনে সংবাদ না ছাপানোয় ছয়টি পত্রিকার প্রকাশনা সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়, দুটির প্রকাশনা বাজেয়াপ্ত করে সরকার।

সংবাদপত্র বন্ধ করে দিয়ে মুজিব সরকার দেশকে গণতন্ত্রহীন, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাহীন, সংবাদপত্রহীন একনায়ক ও স্বৈরাচার শাসিত দেশে পরিণত করে।

### দৈনিক গণকণ্ঠ সম্পাদককে গ্রেফতার

১৯৭২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী গণ মানুষের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হিসেবে দৈনিক রূপে 'গণকণ্ঠ' নামক একটি পত্রিকার যাত্রা শুরু হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে বিশিষ্ট



www.pathagar.com

সাংবাদিক কবি আল মাহমুদ[৭] সর্বক্ষেত্র পরিচালনা করলেও জাসদ প্রতিষ্ঠার পর পত্রিকাটি দলীয় মুখপত্রে পরিণত হয়। 'গণকণ্ঠ' প্রথম থেকেই সরকারের অদক্ষতা, স্বজনপ্রীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, লুটপাট, দুর্নীতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপনা করার মাশুল হিসেবে অনেক সাংবাদিককে ভাগ্যবরণ করে নিতে হয় যুলুমের স্টীমরোলার। পত্রিকাটির সম্পাদককে টেলিফোনে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজসহ বোমা হামলা, প্রাণের মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হয়। পরিশেষে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। দৈনিক গণকণ্ঠ পরিত্যক্ত সম্পত্তি জনতা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস থেকে প্রকাশিত হতো। সরকারবিরোধী ভূমিকার জন্য মুজিব সরকার গণকণ্ঠ সরাসরি বন্ধের কোন নির্দেশ না দিয়ে গণকণ্ঠের মুদ্রণালয়ের প্রশাসক বদলের নামে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন যাতে পত্রিকা প্রকাশনার স্বাভাবিক তৎপরতা অব্যাহত রাখা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে উক্ত পত্রিকারই এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়, গত ২৩ মার্চ এক আদেশ বলে আকস্মিকভাবে সরকার জনতা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লি. এর প্রশাসক জনাব মনিরুল ইসলামকে অপসারণ করে ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর উপ-প্রধান জনাব নাজির হোসেন হায়দার পাহাড়ীকে প্রশাসক নিয়োগ করেছেন। সরকারের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে গণকণ্ঠের প্রধান ফটকে পুলিশ বসিয়ে দেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে আমরা আমাদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ নিয়োগের আবেদন করেও সাড়া পাইনি। পুলিশ যদি আমাদের নিরাপত্তার জন্য অবস্থান করে, তাহলে অবশ্যই আপত্তির কিছুই থাকে না। কিন্তু তারা গণকণ্ঠের স্বাভাবিক কাজকর্মে বাধা দেবে না, এটাই কাম্য। অন্যদিকে চিরাচরিত নিয়মে নতুন প্রশাসক জনাব পাহাড়ী যদি অবাঞ্ছিত লোকজনদের নিয়ে একটি সংবাদপত্রের অফিসে প্রবেশ করে (যে ধরনের চেষ্টা গত শনিবার করা হয়েছে) দেশের একমাত্র বিরোধীদলীয় পত্রিকা গণকণ্ঠ প্রকাশনায় বাধা বা গণকণ্ঠ অফিসের অভ্যন্তরে অবাঞ্ছিত ঘটনার সূত্রপাত করেন তাহলে বিরোধীদলীয় পত্রিকাবিহীন বাংলাদেশের অবস্থা কি হবে? (সূত্র ঃ দৈনিক গণকণ্ঠ ২৬ মার্চ ১৯৭৩)

এই সম্পাদকীয় প্রকাশিত হওয়ার দু'দিন পর ২৮ মার্চ গণকণ্ঠের প্রকাশনা বন্ধ করা হয় ব্যবসায়ী চুক্তির অজুহাত দেখিয়ে। পত্রিকা বন্ধের প্রতিবাদে বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সম্পাদক আল মাহমুদ বলেন, 'গণকণ্ঠ অত্যন্ত বেআইনীভাবে বন্ধ করে দেয়ার ফলে পৌনে তিনশ' সাংবাদিক-কর্মচারী বেকার হয়েছে। সাংবাদিক-কর্মচারীদের মুহূর্তমাত্র সময় না দিয়ে অফিস হতে কাজ অসমাপ্ত

৭. বর্তমানে বাংলা সাহিত্য তথা বাংলাদেশের প্রধান কবি আল মাহমুদ। চির সবুজের কবি তিনি। ১৯৭২-৭৫ সালের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে লেখনী চালাতে যেয়ে গ্রেফতারবরণ করেন। তিনি ১৯৩৬ সালের ১১ জুলাই ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার মৌড়াইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।



www.pathagar.com

রাখা অবস্থায় বের করে দেয়া হয়েছে।' গণকণ্ঠ বন্ধের ঘটনায় বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক মহলে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন ৩১ মার্চ ২ ঘন্টার প্রতীক ধর্মঘট পালন করে এবং প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। (সূত্র ঃ দৈনিক জনপদ, ১ এপ্রিল ১৯৭৫)

বিভিন্ন মহলের প্রতিবাদের মুখে সরকার বাধ্য হয় গণকণ্ঠ পুনঃ প্রকাশের পরিবেশ সৃষ্টি করতে। ১৫ দিন বন্ধ থাকার পর ১৩ এপ্রিল গণকণ্ঠ পুনঃ প্রকাশিত হয়।

**দমননীতির শিকার সাপ্তাহিক হককথা**

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর (১৮৮০-১৯৭৬) আদর্শপুষ্ট সন্তোষ, টাঙ্গাইল হতে মুদ্রিত এবং সৈয়দ ইরফানুল বারীর সম্পাদনায় ২৫ ফেব্রুয়ারী থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক হককথা' অচিরেই জনপ্রিয়তায় শীর্ষস্থান দখল করে। সরকারী আমলাদের মদদে দেশব্যাপী যে দুর্নীতির স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা হয় তার সঠিক প্রতিবেদন মূলত পত্রিকাটি প্রতিটি সংখ্যায় তুলে ধরে। এর ফলে সরকারী মহল মুজিবের জনপ্রিয়তার ভাটা যাতে না পড়ে সে লক্ষ্যে হককথা'র অগ্রযাত্রা রোধ করার জন্য নানা রকম প্রচেষ্টা চালায়। টাঙ্গাইলের প্রেস থেকে হককথা মুদ্রিত হওয়ার দরুন সরকার অধিকাংশ প্রেসের বিরুদ্ধে দমননীতি পরিচালনা করে। যার ফলশ্রুতিতে প্রায় সবক'টি প্রেস হককথা প্রকাশে অপারগতা প্রকাশ করে।

**অবজারভার সম্পাদকের উপর নির্যাতন**

স্বাধীনতা-উত্তরকালে ইংরেজী পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার নাম পরিবর্তন হয়। হামিদুল হক চৌধুরীর মালিকানাধীন পত্রিকাটি সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। নবনির্বাচিত সম্পাদক হিসেবে পথিকৃৎ, প্রথিতযশা প্রবীণ সাংবাদিক আবদুস সালাম (১৯১০-১৯৭৭) পত্রিকার নামকরণ করেন 'দি বাংলাদেশ অবজারভার'। অবশ্য এর পূর্বে তিনি 'দি অবজারভার' নামকরণ করেছিলেন। ১৫ মার্চ 'দি সুপ্রীম টেস্ট' শীর্ষক সম্পাদকীয় লেখার জন্য শেখ মুজিব সরকার তার ২২ বছরের চাকরি জীবন থেকে তাঁকে অবসর প্রদান করেন। সাহসী সম্পাদক আবদুস সালাম কখনও অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি। কোন লোভ-লালসাই তাকে অনিয়মের বিরুদ্ধে কলম ধরা বন্ধ করতে পারেনি।

তিনি শুধু একজন নির্ভীক সাংবাদিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ। তিনি মানুষের মৌলিক অধিকার ও গণতন্ত্র রক্ষায় সাহসিকতা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আবদুস সালামের প্রতিবাদী কণ্ঠকে রুদ্ধ করার জন্য তৎকালীন সরকার ষড়যন্ত্র করে তাকে চাকরি থেকে সরিয়ে দিয়েছে। তিনি স্বাধীনতার আগে ও



www.pathagar.com

পরে সত্য প্রকাশ করতে গিয়েই শাসকের রোষাণলে পড়েছিলেন। স্বাধীনতার আগে এ জন্য তিনি কারাভোগ করেন এবং স্বাধীনতার পরে চাকরিও হারিয়েছিলেন।

৪ মে জাতীয় সংসদের স্পীকার মোহাম্মদ উল্লাহ সরকারের পক্ষেই যাক আর বিপক্ষেই যাক সাংবাদিকদের প্রকৃত তথ্য তুলে ধরার আহ্বান জানালেও ২২ মে সংবাদপত্রের প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়, 'গণপরিষদ সদস্যদের সাথে বচসার কারণে সাতক্ষীরায় একজন সাংবাদিক গ্রেফতার'।

২০ মে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক (১৯৪২-২০১১) এক বিবৃতিতে বলেন, 'তারা (সংবাদপত্র) বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট হিসেবে স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচারণ করেছে এবং এখন স্বাধীনতা ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এই সমস্ত পত্রিকার সম্পাদকবৃন্দ কি এত সহজেই ভুলে গেছেন যে, গত বছর এই সময়ে উক্ত রাষ্ট্রগুলো স্বাধীনতার জন্য কি বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। আমি তাদের সাবধান করে দিয়ে বলতে চাই যে, গণতন্ত্রকে ব্যবহার করে এভাবে গণবিরোধী ও বিদেশী চক্রান্ত সহ্য করা যাবে না ..... সরকার যদি এর আশু ব্যবস্থা না করেন, তবে জনগণই এই পত্রিকাগুলোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।'

### সাপ্তাহিক গণশক্তির প্রকাশনা বন্ধ ঘোষণা

৩০ মে দিবাগত রাতে আকস্মিকভাবে পুলিশ সাপ্তাহিক 'গণশক্তি'র সম্পাদক মোহাম্মদ তোয়াহা (১৯২২-১৯৮৭) এবং ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হাবিবুর রহমানের বাড়ী বিনা নোটিশে ঘেরাও করে প্রচলিত আইনকে তোয়াক্কা না করে তাদের সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আটক করে। শুধু তাই নয়, 'বেনামী' সম্পত্তির অজুহাতে তোয়াহার স্ত্রী মিসেস আরজাহান তোয়াহা ও বিধবা কন্যা শাহানা বেগম চীনুর (তার স্বামী ফেনী কলেজের প্রফেসর ফজলুল হককে পাক বাহিনী হত্যা করে) সম্পত্তি আটক করা হয়। সেই সময় থেকে গণশক্তির প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়।

### সাপ্তাহিক হক কথা সম্পাদককে গ্রেফতার

২১ জুন গ্রেফতার করা হয় সাপ্তাহিক হককথা সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারীকে।

### ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভায় শেখ মুজিবুর রহমানের হুশিয়ারি

১৭ জুলাই ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভায় শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০- ১৯৭৫) প্রতিশ্রুতি দেন, 'সরকার সংবাপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না'। একই সভায় তিনি ভিন্নমতাবলম্বীদের সমালোচনা করে বলেন, 'তথাকথিত প্রগতিবাদীরা সরকারের সমালোচনা শুরু করেছে। এদের সমালোচনা বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত হানছে। ফ্রি স্টাইলে কোন সমালোচনা সরকার সহ্য করবে না'।



www.pathagar.com

৬ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতির বিশেষ 'ক্ষমতা' বলে 'সাপ্তাহিক মুখপত্র' ও 'স্পোকসম্যান' সম্পাদক ফয়জুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। ৭ সেপ্টেম্বর আওয়ামীলীগাররা চট্টগ্রামের 'দৈনিক দেশ বাংলা' পত্রিকার অফিস জ্বালিয়ে দেয়। ৬ অকটোবর এক নির্দেশ জারি করে আওয়ামী লীগ সরকার বলে, 'সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেতার, টিভি ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের চিন্তা ও মতামত প্রকাশের পূর্বে সরকারী অনুমোদন নিতে হবে। পূর্বানুমতি ছাড়া তাদের লেখা কোথাও ছাপা হতে পারবে না।[৮]

### সাপ্তাহিক ইত্তেহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

২ মে সরকার অলি আহাদ সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'ইত্তেহাদের' বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না- এই মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করে। অলি আহাদ তখন তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর আমিরুজ্জামানের আমন্ত্রণে নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুতে অবস্থান করছিলেন। ১৬ মে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে তিনি সরকারের দমননীতি মনোভাবের জবাব দেন।

### দৈনিক স্বদেশের প্রকাশনা বন্ধ করণ

পরিত্যক্ত সম্পত্তি দৈনিক পয়গাম পত্রিকার সাংবাদিকরা নাম পরিবর্তন করে 'দৈনিক স্বদেশ' প্রকাশ শুরু করেন। সরকার আওয়ামী লীগের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান কোরবান আলীকে (১৯২২-১৯৯০) পত্রিকার প্রকাশক নিযুক্ত করেছিলেন। এক বছরের মাথায় প্রশাসনিক অব্যবস্থার কারণে ও লুণ্ঠনের ফলে স্বদেশ অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে যায়। ফলে ১৬ মে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়।

### সাপ্তাহিক নয়াযুগ বন্ধ ঘোষণা ও সম্পাদক গ্রেফতার

১৮ জুন সরকার প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স বলে সাপ্তাহিক 'নয়াযুগ' পত্রিকার সম্পাদককে গ্রেফতার করে 'নয়াযুগ' বন্ধ করে দেন।

### বাংলার বানী পত্রিকাকে বেশী সুবিধা প্রদান

২২ জুন সংসদে দাঁড়িয়ে প্রশ্নোত্তর পর্বে তথ্যমন্ত্রী এক পর্যায়ে স্বীকার করেন যে, ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে সাপ্তাহিক থেকে দৈনিকরূপে প্রকাশিত বাংলার বাণী পত্রিকাকে সবচেয়ে বেশী তথা ৭ লাখ ৯৩ হাজার ১৯২ টাকার সরকারী বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। অথচ পত্রিকাটির ডিক্লারেশনের ক্রমিক নম্বর ছিল সকলের নীচে'।

---

৮. দেখুন দৈনিক বাংলা, ৭ অকটোবর, ১৯৭২।



www.pathagar.com

## দৈনিক দেশ বাংলার প্রকাশনা বন্ধকরণ

আবু হেনা সম্পাদিত ইসলামিয়া লিথো এন্ড প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত এবং ৬, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক দেশবাংলা'র প্রকাশনা বন্ধ করা হয় ১১ অগাস্ট থেকে। এ সম্পর্কে দৈনিক জনপদে ১৩ অগাস্ট প্রকাশিত সংবাদ, 'গত শনিবার রাত দশটায় আকস্মিকভাবে পুলিশ চট্টগ্রাম দেশবাংলা অফিসে তালা লাগিয়েছে। দু'জন সাংবাদিক ও আটজন প্রেস শ্রমিকসহ মোট দশজনকে পুলিশ একই সময় গ্রেফতার করেছে।'

দেশ বাংলায় তালা লাগানো এবং সাংবাদিকসহ প্রেস শ্রমিকদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন ১২ আগস্ট রোববার এক জরুরী সভার আয়োজন করে। এছাড়া চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন পৃথক পৃথক বিবৃতিতে এ ঘটনার প্রতিবাদ জানায়। জাসদ নেতা মেজর এম এ জলিল (১৯৪২-১৯৮৯) ও আ স ম আব্দুর রব এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, 'কোন পত্রিকা ভুল তথ্যসহ কোন খবর ছাপালে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। কিন্তু প্রেস কর্মচারী ও সাংবাদিকদের অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়ে পত্রিকা অফিসে বেআইনীভাবে তালা ঝুলানো যায় না।'

অনেক বাদ-প্রতিবাদ শেষে শেখ মুজিবের সঙ্গে সাংবাদিকদের বৈঠকের মাধ্যমে দেশবাংলার সমস্যার সমাধান হয়। প্রায় ৪ মাস পর ম্যাজিস্ট্রেট দেশবাংলা অফিসের তালা খুলে দেন। (সূত্র ঃ দৈনিক আজাদ, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭৩)

## সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণে কালাকানুন জারী

সংসদকে পাস কাটিয়ে প্রিটিং প্রেসেস এন্ড পাবলিকেশন্স (রেজিস্ট্রেশন এন্ড ডিক্লারেশন) অর্ডিন্যান্স' ৭৩ নামে কালাকানুন জারি করা হয় ২৮ অগাস্ট (সংসদ নির্বাচনের[৯] ছয় মাসের মধ্যে) যা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স এ্যাক্ট-এর স্থলাভিষিক্ত হয়। অর্ডিন্যান্সটি কার্যত ১৯৬০ সালে আইয়ুব খানের (১৯০৭-১৯৭৪) ঘোষিত প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্সেরই একটি অনুলিপি মাত্র। যেখানে সংবাদপত্রগুলোর ওপর সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণকে নিশ্চিত করা হয়েছিল এবং ভিন্নমত প্রকাশের জন্য আটক সংবাদপত্র বেআইনী ঘোষণার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

পূর্বে জারি করা প্রেসিডেন্টের ৫০ নং আদেশ ও প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স বলে যথাক্রমে সংবাদপত্র ও সাংবাদিক দলনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। এতে সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক মহলে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। সাংবাদিক সংগঠনসমূহ সোচ্চার হয় ও আন্দোলনের হুমকি দেয়। ফেডারেল সাংবাদিক

৯. বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৭ মার্চ ১৯৭৩ সালে।



www.pathagar.com

ইউনিয়নের সভাপতি নির্মল সেন কালাকানুন বাতিল আন্দোলনের এক প্রস্তুতি সভায় বলেন, 'হাইজ্যাকার, চোরাচালানী, কালোবাজারী, মজুতদার দমনের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের ৫০ নং আদেশ জারি করা হয়। কিন্তু উক্ত দুস্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে এ আইনের সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে না। এ আইন ব্যবহার হচ্ছে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে। এ আইনে উক্ত দুষ্কৃতিকারীরা গ্রেফতার হলেও উচ্চ মহলের তদবিরে মুক্তি বা জামিন পাচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'স্বাধীন দেশে কালাকানুন বহাল রাখা শহীদদের রক্তের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। শহীদদের নাম উচ্চারণের কোন অধিকার তাদের নেই।' (সূত্র ঃ দৈনিক জনপদ ১৫ অগাস্ট ১৯৭৩)

১৯ সেপ্টেম্বর সংসদ অধিবেশনে প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্সটি পেশ করলে জাসদের এমপি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ সরকার (২৬৫ কুমিল্লা-২৫)-এর বিরোধিতা করেন। তিনি এই অর্ডিন্যান্সকে পাকিস্তানের সামরিক শাসক ফিল্ডমার্শাল আইয়ূবের (১৯০৭-১৯৭৪) কালাকানুনের সাথে তুলনা করেন। স্পীকার আব্দুল মালেক উকিলকে জানান যে, এ বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে বিএফইউজে আলোচনার কথা অস্বীকার করে। এ পর্যায়ে স্পীকার আব্দুল মালেক উকিল (১৯২৪-১৯৮৭) সাংবাদিক কম্যুনিটির প্রতি অশালীন বাক্য ছুড়েন।

২৩ নভেম্বর সাপ্তাহিক 'ওয়েভ' পত্রিকাটি আদালতের ইনজাংশন উপেক্ষা করে সরকার বন্ধ ঘোষণা করে। একই সাথে প্রেসিডেন্টের ৫০ নং আদেশ বলে দেশবাংলার সম্পাদককে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৭৩ সালের শেষ দিকে ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট (আইপিআই) এর এক রিপোর্টে বলা হয়, 'বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই। দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশেও সরকার সংবাদপত্রের ওপর কখনো প্রত্যক্ষ আবার কখনো পরোক্ষভাবে আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছেন। কে কত বেশি প্রভুকে সন্তুষ্ট করছে, ভক্তি দেখাচ্ছে তার ওপর ভিত্তি করে এসব দেশে সরকারী বিজ্ঞাপন যায়, নিউজপ্রিন্ট পর্যন্ত বরাদ্দ করা হচ্ছে'। আইপিআই-এর ওই রিপোর্টটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তকারে ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথমভাগে বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদের মাধ্যমে পাস করা বিশেষ ক্ষমতা আইন-১৯৭৪ দ্বারা সরকার প্রেস সেন্সরশিপের ব্যবস্থা নেয়ার অধিকারপ্রাপ্ত হয়। এই আইনে এমন সব বিধি-নিষেধ অন্তর্ভুক্ত হয় যার ফলে পত্র-পত্রিকায় প্রায় কোনকিছুই লেখা সম্ভব ছিল না।

১৯৭৩ এর প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স এ্যাক্টে আইয়ুবী আমলে বেশ কিছু ধারা ঢুকিয়ে দেয়া হলেও বিশেষ ক্ষমতা আইনে শুধুমাত্র আইয়ূব আমলের কালাকানুন নয়, বৃটিশ আমল থেকে মুজিব আমল পর্যন্ত সংবাদপত্র দলনের জন্য যত আইন প্রণীত



www.pathagar.com

হয়েছিল তার সবগুলো ধারা এ আইনে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। (সূত্র ঃ দৈনিক বাংলার বাণী, ১৪ জুলাই, ১৯৭৪)

১৭ মার্চ জাসদ কর্তৃক আয়োজিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাওয়ের পরের দিন দৈনিক গণকণ্ঠের অফিসে আওয়ামী পন্থীরা হামলা চালায়। পুলিশ হামলাকারীদের গ্রেফতার না করে গণকণ্ঠ সম্পাদক আল মাহমুদকে গ্রেফতার করে। ১৯৭৪ সালে সরকার নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করে। ৯ জুলাই এ আদেশ কার্যকর হয়। জুলাই মাসে সরকার মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সাপ্তাহিক 'প্রাচ্যবার্তার' সম্পাদক ফজলে লোহানীকে গ্রেফতার করে। এই সময় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'ইস্টার্ন একজামিনার' পত্রিকা সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক কৃতকর্মের আওতায় পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। ২০ নভেম্বর সংসদে সদ্য জারিকৃত অর্ডিন্যান্সের সাথে আরো বিষয়াদি যুক্ত করে বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যদের সমালোচনা, বিরোধিতা ও ওয়াকআউটের মুখে ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ডিক্লারেশন ও রেজিস্ট্রেশন) (সংশোধনী) বিলটি কণ্ঠভোটে পাস হয়। সংশোধিত আইন অনুযায়ী এমনকি অশোভন ও অশ্লীল বা অবমাননাকর মন্তব্য প্রকাশের জন্য সংবাদপত্রের ডিক্লারেশন বাতিলের ব্যবস্থা ছিল। এর জন্য কোনরূপ কারণ দেখবার সুযোগ দেবারও প্রয়োজন ছিল না। বস্তুত এই বিল পাসের মাধ্যমে সংবাদপত্রের যে স্বাধীনতা অবশিষ্ট ছিল তাকে পুরোপুরিভাবে হরণ করা হয়। বিলটিতে নতুন যে ধারা সংযোজিত হয় সেখানে বলা হয়, 'যদি কোন সংবাদপত্রে এমন কিছু প্রকাশ করা হয় যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আইনের প্রশাসন বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার বা কোন অপরাধ সংগঠনে কোন ব্যক্তিকে প্ররোচিত করে অথবা বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে অথবা যে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রীতির সম্পর্ক বিনষ্টের চেষ্টা করা হয় তাহলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করতে পারবে।'

সংবাদপত্র দলনের এমন বহুতর কলাকৌশল প্রয়োগ করার পরও ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশে বলবৎ করা হয় কুখ্যাত জরুরী আইন। এই আইনের বহু ধারা-উপধারা সন্নিবেশিত করে আরও কঠোরভাবে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়। সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে বহু বাধা-নিষেধ আরোপ করে স্বাধীন সাংবাদিকতা পেশাকে ধ্বংস করে ফেলা হয়। নির্দেশ জারী করা হয়–

১. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কলামে কিছু ছাপানো যাবে না।
২. দুর্নীতি সম্পর্কে কোন সংস্থার বিরুদ্ধে কিছু ছাপানো যাবে না।
৩. মিছিল-সভা [যদি সরকার সমর্থক না হয়] সম্পর্কে কিছু ছাপানো যাবে না।



www.pathagar.com

৪. দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে কোন সংবাদ ছাপানো যাবে না।
৫. আনাহারে মৃত্যু সম্পর্কে কোন কিছু ছাপানো যাবে না।
৬. থানা লুট, পিটিয়ে মারা সম্পর্কে কিছু ছাপানো যাবে না।
৭. দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ে কিছু ছাপানো যাবে না।
৮. বস্তি উচ্ছেদ নিয়ে কিছু ছাপানো যাবে না।
৯. কোন রিলিফ সংস্থার বিরুদ্ধে কোন কিছু ছাপানো যাবে না।
১০. সীমান্তে পাচারের বিরুদ্ধে কোন কিছু ছাপানো যাবে না।
১১. কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য করা যাবে না।
১২. পুলিশ বা রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে কোন কিছু ছাপানো যাবে না।
১৩. শ্রেণী বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এমন কোন কিছু ছাপানো যাবে না।
১৪. সরকারের কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা যাবে না।
১৫. প্রতিরক্ষা সম্পর্কে কোন কিছু ছাপানো যাবে না।'[১০]

এসব নির্দেশ অমান্যের জন্য নির্ধারিত ছিল চরম দণ্ড। ১৯৭৪-এর মহাদুর্ভিক্ষের খবর ছাপানোয় ৬টি সংবাদপত্র স্থগিত এবং ২টি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এর পরও যখন সমাজের প্রকৃত চিত্র তথা ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের কর্মকাণ্ড এবং দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মানুষের অসহায়ত্ব এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার চিত্র চিত্রিত হতে লাগলো সংবাদপত্রে তখন সমাজের দর্পন সংবাদপত্রের উপর আসলো কঠিন আঘাত।

২৭ জানুয়ারী ১৯৭৫ শেষবারের মতো গণকণ্ঠের প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং একই সাথে গণকণ্ঠের মুদ্রক প্রতিষ্ঠান ৪৫৩ নং বড় মগবাজারস্থ শতাব্দী প্রিন্টিং পাবলিকেশন্স এন্ড প্যাকেজেসও 'সিজ' করে দেয় পুলিশ। (সূত্র ঃ দৈনিক বাংলার বাণী, ২৯ জানুয়ারী, ১৯৭৫)

নির্ভীক সাংবাদিক এ.জেড.এম. এনায়েতুল্লাহ খানের সম্পাদনায় প্রকাশিত জনপ্রিয় ইংরেজি সাপ্তাহিক হলিডে বন্ধ করে দেয়া হয় ১৯৭৫ সালের ১৩ মে। বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় সম্পাদক এনায়েতুল্লাহ খানকে। পরে ১৫ অগাস্টের ট্রাজেডির ২৮ দিন আগে ১৭ জুলাই তিনি মুক্তি পেলেও হলিডেকে মুক্ত করতে অপেক্ষা করতে হয় ২৫ অগাস্ট পর্যন্ত। এনায়েতুল্লাহ খান কারাবন্দি ছিলেন প্রায় আড়াই মাস। তাঁর অপরাধ ছিল অকুতোভয় সত্য লেখা।

১৩ জুন The Newspaper (Annulment of Declaration) Ordinance, 1975 জারি করা হয়।

---

১০. দৈনিক বাংলা, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫; আরো দেখুন দুঃশাসনে সাংবাদিকতা, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৩।



www.pathagar.com

## সংবাদপত্রের কালো দিবস

১৬ জুন ১৯৭৫। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা হরনের সেই কালো দিবস। ১৬ জুন সংবাদপত্রের জন্য কালো দিবস। ১৯৭৫ সালের এ দিনটিতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বাকশাল সরকার এর বাকশালী দর্শন অনুযায়ী 'সংবাদপত্র ডিক্লারেশন বাতিলকরণ অর্ডিন্যান্স এবং সরকারী মালিকানাধীন সরকারী ব্যবস্থাপনা অর্ডিন্যান্স নামক একটি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে চারটি পত্রিকা (২টি বাংলা, ২টি ইংরেজি) রেখে সব পত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছিল। সংবাদপত্রের কণ্ঠ স্তব্ধ ও হাজার হাজার সাংবাদিক সেদিন বেকার হয়ে পড়েছিলেন। গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে এই হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়ে যায় সংবাদপত্র এবং রুদ্ধ হয়ে যায় বাক স্বাধীনতা। গণতন্ত্রের কবরের উপর এভাবেই দেয়া হয় সিমেন্টের ঢালাই। সারাদেশে নেমে আসে স্বৈরতন্ত্রের রুদ্ধশ্বাস অবস্থা। তখন গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে সরকারের এ নির্যাতনমূলক কার্যকলাপের প্রতিবাদ করার সাহস কারও হয়নি। তবে পরে ১৯৭৭ সালে তৎকালীন বিএফইউজে ও ডিইউজে ১৬ জুন দিনটিকে কালো দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। সে থেকে প্রথম দফা হামলার স্মরণে বাংলাদেশের সাংবাদিক সমাজ প্রতিবছর ১৬ জুন কালো দিবস পালন করে।

ইতিহাসের পাতায় এ দিনটির পরিচিতি কালো ও অন্ধকার দিবস হিসেবে। শুধু বাংলাদেশে নয়, এ দিনে যে নিকষ কালো অন্ধকার ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, তা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। জন্ম থেকে স্বাধীনচেতা জাতির কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেয়ার এক 'কালো' অধ্যায় রচনা করেছিল তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার। একদলীয় বাকশাল কায়েম করে দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের কবর রচনা করেছিল। সরকার তথা বাকশালের গুণকীর্তনের জন্য চারটি রেখে বাকি সব পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। তার পরের গণমাধ্যমের চিত্র ছিল অত্যন্ত করুণ। হাজার হাজার সাংবাদিকের বেকারত্ব, পেটের খিদে মেটানোর জন্য সাংবাদিক গগন, তানুদের ফলের টুকরি নিয়ে ফুটপাতে ব্যবসা শুরু, পড়ালেখার অর্থের জোগান দিতে না পেরে সন্তান-সন্ততিকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনা, আরও সব ক্লেদাক্ত কষ্টগাঁথা.....।

নিউজ টুডে সম্পাদক ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'সরকার নিয়ন্ত্রিত চারটি পত্রিকা রেখে সব পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল মূলত জনগণের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য, একদলীয় বাকশালী শাসন ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করার জন্য। এর ফলে সাংবাদিক সমাজ দু'ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথমত, স্বাধীন সাংবাদিকতার-পথ রুদ্ধ হয়ে যায়; দ্বিতীয়ত, বন্ধ হয়ে যায় রুটি-রুজির সংস্থান। এ জন্যই দিবসটিকে বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে কালো দিবস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, যারা এটা করেছিল তারা ইতিহাসের আস্তাকুড়ে



www.pathagar.com

নিক্ষিপ্ত হয়েছে। জনবিচ্ছিন্ন সরকারের এ সিদ্ধান্ত থেকে শিক্ষা নিয়ে সাংবাদিক সমাজকে অধিকারের প্রশ্নে আগামী দিনগুলোতে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।'[১১]

গণ মাধ্যমের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের এই নগ্ন হস্তক্ষেপে রুদ্ধ হয়ে যায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, গোষ্ঠির স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা। তখন গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে সরকারের এ নির্যাতনমূলক কার্যকলাপের প্রতিবাদ করার সাহস কারও হয়নি। তবে পরের বছর থেকে থেকে সাংবাদিক সমাজ এ দিনটিকে সংবাদপত্রের কালো দিবস হিসেবে পালন করে আসছে।

১৯৭৫ সালে সংবাদপত্র বন্ধের ঘটনা ওই সময়ের চারটি দৈনিকে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। এসব প্রতিবেদনে সংবাদপত্র (ডিক্লারেশন বাতিল) অর্ডিন্যান্সের পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরা হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত কয়েকটি প্রতিবেদন তুলে ধরা হলো-

**ইত্তেফাকের নতুন সম্পাদক ঃ** সংবাদপত্র সম্পর্কে সরকারের নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী জনাব নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য যে, সরকার দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার ব্যতীত সকল পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করেন এবং পরে ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ টাইমসকে নতুনভাবে ডিক্লারেশন প্রদান করেন। নতুন ব্যবস্থায় জনাব নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী ইত্তেফাকের সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। (দৈনিক ইত্তেফাক ঃ ১৭ জুন ১৯৭৫)

**দ্বিতীয় বিপ্লবের আলোকে সংবাদপত্র সম্পর্কে নতুন নীতি ঘোষণা ঃ** রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবাদপত্র পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপারে নতুন নীতি ঘোষণা করিয়া দুইটি অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন। নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী আজ (মঙ্গলবার) হইতে সারাদেশে দৈনিক ইত্তেফাক, বাংলাদেশ অবজারভার, দৈনিক বাংলা এবং বাংলাদেশ টাইমস এই চারটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। জনাব নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী, জনাব ওবায়দুল হক, শেখ ফজুলল হক মনি (১৯৩৯-১৯৭৫) ও জনাব এহ্তেশাম হায়দার চৌধুরী যথাক্রমে দৈনিক ইত্তেফাক, বাংলাদেশ অবজারভার, বাংলাদেশ টাইমস ও দৈনিক বাংলার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

সরকার আরো ১২২টি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার ডিক্লারেশন বহাল রাখিয়াছে। এইসব পত্রপত্রিকাগুলি ছাড়া সরকারের বিনা অনুমতিতে আর কেনো পত্রিকা প্রকাশিত

---

১১. মাহাবুবুর রহমান, কালো দিবসে সম্পাদক ও সাংবাদিক নেতাদের ভাবনা, দৈনিক আমার দেশ, ১৬ জুন ২০১২, পৃঃ ৭।



www.pathagar.com

হইবে না। বাংলাদেশ সরকার সংবাদপত্র (ডিক্লারেশন বাতিল) অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫ জারি করিয়া 'বাংলাদেশ অবজারভার' ও 'দৈনিক বাংলা' এবং ১২২টি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা ভিন্ন বাদবাকী সকল পত্রপত্রিকার ডিক্লারেশন ১৭ই জুন হইতে বাতিল করিয়া দিয়াছেন। বাসস ও এনা পরিবেশিত খবরে বলা হয় : এই অর্ডিন্যান্স জারির অব্যবহিত পরে সরকার দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ টাইমস এই দুই দৈনিক সংবাদপত্রও প্রকাশের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। অতঃপর উক্ত চারটি দৈনিক এবং ১২২টি সাময়িকী ছাড়া বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি ভিন্ন আর কোনো পত্রিকা বা সাময়িকী প্রকাশিত হইবে না।

সরকার যুগপৎ আরও একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন। সরকারি মালিকানাধীন সংবাদপত্রসমূহ পরিচালনার জন্য জারিকৃত এই অর্ডিন্যান্সের নাম হইতেছে সরকারী মালিকানাধীন সংবাদপত্র (ব্যবস্থাপনা) অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৫।

সরকার এতদসঙ্গে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে চট্টগ্রাম ও খুলনা হইতে একটি করিয়া এবং উত্তরাঞ্চলীয় কোনো একটি জেলা হইতে অপর একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইবে।

ডিক্লারেশন বাতিলের ঘোষণা প্রকাশের অব্যবহিত পরে তথ্য ও বেতার দফতরের মুখপাত্র সাংবাদিকদের জানান যে, বাতিল সংবাদপত্রসমূহের কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষা ও ভবিষ্যত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

ছাপাখানার কর্মচারীরা ভিন্ন বাতিল সংবাদপত্রসমূহের অন্যান্য কর্মচারীকে ৩০ শে জুনের মধ্যে কমিটির নিকট রিপোর্ট করার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

কমিটির সদস্যবৃন্দ হইতেছেন : জনাব মিজানুর রহমান, অধ্যাপক এম এ খালেদ এমপি, তথ্য ও বেতার দপ্তরের জয়েন্ট সেক্রেটারী আনিসুজ্জামান খান, তথ্য ও বেতার দফতরের ডেপুটি সেক্রেটারী জনাব সলিমুজ্জামান, জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী, জনাব আমানুল্লাহ খান এমপি (বগুড়া) এবং জনাব আবদুল গণি হাজারী। জনাব আনিসুজ্জামান খান কমিটির আহ্বায়করূপে কাজ করিবেন।

ঢাকা ও খুলনায় বাতিল সংবাদপত্রসমূহের কর্মচারীদের জনাব মিজানুর রহামনের নিকট রিপোর্ট করিতে হইবে। অবজারভার হাউজে তাহার অফিস হইবে। চট্টগ্রামে কর্মচারীরা সংসদ সদস্য অধ্যাপক এম এ খালেদের নিকট এবং বগুড়ার কর্মচারীরা সংসদ সদস্য জনাব আমানুল্লাহ খানের নিকট রিপোর্ট করিবেন।

রাষ্ট্রপতি সংবাদপত্রের ডিক্লারেশন বাতিলের এই অর্ডিন্যান্স জারি করেন। অর্ডিন্যান্সে বলা হয় : পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক হইয়া পড়ে। সরকারের মালিকানাধীন সংবাদপত্র ব্যবস্থাপনা অর্ডিন্যান্স বলে সরকারী



www.pathagar.com

সংবাদপত্রসমূহের পরিচালনা ও উন্নয়ন সাধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সংবাদপত্র মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যবসায় পরিচালনার জন্য গঠিত নির্দিষ্ট কতকগুলি কোম্পানী ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্যও অর্ডিন্যান্সে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই অর্ডিন্যান্স বলে সরকারের মালিকানাধীন সংবাদপত্রসমূহের জন্য সরকার পরিচালনা বোর্ড গঠন করিবেন। সরকার বোর্ডে একজন চেয়ারম্যান এবং উপযুক্ত সংখ্যক সদস্য নিয়োগ করিবেন। বোর্ড অন্যান্য কাজের সহিত নিম্নলিখিত কার্যাদি সম্পাদন করিবেঃ সরকারের মালিকানাধীন সংবাদপত্রসমূহের এবং সংবাদপত্র মুদ্রণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সরকারের মালিকানাধীন ছাপাখানাসমূহের ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ, সরকারের অনুমতি অনুযায়ী স্বীয় পরিচালনাধীন সংবাদপত্র ও ছাপাখানা সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদন ও কার্যকরীকরণ, বোর্ড সংবাদপত্র ও ছাপাখানা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ, কাঁচামাল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিবে।

বোর্ড সুষ্ঠু ব্যবসায়িক ভিত্তিকে স্বীয় দায়িত্ব সম্পাদন করিবে, যাহাতে গণসংযোগ মাধ্যমের চাহিদা পর্যাপ্তভাবে পূরণ হয় এবং বিদেশে গঠনমূলকভাবে প্রগতিশীল জাতীয় ভাবমূর্তি বিধৃত হয়। (দৈনিক ইত্তেফাক ঃ ১৭ জুন ১৯৭৫)

**সরকারী মালিকানাধীন সংবাদপত্র (ব্যবস্থাপনা) অর্ডিন্যান্সের পূর্ণ বিবরণ**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আইন, সংসদবিষয়ক ও বিচার মন্ত্রণালয়ের আইন এবং সংসদ বিষয়ক দফতরের ১৩ জুন ১৯৭৫ সালের নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ঘোষিত সরকারি মালিকানাধীন সংবাদপত্র (ব্যবস্থাপনা) অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৫ তথা ১৯৭৫-এর ৩৪ নং অর্ডিন্যান্সের পূর্ণপাঠে বলা হয় :

সরকারি মালিকানাধীন সংবাদপত্রসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন এবং সংবাদপত্র মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত কতিপয় কোম্পানী ভাঙ্গিয়া দিবার উদ্দেশ্যে ইহা একটি অধ্যাদেশ। যেহেতু সরকারি মালিকানাধীন সংবাদপত্রসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সরকার কর্তৃক কারবার পরিচালনা হইতেছে এই রূপ সংবাদপত্র মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত কতিপয় কোম্পানী ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং তৎসংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক ব্যাপারে ব্যবস্থাগ্রহণ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

এবং যেহেতু সংসদ এখন অধিবেশনে নহে এবং আশু কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা উদ্রেককর পরিস্থিতি বিরাজমান বলিয়া রাষ্ট্রপতি মনে করিতেছেন, তাই এক্ষণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদের (১) নং ধারা অনুযায়ী ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া রাষ্ট্রপতি নিম্নোক্ত অর্ডিন্যান্স প্রণয়ন এবং জারী করিতেছেন :

১। সংক্ষিপ্ত নাম : এই অর্ডিন্যান্সকে বলা হইবে সরকারী মালিকানাধীন সংবাদপত্র (ব্যবস্থাপনা) অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৫।



www.pathagar.com

২। সংজ্ঞাসমূহ : এই অর্ডিন্যান্সের বিষয়বস্তু ও পরিপ্রেক্ষিতে ব্যতিক্রম কোনো কিছু না থাকিলে (ক) 'বোর্ড' বলিতে বুঝাইবে ৩ নং ধারার অধীনে গঠিত সরকারী মালিকানাধীন সংবাদপত্রসমূহ ব্যবস্থাপনার বোর্ড (খ) অবলুপ্ত কোম্পানী বলিতে বুঝাইবে ৬ নং ধারার অধীনে যে কোম্পানী গঠিত হইয়াছে।

৩। ব্যবস্থাপনা বোর্ডের গঠন :

(১) সরকার এই অর্ডিন্যান্সের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সরকারী মালিকানাধীন সংবাদপত্রের ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবস্থাপনা বোর্ড নামে একটি বোর্ড গঠন করিতে পারিবেন।

(২) একজন চেয়ারম্যান এবং সরকারের বিবেচনায় উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত সংখ্যক অন্যান্য সদস্য লইয়া বোর্ডটি গঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য যে শর্তাবলীর অধীনে দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন এবং বোর্ডের বৈঠকের বিধি পদ্ধতি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইবে।

৪। বোর্ডের কার্যক্রম ঃ বোর্ডের কার্যক্রম হইবে-

(ক) সরকারের মালিকানাধীন সংবাদপত্র এবং সরকারের মালিকানাধীন মুদ্রণ ছাপাখানাসমূহ পরিচালনা, উন্নয়ন, প্রসারে ব্যবস্থা আধুনিক করা এবং এই সকল সংবাদপত্র মুদ্রণ ও প্রকাশনার জন্য ঐগুলি ব্যবহার করা।

(খ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইলে, স্বীয় ব্যবস্থাপনাধীন সংবাদপত্র ও ছাপাখানা সংশ্লিষ্ট যে কোনো চুক্তি বা ব্যবস্থা সম্পাদন এবং বাস্তবায়ন করা।

(গ) স্বীয় ব্যবস্থাপনাধীন সংবাদপত্র ও ছাপাখানাগুলির জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো যন্ত্র, কলকব্জা রক্ষণাবেক্ষণের খুচরা অংশ, কাঁচামাল ও সামগ্রী অথবা অন্য যে কোনো প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়করণ।

(ঘ) সরকারের বিশেষ অনুমোদনক্রমে ব্যবস্থাপনাধীন যে কোনো সম্পত্তি জিম্মা রাখিয়া ধার গ্রহণ বা অর্থ সংগ্রহ।

(ঙ) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অথবা উপরোক্ত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অনুরূপ অন্যবিধ কাজ সম্পাদন।

৫। বোর্ড কর্তৃক অনুসৃত নীতি :

(১) বোর্ড উহার কার্যক্রম সম্পাদনকালে দেশের গণসংযোগ মাধ্যম এবং গঠনমূলকভাবে জাতীয় প্রগতিশীল ভাবমূর্তি বিদেশে উপস্থাপনের চাহিদা পর্যাপ্তভাবে পূরণ করিয়া বলিষ্ঠ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কাজ করিয়া যাইবেন।

(২) বোর্ড উহার কার্যক্রম সম্পাদন কালে সময় সময় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশাদি দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

(৩) কতিপয় কোম্পানী বাতিলকরণ-



www.pathagar.com

(১) ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইন (১৯১৩-এর ৭ম) অথবা সাময়িকভাবে বলবৎ অন্য কোনো আইনে অথবা অন্য কোনো ট্রাস্ট বা ওয়াকফ বা অন্য চুক্তি বা দলিলে যা কিছুই থাকুক না কেন, তফসিলে বর্ণিত কোম্পানীগুলো এই অর্ডিন্যান্স বলবৎ হইবার সাথে সাথে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

(২) (১) নং উপধারা অনুযায়ী কোম্পানীগুলি ভাঙ্গিয়া যাইবার পর

(ক) অবলুপ্ত কোম্পানীগুলির সকল পরিসম্পদ, স্বত্ব, অধিকার ও সুবিধা এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, তৎসহ সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর শেয়ার এবং ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও বিক্রয়) আদেশ (পি. ও. নং ১৬. ১৯৭২) এর অধীনে সরকারের হাতে ন্যস্ত হয় নাই- এইরূপ শেয়ার সেইগুলি অন্য কোম্পানী, কর্পোরেশন বা ট্রাস্টে রহিয়াছে, উহার পর হইতে উহাকে উক্ত আদেশ বলিয়া অভিহিত করা হইবে এবং অবলুপ্ত কোম্পানীসমূহের সকল নগদ অর্থ ও ব্যাংকের জমা সংরক্ষিত তহবিলও বিনিয়োগ এবং বিলুপ্ত কোম্পানীর এই রূপ সম্পত্তি হইতে উৎসারিত সকল স্বার্থ ও স্বত্ব অথবা দখলী স্বত্ব, ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইয়া যাইবে।

(খ) অবলুপ্ত যে কোনো কোম্পানী কর্তৃক উহার ব্যবসায় ও কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে বা তৎসংশ্লিষ্টে সৃষ্ট সকল দেনা ও দায় গৃহীত সকল দায়িত্ব, সম্পাদিত সকল চুক্তি এবং সম্পাদিত সকল আয়োজন অথবা সম্পাদনের জন্য গৃহীত আয়োজিত সকল বিষয়াদি সরকারের হাতে হস্তান্তরিত হইবে এবং সরকার কর্তৃক, সরকারের সহিত, সরকারের জন্য সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে।

(গ) অবলুপ্ত কোম্পানীসমূহ উহাদের কারবার ও কার্যক্রমের জন্য সংশ্লিষ্ট ও উদ্দেশ্যে কোনো অর্থ অঙ্ক প্রদানযোগ্য বা আদায়যোগ্য হইলে সরকার উহা পরিশোধ বা আদায় করিতে পারিবেন।

(ঘ) পরিপ্রেক্ষিত হেতু অন্যতর না বুঝাইলে এই সকল কোম্পানীর ব্যবসা ও কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও সংশ্লিষ্টে যে কোনো চুক্তি, দলিল, আমমোক্তারনামা, আইনগত প্রতিনিধিত্ব এবং যে কোনো প্রকৃতির অন্যবিধ দলিলে কোনো অবলুপ্ত কোম্পানীর কোনো প্রসকোজেন্স থাকিলে তাহা সরকারে প্রসঙ্গ উল্লেখ বলিয়া ধরা হইবে এবং এইরূপ চুক্তি, দলিল, ক্ষমতা, মঞ্জুরী বা চুক্তি তদনুযায়ী কার্যকর হইবে।

(ঙ) অবলুপ্ত কোম্পানীসমূহের কারবার ও কার্যক্রমের প্রয়োজন ও সংশ্লিষ্টে অবলুপ্ত কোম্পানী কর্তৃক বা উহাদের বিরুদ্ধে এই ধারার অধীনে কোম্পানী অবলুপ্ত হইবার পূর্বে আরোপিত সকল মামলা, আপীল ও আইনগত শুনানী সরকার



www.pathagar.com

কর্তৃক বা সরকারের বিরুদ্ধে আরোপিত মামলা, আপীল ও আইনগত শুনানি বলিয়া ধরা হইবে এবং তদনুযায়ী অব্যাহত ও ক্রমাগত থাকিবে :

(চ) কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে সরকার বিশেষ আদেশ বলে তাহার নিয়োগ বা চাকুরি নাকচ করিয়া দিলে এবং সরকার কর্তৃক চাকুরির শর্তাবলী নির্ধারিত ও পুনঃসংজ্ঞায়িত না হইলে অবলুপ্ত কোম্পানীগুলির সকল অফিসার ও অন্যান্য কর্মকর্তার চাকুরি, চাকুরির কোনো চুক্তি বা শর্তে যাহাই থাকুক না কেন ওই সকল কোম্পানী অবলুপ্ত হইবার তাৎক্ষণিক পূর্ববর্তী শর্তাবলীতে সরকারের হাতে হস্তান্তরিত হইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে।

(ছ) এই অর্ডিন্যান্স দ্বারা বা উহার অধীনে অবলুপ্ত কোম্পানীর কোনো অফিসার বা অন্যান্য কর্মচারীর চাকুরি সরকারের নিকট স্থানান্তরিত হইলে এইরূপ বাতিল ও বদলীর কারণে কোনো ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাইবে না।

৬। বিরোধ এড়াইবার উদ্দেশ্যে এতদ্বারা ঘোষণা করা হইতেছে যে, উক্ত আদেশের অধীনে সরকারের নিকট ন্যস্ত অবলুপ্ত কোম্পানীর সকল সম্পত্তি উক্ত আদেশের আওতায় পরিত্যক্ত সম্পত্তি বলিয়া আর পরিগণিত হইবে না এবং তদনুযায়ী আর উক্ত আদেশের বিধিসমূহের আওতাভুক্ত থাকিবে না।

৭। ক্ষতিপূরণ : (১) ৬নং ধারার অধীনে সরকারের হাতে ন্যস্ত কোনো অবলুপ্ত কোম্পানীতে বিরাজমান শেয়ার এবং এই সকল শেয়ার হইতে উদ্ভূত সকল স্বত্বের ক্ষেত্রে এই ধরনের শেয়ারের মালিকদিগকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদত্ত হইবে-

(ক) যদি শেয়ারের পূর্ণমূল্য পরিশোধিত হইয়া থাকে, ঐ সকল শেয়ারের লিখিত মূল্য, এবং

(খ) শেয়ারসমূহের পুনঃমূল্য সম্পূর্ণ পরিশোধিত না হইয়া থাকিলে, ঐ সকল শেয়ারের খাতে প্রকৃতই পরিশোধিত অংকের সমান অর্থ।

(২) অবলুপ্ত কোম্পানীর একজন শেয়ারহোল্ডার (১) নং উপধারার অধীনে প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিয়া লইয়া এইরূপ শেয়ারহোল্ডার এইরূপ কোম্পানীর দেনা ও দায়ের সংশ্লিষ্ট সকল দায়িত্ব হইতে সম্পূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ অব্যাহতি লাভ করিবেন।

(৩) কোনো শেয়ারহোল্ডার (১) নং উপধারার অধীনে তাহার শেয়ারসমূহের জন্য প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে সেক্ষেত্রে ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইনের (১৯১৩ সালের ৭ম) অধীনে অবলুপ্ত কোম্পানীর হিসাব-নিকাশের পর দায় অপেক্ষা পরিসম্পদের মূল্য বেশি বা কম হইলে তদনুযায়ী তিনি অংশ লইতে বাধ্য থাকিবেন।



www.pathagar.com

**স্বত্বসীল**

(৬ নং ধারা দ্রষ্টব্য)

১। আলহেলাল প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোম্পানী লিমিটেড।

২। দৈনিক পাকিস্তান লিমিটেড।

৩। ন্যাশনাল নিউজ পাবলিকেশন্স লিমিটেড।

৪। জনতা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড।

শেখ মুজিবুর রহমান; রাষ্ট্রপতি।

বিচারপতি এম এইচ রহমান সেক্রেটারী

ঢাকা ১৩ জুন, ১৯৭৫। (দৈনিক ইত্তেফাক : ১৭ জুন ১৯৭৫)

**সংবাদপত্র (ডিক্লারেশন বাতিল) অর্ডিন্যান্সের পূর্ণ বিবরণ** : ১৯৭৫ এর সংবাদপত্র (ডিক্লারেশন বাতিল) অর্ডিন্যান্স (১৯৭৫-এর ৩৩তম) এর পূর্ণ বিবরণ :

যেহেতু, জনস্বার্থে কতিপয় সংবাদপত্রের ডিক্লারেশন বাতিলকরণ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে; এবং যেহেতু সংসদ অধিবেশন নাই এবং রাষ্ট্রপতি মনে করেন যে, আশু কার্যক্রম অপরিহার্য হইয়া পড়ার মতো পরিস্থিতি বিরাজমান;

তাই, এক্ষণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩নং অনুচ্ছেদের (১) নং ধারার অধীনে ..... ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নোক্ত অর্ডিন্যান্স প্রণয়ন ও জারি করিতেছেন।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও বলবৎকরণ

(১) এই অর্ডিন্যান্সকে বলা হইবে সংবাদপত্র (ডিক্লারেশন বাতিলকরণ) অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫।

(২) ইহা ১৯৭৫ এর জানুয়ারী মাসের ১৭ তারিখ হইতে বলবৎ হইবে।

২। কতিপয় সংবাদপত্রের ডিক্লারেশন বাতিলকরণ; ১৯৭৩ সালের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ডিক্লারেশন ও রেজিস্ট্রেশন) আইনে (১৯৭৩ এর ২৩তম) (এখন ইহাকে উক্ত আইন বলিয়া অভিহিত করা হইবে) অথবা সাময়িকভাবে বলবৎ অন্য যে কোনো আইনে যাহাই থাকুন না কেন-

(ক) তফসিলে বর্ণিত সংবাদপত্রগুলি ব্যতিরেকে উক্ত আইনের অধীনে যে কোনো সংবাদপত্রের জন্য প্রদত্ত ও গৃহীত ডিক্লারেশন এই অর্ডিন্যান্স জারি হওয়ার সাথে সাথে বাতিল হইয়া যাইবে এবং

(খ) এই অর্ডিন্যান্স জারি হওয়ার পর সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে অথবা জনস্বার্থের খাতিরে অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত কার্যসাপেক্ষে মঞ্জুরযোগ্য সরকারী অনুমোদন লাভ ব্যতিরেকে উক্ত আইনের অধীনে কোনো সংবাদপত্র মুদ্রণ ও প্রকাশনার জন্য কোনো ডিক্লারেশন প্রদান বা গ্রহণ করা যাইবে না।



www.pathagar.com

৩। শর্ত লঙ্ঘনের দায়ে ডিক্লারেশন বাতিলকরণ : ২ (খ) ধারার অধীনে প্রদত্ত অনুমতি অনুসারে কোনো সংবাদপত্রের জন্য ডিক্লারেশন প্রদত্ত হইলে, যে শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল উহার কোনো শর্ত লঙ্ঘন অথবা শর্ত পালনের ব্যর্থতার কারণে সরকার আদেশক্রমে ডিক্লারেশন বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন।

এ প্রসঙ্গে প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক অলি আহাদ লিখেছেন, '....... একদলীয় শাসন টেকসই করার নিমিত্ত যে কোন ধরনের সমালোচনার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করার অসৎ প্রয়াসে ১৯৭৫ সালের ১৬ই জুন সংবাদপত্র (ডিক্লারেশন বাতিল) অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। সরকার নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমের চারটি দৈনিক ব্যতীত সকল দৈনিক পত্রিকা বাতিল ঘোষণা করা হয়। অর্ডিন্যান্সে ১৭ই জুন ১৯৭৫ হতে সারা বাংলাদেশে দৈনিক ইত্তেফাক, বাংলাদেশ অবজারভার, দৈনিক বাংলা এবং দৈনিক বাংলাদেশ টাইমস এই চারটি দৈনিক প্রকাশের কথা ঘোষণা করা হয়। সরকার আরো ১২২টি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার ডিক্লারেশন বহাল রাখে।[১২]

অলি আহাদের সম্পাদনায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক ইত্তেহাদসহ বাদবাকি সাপ্তাহিক, মাসিক ও সাময়িকীর ডিক্লারেশন বাতিল ঘোষণা করা হয়।[১৩]

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রুহুল আমিন গাজী বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন আওয়ামী লীগ সরকার গণতন্ত্রকে হত্যা করে একদলীয় বাকশাল কায়েম করে। সংবাদপত্র যেহেতু গণতন্ত্রের শক্তি ও বাকশালের অন্তরায়, তাই সরকার নিজেদের প্রচারের জন্য চারটি সংবাদপত্র রেখে বাকি সব পত্রিকা, সাময়িকী বন্ধ করে দেয়। সংবাদপত্র বন্ধ করে সাংবাদিকতার পথ রুদ্ধ করায় ওইদিন হাজার হাজার সাংবাদিক বেকার হয়ে পড়েছিলেন। তারা নিদারুণ কষ্টে পড়েছিলেন পরিবার-পরিজন নিয়ে। শুধু সংবাদপত্র বন্ধ করে সাংবাদিকদের চাকরিচ্যুত করেই ক্ষান্ত হয়নি সরকার; সাংবাদিকদের বাকশালে যোগ দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। সাংবাদিকদের মধ্যে যারা বাকশালে যোগ দেয়নি, তাদের ওই সময়ে কঠিন পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছিল। নতুন প্রজন্মের অনেকের কাছেই ১৬ জুনের ঘটনা অজানা।

১৬ জুন পত্রিকাগুলো বন্ধ হওয়ার পর পরবর্তী সরকারের প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ একটি অধ্যাদেশ জারি করেন এবং সাবেক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান (১৯৩৬-১৯৮১) আইন করে এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিশেষ

---

১২. অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-১৯৭৫, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি. ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৪, পৃঃ ৪৭৮।

১৩. অলি আহাদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৭৮।



www.pathagar.com

ক্ষমতা আইন বাতিল করে সংবাদপত্রের অধিকার নিশ্চিত করেন। সাংবাদিকদের অব্যাহত আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ১৬/এ ধারা বাতিল করেন। গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত স্বাধীন সংবাদপত্র। তাই ওই সময় সংবাদপত্র বন্ধ করে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। 'এক নেতা, এক দল', 'এক দেশ' এই মানসিকতা থেকেই আওয়ামী লীগ এ কাজ করে।

১৯৭৭ সালে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সভায় ১৬ জুনকে কালো দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর ধারাবাহিকতায় প্রতিবছর ১৬ জুন সংবাদপত্রের কালো দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে সংবাদপত্র যতদিন থাকবে, সাংবাদিকরা ততদিন ১৬ জুনকে কালো দিবস হিসেবে পালন করবেন।[১৪]

## জেনারেল এইচ এম এরশাদের সামরিক স্বৈরশাসনামলে নির্যাতন

১৯৮২ সালে ওই সময়ের সেনাপ্রধান এইচএম এরশাদ রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে (১৯০৬-১৯৮৫) ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতা দখলের পর থেকে সংবাদপত্র দলন ও সাংবাদিক নির্যাতনে ভয়াবহ হয়ে ওঠেন। তার সরকারের ৯ বছরের সামরিক শাসনের মধ্যে ৪০টি দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা বন্ধ হয়। ওই সময় গণমাধ্যম ছিল পুরোপুরি সামরিক ফরমানের অধীনে। এরশাদের শাসনামলে প্রখ্যাত সাংবাদিক আতাউস সামাদ (১৯৩৭-২০১২), ফয়েজ আহমদকে গ্রেফতার করা হয়। সাংবাদিক মতিউর রহমান চৌধুরীসহ আরও অনেকের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক অসংখ্য মামলা হয়।

যশোরের দৈনিক রানার পত্রিকার সম্পাদক গোলাম মাজেদকে তার আপোষহীন নির্ভীক লেখনীর জন্য এরশাদের সামরিক শাসনামলে নির্মমভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হয়।

'সাংবাদিকরা তাঁদের ভূমিকা পালন করেন অনেক সময় লিখে, কোনো কোনো সময় না লিখে, প্রতিবাদে। এ লক্ষ্যে লেখা যতটুকু কার্যকর, না লেখাও ততটুকু গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দুয়েরই পরীক্ষা হয়েছে। এরশাদ সরকার যখন জরুরী আইন জারী করে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধে উদ্যত হন, সাংবাদিকরা না লিখে যা করেছেন তাও ঐতিহাসিক। সাংবাদিকদের নীরবতাই স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে

১৪. দৈনিক আমার দেশ, ১৬ জুন কালো দিবসে সম্পাদক ও সাংবাদিক নেতাদের ভাবনা, ১৬ জুন ২০১২, পৃঃ ৭।



www.pathagar.com

জনগণকে আরো সোচ্চার করে তোলে। বিশ্বময় ঝড় ওঠে। এরশাদের পতন ত্বরান্বিত হয়।'[১৫]

এ প্রসঙ্গে রিয়াজ উদ্দিন আহমদ লিখেছেন, '১৯৯০ সাল ছিল বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে আরেক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এ সালের শেষদিকে দীর্ঘ ৯ বছর ধরে চেপে বসা স্বৈরাচারের শেকড় উপড়ে ফেলতে ছাত্র-জনতার মরণপন আন্দোলন তুঙ্গে উঠলে অন্যান্য পেশাজীবী গ্রুপের সঙ্গে সাংবাদিক-সমাজও এ আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করে। তবে এ একাত্মতা জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে মৌখিক কোন ঘোষণাপত্র ছিল না। সাংবাদিকরা দ্ব্যর্থহীন সিদ্ধান্ত নেন, যদি সরকারি সেন্সরশীপের জন্যে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের খবর চাপানো না যায় তাহলে তারা পত্রিকাই বের করবেন না। সাংবাদিকদের এ সিদ্ধান্ত অনুসারে সারা দেশে সেদিন পত্রিকা প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায় এবং স্বৈরাচারের পতনের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সাংবাদিকরা আর কাজে ফিরে যাবে না। তাঁরা স্বৈরাচারের রক্ত চক্ষুর শাসন মেনে, তার ছুড়ে দেয়া প্রলোভনের শিকার হয়ে সেন্সরকৃত সংবাদপত্র প্রকাশে রাজি হননি। বাংলাদেশের সাংবাদিকদের সেদিনের সে ভূমিকা গোটা বিশ্বের প্রশংসা অর্জন করে।'[১৬]

## আওয়ামী লীগ সরকারের দ্বিতীয় আমল (১৯৯৬-২০০১)

১৯৯৬ সালের ১২ জুনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী শেখ হাসিনা সরকারের শপথ গ্রহণের কয়েক ঘন্টা পূর্বে সাংবাদিকদের ওপর নিষ্ঠুর পুলিশী হামলা চালিয়ে সংবাদপত্র দলনের প্রাথমিক যাত্রা শুরু হয়। সংসদ সচিবালয়ে প্রবেশকে কেন্দ্র করে পুলিশ ফটো সাংবাদিকদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালায়।

ফটো সাংবাদিকরা এমপিদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের ছবি তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি চেয়েছিলেন। এর ফলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে আহত করে ২০ জন ফটো সাংবাদিককে।

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের দেড় বছরের মধ্যে ২৫ অকটোবর, ১৯৯৭ বাংলাদেশের সংবাদপত্র পরিষদের সভায় সরকার কর্তৃক ভিন্নমতাবলম্বী সংবাদপত্রসমূহের অস্তিত্ব ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের আশংকা করা হয়েছিল। তখন সাংবাদিক

---

১৫. ড. এমাজ উদ্দীন আহমদ, গণতন্ত্র ও আমদের সংবাদপত্র, বাংলাবাজার পত্রিকা ১৯৯৪ দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যা, ১৭ অগাস্ট ১৯৯৪, পৃঃ ২২২।

১৬. রিয়াজ উদ্দিন আহমদ, সংবাপত্রের স্বাধীনতা ও জনগণের আকাঙ্খা, দৈনিক দিনকাল, নবপর্যায়ে প্রকাশনার তৃতীয় বর্ষ পূর্তি সংখ্যা ১৯৯৪, ঢাকা, পৃঃ ১৭৪।



www.pathagar.com

নেতৃবৃন্দ সরকারকে সকল প্রকার ঐচ্ছিক অবহেলা দূরে ঠেলে সবাইকে এক দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ করেছিলেন। সরকারের পক্ষ থেকে এ বক্তব্যের জবাব ভিন্নভাবে দেয়া হয়েছিল।

মোটকথা ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালের আওয়ামী লীগ সরকার শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ক্ষমতায় এসেই সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদেরকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। ১৯৯৭ সালে তারা টাইমস বাংলা ট্রাস্ট ভূক্ত পত্রিকা দৈনিক বাংলা, বাংলাদেশ টাইমস, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, সাপ্তাহিক আনন্দ বিচিত্রা বন্ধ করে দেয়। তাতে বেকার হন কয়েকশ' সাংবাদিক ও কর্মচারী। এটা তারা করেছে এসব সংবাদপত্রে ভিন্নমতের সাংবাদিকদের সংখ্যাধিক্যের কারণে। আওয়ামী লীগ বারবার প্রমাণ করেছে তারা ভিন্ন মতের প্রতি সহনশীল নয়। ওই সময় নির্যাতন, হত্যার ঘটনা বেড়ে যায়, ১০ জন সাংবাদিক নিহত হন। তাদের মধ্যে '৯৬ সালের ১৯ জুন সাতক্ষীরার দৈনিক পত্রদূত পত্রিকার সম্পাদক স. ম. আলাউদ্দিন, ২৬ জুলাই ঝিনাইদহের রেজাউল করিম, '৯৮ সালের ১২ জুন চুয়াডাঙ্গার দিন বদলের কাগজ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার বজলুর রহমান, ৩০ অগাস্ট যশোরের সাইফুল আলম মুকুল, '৯৯ সালের ১৩ মার্চ খুলনার রফিকুল ইসলাম, ২০০০ সালের ১৫ জানুয়ারি ঝিনাইদহের ইলিয়াস হোসেনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ২০০০ সালের ১৬ জুলাই রাত আটটায় যশোরের দৈনিক জনকণ্ঠের বিশেষ প্রতিনিধি নির্ভিক সাংবাদিক শামছুর রহমানকে গুলি করে হত্যা করা হয়, '০১ সালের ২ মার্চ খুলনার হারুন নিহত হন। ওই আমলে নির্যাতনের শিকার হন শত শত সাংবাদিক, মামলা হয় কয়েকশ' সাংবাদিকের বিরুদ্ধে। আওয়ামী লীগের তখনকার ফেনীর সংসদ সদস্য (২৬৭ ফেনী-২) জয়নাল আবেদীন হাজারী, লক্ষীপুরের আবু তাহেরসহ আরও কয়েক সংসদ সদস্য প্রকাশ্যে সাংবাদিকদের শারীরিক নির্যাতন করেন।

মোট কথা ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় বসেই উদ্যোগ নেয় পত্রিকা বন্ধ করার। ১৯৯৭ সালের ৩০ অকটোবর ৫ শতাধিক সাংবাদিক ও সংবাদপত্র কর্মচারিকে পুলিশ লাঠিপেটা করে কর্মস্থল থেকে বের করে দিয়ে বন্ধ করে দেয় দৈনিক বাংলা, টাইমস ট্রাস্টের ৪ টি পত্রিকা। বেকারত্বের এক দুর্বিসহ জীবনে ঠেলে দেয়া হয় এ পত্রিকাগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক ও সংবাদপত্রসেবীদের। তাই ৩০ অকটোবর এ দেশের সাংবাদিক সমাজের জন্য এক বিভীষিকার দিন। এ নির্যাতনের স্মরণে ৩০ অক্টোবরকে সাংবাদিক নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। যতদিন বাংলাদেশে সাংবাদিকতা পেশা থাকবে ততদিন এদেশের সাংবাদিক সমাজ ১৯৯৬–২০০১ পর্যন্ত ৫ বছরের আওয়ামী শাসনের সাংবাদিক নির্যাতনের ভয়াবহতাকে স্মরণ করে এই ৩০শে অকটোবরকে পালন করবে সাংবাদিক নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস হিসেবে।



www.pathagar.com

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে) সভাপতি আবদুস শহীদ বলেন, 'আওয়ামী লীগ বারবারই প্রমাণ করেছে তারা ভিন্ন মতের প্রতি সহনশীল নয়। বর্তমানে ক্ষমতায় এসেও একই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছে এই দলটি। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সংবাদ সংস্থা বাসস এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে বেছে বেছে ভিন্ন মতের সাংবাদিকদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। সারা দেশে ব্যাপক হারে সাংবাদিক নির্যাতন চলছে। কী নেত্রী, কী এমপি, কী সরকার দলীয় নেতা-সাংবাদিকের কলম যার বিরুদ্ধে যায় তিনিই সাংবাদিকের ওপর চড়াও হন। আর এ মানসিকতাই লালন করে আওয়ামী লীগ।'[১৭]

১৯৯৮ সালের ১৮ মার্চ সরকার সুগন্ধা পত্রিকার সম্পাদক আলম রায়হানকে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়েছে। বিধি মোতাবেক সরকার প্রেস কাউন্সিলে মামলা দায়ের করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে সরকার তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করে তাকে জেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সরকারি সমর্থনপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা সাপ্তাহিক জনতার ডাক এবং এভিডেন্সে হামলা চালিয়ে অফিস ও কম্পিউটার কক্ষ তছনছ করে এবং আসবাবপত্র ও কম্পিউটার ভাংচুর করে। অধিকন্তু এ দুটি পত্রিকাকে হুমকি দেয়া হয় এবং তাদের সম্পাদকদ্বয়কে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে নানাভাবে হয়রানি করেছে। সরকার দৈনিক ইনকিলাবের লক্ষ্মীপুর সংবাদদাতা হোসেন আহমদ হেলাল এবং দিনকালের খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা শ্রী প্রফুল্ল কুমারকে বিনা অভিযোগে গ্রেফতার করে। সরকারি দলের কর্মীরা দিনকালের বরিশাল বুরো প্রধান হুমায়ুন কবিরকে মারধর করে।[১৮] দৈনিক রানার পত্রিকার সম্পাদক আর এম সাইফুল আলম মুকুলকে তার আপোষহীন সম্পাদকীয় নীতির কারণে পিতার মতই প্রাণ দিতে হলো। ৩০ অগাস্ট ১৯৯৮ যথারীতি পেশাগত দায়িত্বপালন শেষে রিক্সাযোগে তার যশোর শহরস্থ বাড়ী ফেরার পথে ঘাতকরা তাকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করে। এতে তিনি নিহত হন। কক্সবাজার থেকে প্রকাশিত সৈকত পত্রিকার সম্পাদক হাবিবুর রহমানের উপর দিবালোকে অতর্কিতে হামলা করে সরকারী ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র ক্যাডাররা। তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন।[১৯] ক্যাবল টিভি এটিভির মালিক, সাংবাদিক ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ১৩ জানুয়ারী ১৯৯৯ মামলা দায়ের করা হয়। এর আগে পুলিশ এটিভির চেয়ারম্যান আজিজ মোহাম্মদ ভাইকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে। একটি বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে একই অভিযোগে এটিভির মালিক থেকে

---

১৭. মাহাবুবুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭।

১৮. সংবাদপত্রের ওপর সরকারী হামলার নিন্দায় বিএফইউজে ও ডিইউজে, এভিডেন্স বিশেষ সংখ্যা, ১৩ জুলাই ২০০১, পৃঃ ৩৮।

১৯. এভিডেন্স বিশেষ সংখ্যা, ১৩ জুলাই ২০০১, পৃঃ ৫৬।



www.pathagar.com

কর্মচারী পর্যন্ত সবার বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে মামলা করা হয়েছিল। সম্ভবত বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম একটি প্রতিষ্ঠানের সবাইকে একই অভিযোগে মামলায় জড়িত করা হলো। এ ঘটনা শুধু তথ্যের স্বাধীনতাই নস্যাত করেনি, এটা মানবাধিকারেরও চরম লংঘন।[২০] ১৯৯৯ সালের ২৮ নভেম্বর সরকার এভিডেন্সের ডিক্লারেশন বাতিল ঘোষণা করে। এভিডেন্স সম্পাদক মনজুর কাদের ও প্রকাশক মিসেস মনজুর কাদেরের বিরুদ্ধে সরকার মামলা দায়ের করার উদ্যোগে নিলে হাইকোর্টে রীট করা হয়। হাইকোর্টে এভিডেন্স পুনরায় প্রকাশ করার নির্দেশ দেন এবং সরকারের আদেশ স্থগিত করে দেন। সরকারের নির্দেশে রাজউক এভিডেন্সর ধানমন্ডি অফিস বুলডেজার দিয়ে গুড়িয়ে দেয়। সরকারী দলের সন্ত্রাসীরা এভিডেন্সের উপদেষ্টা সম্পাদক সাদেক খানের জীপের গতিরোধ করে, তার উপর চড়াও হয় এবং যারা এভিডেন্সে কাজ করে তাদের বিরুদ্ধে হুমকি প্রদান করে। এভিডেন্সে কর্মরত সাংবাদিকদের জীবনের উপর হুমকি সৃষ্টি করা হয়। তাদের কেউ কেউ শারীরিকভাবে নির্যাতিত হওয়ার আশংকায় এভিডেন্স ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। পুলিশ সরকারপন্থী সন্ত্রাসীদের সহায়তায় ৩০ বার এভিডেন্স কার্যালয়ে হামলা চালায়।[২১] ২০০০ সালের ১৫ জানুয়ারি ঝিনাইদহের সাংবাদিক মীর ইলিয়াসকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ২০০০ সালের ১৬ জুলাই রাতে যশোরে দৈনিক জনকণ্ঠের বিশেষ প্রতিনিধি সাংবাদিক শামসুর রহমানকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ২০০০ সালের জানুয়ারি-জুন সময়কালে ৪২টি ঘটনায় ৬৮ জন সাংবাদিক নির্যাতিত হন। ১৭ জানুয়ারি ২০০০ বীরদর্পনের সম্পাদক নির্যাতনে মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় জনকণ্ঠের ৭, আজকের কাগজের ৭, প্রথম আলোর ৫, ইত্তেফাকের ৪, বাংলার বানীর ৪ এবং অন্যান্য পত্রিকার ৩১ জন সাংবাদিক নির্যাতিত হয়েছেন।[২২]

২০০১ সালের ১৮ এপ্রিল খুলনার দৈনিক অনির্বান পত্রিকার সংবাদদাতা এস.এম. নহর আলীকে সন্ত্রাসীরা বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে বেদম প্রহার করে। পরে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। একই পত্রিকার সাংবাদিক শুকুর হুসাইনকেও হত্যা করা হয়। আওয়ামী শাসনামলে নির্যাতিত বহুলালোচিত এক সাংবাদিকের নাম টিপু সুলতান। 'সন্ত্রাসের জনপদ' বলে অভিহিত সন্ত্রাসী বাহিনীর বর্বরোচিত হামলায় আহত হন ইউএনবির ফেনী জেলা প্রতিনিধি টিপু সুলতান। ২০০১ সালের ২৫ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৭টায় এ ঘটনা ঘটে। টিপু ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেও পঙ্গু হয়ে যান।[২৩]

---

২০. এভিডেন্স বিশেষ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭২-৭৩।
২১. এভিডেন্স বিশেষ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৭৪-৫৭৫।
২২. এভিডেন্স বিশেষ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৭৬।
২৩. মুহাম্মদ খায়রুল বাশার, আমরা আর কতো বেলালকে হারাবো, শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল


www.pathagar.com

## ২০০২-২০০৬ সময়কাল

২০০২ থেকে '০৬ সাল মেয়াদে বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে একুশে টিভি বন্ধ হয়। এ সময়ও সাংবাদিক নির্যাতন, হত্যা, মামলার ঘটনা ঘটে। ২০০২ সালে নিহত হন দৈনিক পূর্বাঞ্চলের সিনিয়র রিপোর্টার হারুন অর রশীদ। ২০০২ সালের ২৫ জুলাই পাবনার ঈশ্বরদীতে ভেজাল গুড়ের ছবির তোলায় ঈশ্বরদী বাজারের গুড় আড়তে ভেজাল গুড়ের আড়তদার ঈশ্বরদী উপজেলা যুবলীগের সহ-সভাপতি আবদুল হান্নান ও তার সহযোগীরা তিন সাংবাদিককে প্রথমে মারধর পরে রামদা, ছুরি দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করে। এই সাংবাদিকরা হচ্ছেন ঈশ্বরদী রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি ও সাপ্তাহিক সময়ের ইতিহাস পত্রিকার সম্পাদক শেখ মহসিন, নির্বাহী সম্পাদক মাহফুজুর রহমান শিপন, সাপ্তাহিক প্রথম সকালের যুগ্ম সম্পাদক জিল্লুর রহমান জীবন। এ সময়ে বাজারে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে ব্যবসায়ীরা আহত সাংবাদিকদের উদ্ধার করে ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।[২৪]
২০০৪ সালের ২৭ জুন খুলনা প্রেসক্লাবের সভাপতি, দৈনিক জন্মভূমির সম্পাদক হুমায়ুন কবির বালু নিহত হন। এর আগে নিহত হন সাংবাদিক মানিক সাহা। তাকে ১৫ জানুয়ারি প্রেসক্লাবের অদূরে বোমা হামলা চালিয়ে হত্যা করা হয়। সবচাইতে নির্মম হত্যাকান্ড হচ্ছে খুলনা মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ও দৈনিক সংগ্রামের খুলনা বুরো প্রধান শেখ বেলাল উদ্দীন (১৯৫৭-২০০৫) হত্যাকান্ড। ২০০৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধার পর খুলনা প্রেসক্লাব চত্বরে দুবৃত্তদের বোমা হামলায় শেখ বেলাল উদ্দিন মারাত্মকভাবে আহত হন। ১১ ফেব্রুয়ারি চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে তিনি শাহাদাতের অমিয় সুধাপান করেন।

## জরুরী অসাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল (১২ জানুয়ারী ২০০৭-২৯ জানুয়ারী ২০০৯)

১/১১ এর জরুরী অবস্থার মধ্য দিয়ে দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছিল। জরুরি অবস্থার অসাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারও গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করে। এ সরকার বেসরকারি সিএসবি নিউজ, ফাল্গুন মিউজিক চ্যানেল আর নিয়মিত-অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত আড়াইশ' পত্রিকার প্রকাশনা বাতিল করে। দুর্নীতিবিরোধী

---

উদ্দীন স্মারকগ্রন্থ, খুলনা সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০৫, পৃঃ ২৩৩।
২৪. ঈশ্বরদীতে ৩ সাংবাদিককে কোপাল যুবলীগ নেতা, ঈশ্বরদী উপজেলা সংবাদ দাতার রিপোর্ট, দৈনিক ইনকিলাব, ২৬ জুলাই ২০০০, পৃঃ ২।



www.pathagar.com

অভিযানের নামে মিডিয়ার মালিক, সম্পাদককে গ্রেফতার করে কৌশলে গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করে। তখন গোয়েন্দা সংস্থার হস্তক্ষেপ যেমন ডিজিএফআই, সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা, আইএসপিআর গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। অসাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পুরো শাসনকালেই সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়।

অধিকার-এর মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০০৮ এ মত প্রকাশের স্বাধীনতা শীর্ষক মানবাধিকার পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বলা হয়-

জানুয়ারি মাসে সব টিভি চ্যানেলে টক শো আয়োজন করা থেকে বিরত রাখতে নির্দেশ দেয় সরকার। এপ্রিলে দুজন সাংবাদিককে তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে বাধা দেয়া হলেও জুন মাস থেকে সব সাংবাদিককে তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। জুলাই মাসে জাহাঙ্গীর আলম আকাশ নামে এক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন এবং সাংবাদিক আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়। সেপ্টেম্বরে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের পার্টি রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত বৈঠক অনুষ্ঠান সাংবাদিকদের কভার করতে দেয়নি নির্বাচন কমিশন।[২৫]

## আওয়ামী মহাজোট সরকারের শাসনামল (৩০ জানুয়ারী ২০০৯-)

শেখ মুজিবুরের সরকার থেকে শুরু হওয়া সংবাদপত্র বন্ধ, সাংবাদিক নির্যাতন আওয়ামী লীগের '৯৬-০১ সালের সরকার হয়ে বর্তমান দিনবদলের সরকারের আমলে পেয়েছে নতুন মাত্রা। দুর্নীতি, অনিয়ম, সন্ত্রাসের খবর প্রকাশ করলেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, এমপি ও সরকারী দলের ক্যাডাররা ঝাঁপিয়ে পড়ে সাংবাদিকদের উপর। অথচ তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু জানিয়েছেন, বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে কোন সাংবাদিক নির্যাতিত হয়নি।[২৬] বিভিন্ন ঘটনায় ৮ জন সাংবাদিক খুন হওয়ার কথা অবশ্য তিনি স্বীকার করেছেন। তথ্যমন্ত্রীর মন্তব্য বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।[২৭]

বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে দেশ পরিচালনায় তারা সেই সময়কার একদলীয় বাকশালী নীতিমালা গ্রহণ না করলেও কার্যত দেশে নবরূপে বিরাজ করছে সেই বাকশালী ব্যবস্থা। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার নানা কৌশলে সংবাদপত্রের

২৫. অধিকার-এর মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০০৮, দৈনিক যায় যায় দিন, ৩ মার্চ ২০০৯, পৃঃ ১৩।
২৬. দৈনিক সমকাল, ২১ নবেম্বর, ২০১২, পৃ-৯।
২৭. এই সরকারের আমলে সাংবাদিক নির্যাতিত হয়নি! তথ্যমন্ত্রীর এ তথ্য কতটা সত্য? সম্পাদকীয়, দৈনিক আমার দেশ, ২১ নবেম্বর, ২০১২, পৃ-৬


www.pathagar.com

স্বাধীনতা হরণ করছে এবং সাংবাদিকদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর বেসরকারি টিভি চ্যানেল ওয়ান এবং পরীক্ষামূলকভাবে সম্প্রচাররত যমুনা টিভি বন্ধ করে দিয়েছে।

আর সত্য প্রকাশের অপরাধে অন্যকথা একটা দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশের কারণেই ২০১০ সালের ১ জুন এ সরকার বাকশালী কায়দায় দৈনিক আমার দেশ বন্ধ করে দেয়। প্রশাসন প্রত্রিকাটির প্রেসে জোরপূর্বক তালা লাগিয়ে দেয়। একই সঙ্গে বানোয়াট মামলাকে হাতিয়ার বানিয়ে পত্রিকা অফিসে অভিযান চালিয়ে শত শত পুলিশ পত্রিকার সম্পাদক প্রকৌশলী মাহমুদুর রহমানকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করে এবং তার ওপর চরম বর্বরোচিত নির্যাতন চালায়। দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশের জন্যই আমার দেশ সম্পাদকের বিরুদ্ধে ৭০ হাজার কোটি টাকার মানহানির অভিযোগ এনে পৃথকভাবে ২১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে দেশের বিভিন্ন আদালতে। তাঁকে প্রাণনাশের হুমকিও দেয়া হয়েছে। হামলা চালানো হয়েছে পত্রিকাটির বিশেষ প্রতিনিধির ওপর। এ ঘটনা দেশি এবং বিদেশি গণমাধ্যমে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। প্রায় এক মাস বন্ধ থাকার পর আইনি লড়াইয়ে বিজয়ী হয়ে দৈনিক আমার দেশ পুনঃপ্রকাশিত হয়। অন্যদিকে প্রায় ১০ মাস কারাভোগের পর মুক্ত হন সম্পাদক মাহমুদুর রহমান। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী কটূক্তি করেছেন প্রবীন সাংবাদিক আতাউস সামাদের বিরুদ্ধে (১৯৩৭-২০১২)।[২৮]

অতি সম্প্রতি আমার দেশ পত্রিকাটির চারশ'রও বেশি সাংবাদিকের জামিন বাতিল করে রিমান্ডে নেয়ার অপচেষ্টা বিশ্ববাসী জেনে গেছে। অবশ্য এভাবে নির্যাতিতদের সাংবাদিক মনে না করলে বলার কিছু থাকে না।[২৯]

সম্পাদককে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়ে নির্মম নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এখনও চলছে নির্যাতন, গ্রেফতার, হত্যা, হুমকি, সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেল বন্ধের ঘটনা। সংসদে সংবাদপত্র, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করছেন মন্ত্রী, সংসদ সদস্যরা। ২০১০ সালের ২১ সেপ্টেম্বর সংসদে দুই মন্ত্রী, পাঁচ সংসদ সদস্য মিলে শীর্ষস্থানীয় তিন সম্পাদকের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন। এর আগে দেশে এমনটি ঘটেনি।

বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে গত প্রায় চার বছরে জাতীয় পত্রিকার তিনজন সম্পাদকসহ সহস্রাধিক সাংবাদিক সরকার ও দলীয় নেতাকর্মীদের হাতে নির্যাতন,

---

২৮. বাংলাদেশের সাংবাদিকতা ভূবনের উজ্জ্বল নক্ষত্র, প্রবীণ সাংবাদিক, আতাউস সামাদ ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১২ মৃত্যুবরণ করেন।

২৯. সম্পাদকীয়, দৈনিক আমার দেশ, পূর্বোক্ত, পৃ-৬।



www.pathagar.com

হয়রানির শিকার হন। আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের ওপর কয়েক দফায় সরাসরি হামলা হয়। হুমকি দেয়া হয় 'নিউএজ' সম্পাদক নুরুল কবীর, 'আমাদের সময়' সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খানকে। প্রধানমন্ত্রীর এক উপদেষ্টা একজন সম্পাদককে 'চাইলেই গ্রেফতার করতে পারেন' বলে হুঙ্কার দেন। '৯০ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ সংবাদপত্র সংক্রান্ত দু'টি কালো আইন বাতিল করলে একক ক্ষমতাবলে সংবাদপত্র বন্ধ করার ক্ষমতা রহিত হয়। ২০১০ সালের ১ জুন আমার দেশ-এর প্রকাশনা বাতিল, সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতারের ঘটনার পর বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ওই কালো আইনে সরকার এখনও গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করছে।

হাসান শান্তনু লিখেছেন, 'গণমাধ্যম এখন মহাজোট সরকারের টার্গেটে পরিণত। সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা প্রতিনিয়ত সাংবাদিকদের হুমকি-ধমকি দিচ্ছেন। পুলিশ বাহিনীর উপর্যুপরি হামলা এবং সরকারি দলের ক্যাডার ও প্রভাবশালীদের হাতে সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বর্তমান সরকারের ৪৭ মাসের শাসনকালে ১৭ জন সাংবাদিক খুন, আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমানসহ তিনজন সম্পাদককে গ্রেফতারের পর রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে। সরকারি দলের সন্ত্রাসী ও পুলিশের হামলায় সহস্রাধিক সাংবাদিক আহত হওয়া, শতাধিক সাংবাদিকের কারাভোগের ঘটনা সাংবাদিক নির্যাতনের ভয়াবহতাকেই ফুটিয়ে তোলে। এছাড়া হত্যা ও নির্যাতনের হুমকি দেয়া হয়েছে আরও কয়েকশ' সাংবাদিককে।

দৈনিক আমার দেশ বন্ধ, জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল ওয়ান বন্ধ, যমুনা টিভিকে সম্প্রচারে আসতে না দেয়া, অনলাইন পত্রিকা শীর্ষনিউজ ও সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ বন্ধ করে দেয়ার ন্যাক্কারজনক নজিরও সৃষ্টি করেছে বর্তমান সরকার।

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের সাম্প্রতিক রিপোর্ট, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস, রিপোর্টার্স সানফ্রন্টিয়ার্সসহ সাংবাদিকদের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রতিবেদনেও বাংলাদেশে সাংবাদিক খুন, নির্যাতন, হামলা, মামলার ভয়াবহতার বিষয় তুলে ধরে এর প্রতিকার চাওয়া হয়েছে। বহির্বিশ্বে এসব ঘটনায় মারাত্মক প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি।

২০১০ সালের ১ জুন মিথ্যা অজুহাতে আমার দেশ-এর প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়েই সরকার ক্ষান্ত হয়নি, সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে ১৪ দিন রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে। তাকে কারাগারে রেখে নিগৃহীত করেছে ১০ মাস। ২০১১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর দৈনিক সংগ্রাম-এর প্রবীণ সম্পাদক প্রখ্যাত গবেষক, লেখক আবুল



www.pathagar.com

আসাদকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কোন মামলা ছাড়াই রাত চারটার সময় বিপুলসংখ্যক র‍্যাব এসে বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। ৬ দিনের রিমান্ডও মঞ্জুর করে আদালত। চারদিন হাজতবাস করে আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে মুক্ত হন সর্বগ্রহণযোগ্য এই প্রবীণ সাংবাদিক। সরকারের দুর্নীতির খবর প্রচার করায় অনলাইন পত্রিকা শীর্ষনিউজ ও শীর্ষ কাগজের সম্পাদক একরামুল হককে সাজানো চাঁদাবাজির মামলায় ২০১১ সালের ৩১ জুলাই ভোর সোয়া চারটায় রাজধানীর বড় মগবাজারের বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। দফায় দফায় রিমান্ডে নিয়ে নিপীড়ন এবং তার পত্রিকা দুটি বন্ধ করতে বাধ্য করা হয়েছে।'[৩০] ১ নবেম্বর জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর তাঁকে জেলগেট থেকে আবার গেফতার করে রিমান্ডে নেয়া হয়। পরে ২৫ নবেম্বর তিনি জামিনে ছাড়া পান। এছাড়া ২০১০ সালের ১৪ জুলাই হাইকোর্টে সাপ্তাহিক সোনার বাংলার সম্পাদক কামারুজ্জামান ও একই বছর ১৯ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করা হয় সাপ্তাহিক সোনার বাংলার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ও আমার দেশ পাবলিকেশনন্স লিমিটেডের পরিচালক অধ্যাপক তাসনীম আলমকে।

বর্তমান সরকারের আমলে চলতি বছরের (২০১২ সালের) কেবল মে মাসেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় সাংবাদিক নির্যাতনের ১২টি ঘটনা ঘটেছে। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে প্রথম আলোর তিন ফটো সাংবাদিক পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে পুলিশের বেধড়ক লাঠিপেটার শিকার হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। মহাখালীতে নিজ অফিসে বার্তা সংস্থা বিডি নিউজের ১০ সংবাদকর্মীকে কুপিয়ে জখম করে সন্ত্রাসীরা। এতে তিনজন গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। পুরান ঢাকার আদালতপাড়ায় পুলিশ ক্লাবে এক তরুণীর শ্লীলতাহানির খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে তিন সাংবাদিক পুলিশের রোষ ও পিটুনির শিকার হন।

বছরের আলোচিত সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনী হত্যাকান্ডের বিচার দাবিতে সাড়ে ৮ মাস থেকে সাংবাদিকরা রাজপথে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করে চলেছেন, কিন্তু কোনো বিচার তারা পাননি। এমনকি ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে গ্রেফতারও করতে পারেনি পুলিশ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন সাংবাদিকদের ওপর আর নির্যাতন না হওয়ার আশ্বাস প্রদানের পর তার অফিস ঘেরাওয়ের কর্মসূচি এক মাস পেছালেও বাস্তবে পরিস্থিতির দিন দিন অবনতিই ঘটছে। সর্বশেষ স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকু সাংবাদিকদের পুলিশ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

---

৩০. হাসান শান্তনু, আওয়ামী সরকারের তিন আমলে বন্ধ পাঁচশ পত্রিকা, দৈনিক আমার দেশ, ১৬ জুন ২০১২, পৃঃ ৭।



www.pathagar.com

দেশীয় বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার' এর এক জরিপে বলা হয়েছে, ২০১২ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত কেবল ৪ মাসে সারা দেশে সাংবাদিক খুন হয়েছেন দু'জন, আহত ৪৬ জন, প্রহৃত ২৩ জন, হামলার শিকার ৪ জন এবং হুমকির শিকার হয়েছেন ৩৬ জন। সব মিলিয়ে হত্যাসহ নানাভাবে মৃত্যু ও ভোগান্তির শিকার হয়েছেন এ বছরের প্রথম চার মাসে ১১৭ জন সাংবাদিক। বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার জরিপ মতে, চলতি বছরের প্রথম চার মাসে দেশে ২ জন সাংবাদিক খুন এবং ১০ জন আহত হয়েছেন। গত বছর খুন হয়েছেন ৪ জন। একই সময়কালে আহত হয়েছেন ৫৫ জন। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের জরিপ মতে, চলতি বছরের প্রথম চার মাসে সারা দেশে সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ১২৬টি। সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী মহাজোট সরকারের শাসনামলে সাংবাদিক দলনে নজিরবিহীন মানবাধিকার লংঘন হয়েছে। গত ৪৭ মাসে ৬৭ সাংবাদিক খুন, আহত ৫ শ', হুমকির সম্মুখীন ৪ শ', লাঞ্ছিত অগণিত।[৩১]

## মহাজোট সরকারের শাসনামলে সাংবাদিক খুনের তালিকা

| ক্র. নং | সাংবাদিকের নাম | পদবী | ঘনটার দিন তারিখ | হত্যাকাণ্ডের স্থান |
|---|---|---|---|---|
| ১ | আতিকুল ইসলাম আতিক | এনটিভির ভিডিও এডিটর | ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ | মগবাজার, ঢাকা |
| ২ | নূরুল ইসলাম ওরফে রানা | ঢাকার পাক্ষিক মুক্ত মনের স্টাফ রিপোর্টার | জুলাই ২০০৯ | ডেমরা, ঢাকা |
| ৩ | এম এম আহসান হাবিব বারী | ঢাকার সাপ্তাহিক সাম্প্রতিক সময়ের নির্বাহী সম্পাদক | অগাস্ট ২০০৯ | গাজীপুর |
| ৪ | আবুল হাসান আসিফ | রূপগঞ্জের দৈনিক ইনকিলাব সংবাদদাতা ও রূপগঞ্জ প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি | ডিসেম্বর ২০০৯ | রূপগঞ্জ |
| ৫ | ফতেহ ওসমানী | সাপ্তাহিক ২০০০-এর সিলেট প্রতিনিধি | ২৮ এপ্রিল ২০১০ | সিলেট |
| ৬ | শফিকুল ইসলাম টুটুল | এটিএন বাংলার সিনিয়র ক্যামেরাম্যান | ৯ মে ২০১০ | ঢাকা |
| ৭ | মনির হোসেন রাঢ়ী | বরিশালের মুলাদী প্রেস ক্লাব সভাপতি | ২৩ ডিসেম্বর ২০১০ | বরিশাল |

৩১. খালিদ সাইফুল্লাহ, নজিরবিহীন মানবাধিকার লংঘন ॥ বিপর্যস্ত বাংলাদেশ-৫; দৈনিক সংগ্রাম, ২৯ ডিসেম্বর ২০১২, পৃ-১-২।



www.pathagar.com

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৮ | ফরহাদ খাঁ (৬০) ও তাঁর স্ত্রী রহিমা খাতুন (৫৫) | দৈনিক জনতার সহ সম্পাদক, প্রবীণ সাংবাদিক | ২৮ জানুয়ারী ২০১১ | নয়াপল্টন, ঢাকা |
| ৯ | মাহবুব টুটুল | দৈনিক আজকের প্রত্যাশা, সাপ্তাহিক সংবাদ চিত্র ও আজকের সূর্যোদয় পত্রিকার সাংবাদিক | ৭ এপ্রিল ২০১১ | পোষ্ট কলোনী, চট্টগ্রাম |
| ১০ | আলতাফ হোসেন[৩২] | সাপ্তাহিক বজ্রকণ্ঠের সাংবাদিক | ৭ এপ্রিল ২০১১ | উত্তরা, ঢাকা |
| ১১ | ফরিদুল ইসলাম | দৈনিক ভোরের ডাক এর গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা প্রতিনিধি | ৭ ডিসেম্বর ২০১১ | কুকরাইল, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা |
| ১২ | গোলম মোস্তফা সরোয়ার সাগর (সাগর সরোয়ার) | মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক | ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১২ | পশ্চিম রাজাবাজার,ঢাকা |
| ১৩ | মেহেরুন রুনি[৩৩] | এটিএন বাংলার সিনিয়র রিপোর্টার | ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১২ | পশ্চিম রাজাবাজার,ঢাকা |
| ১৪ | জামাল উদ্দিন (৩৫)[৩৪] | যশোর থেকে প্রকাশিত দৈনিক গ্রামের কাগজ এর শার্শা প্রতিনিধি | ১৬ জুন ২০১২ | শার্শা উপজেলার কাশিপুর, যশোর |
| ১৫ | জুনায়েদ আহমদ জুনাইদ | দৈনিক বিবিয়ানার স্টাফ রিপোর্টার, তরুণ সাংবাদিক | ১০ জুলাই ২০১২ | শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ |
| ১৬ | বিভাস দাস | দি ইন্ডিপেন্ডেন্টের রিপোর্টার | | ঢাকা |
| ১৭ | শহীদুজ্জামান টিটু | ফটো সাংবাদিক | | ঢাকা |
| ১৮ | তালহাত আহমদ | সাংবাদিক | ২৩ অকটোবর | নরসিংদী |

আলাউদ্দিন আরিফ লিখেছেন, 'সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার জন্য ক্রমেই ভয়ঙ্কর জনপদ হয়ে উঠছে বাংলাদেশ। পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে হামলা মামলার পাশাপাশি খুন, নির্যাতন ও লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছেন সাংবাদিকরা। বর্তমান মহাজোট সরকারের সাড়ে ৩ বছরে ১৬ জন সাংবাদিক খুন হয়েছেন। এদের মধ্যে চলতি বছরের প্রথম ৭ মাসেই খুন হয়েছেন সাংবাদিক দম্পত্তি সাগর-রুনিসহ ৪ জন। এছাড়া

---

৩২. উত্তরার ৪ নম্বর সেক্টরের ১১ নম্বর সড়কের ১০ নম্বর বাসায় খুন হন সাংবাদিক আলতাফ হোসেন। হত্যার ১১ দিন আগ থেকে নিখোঁজ ছিলেন সাংবাদিক আলতাফ।

৩৩. নিজ বাসায় খুন হন সাংবাদিক দম্পত্তি সাগর-রুনি। হাত-পা বেঁধে শরীরের বিভিন্ন অংশে ছুরিকাঘাত করে এই দম্পতিকে হত্যা করা হয়। শুধু সাংবাদিক সমাজ নয়, সারা দেশের মানুষকে বিচলিত করে এ নির্মম হত্যাকাণ্ড। এ ঘটনায় দেশব্যাপী ঝড় উঠেছে।

৩৪. দৈনিক সংগ্রাম, ২৯ ডিসেম্বর ২০১২, পৃ-১-২।



www.pathagar.com

২০০৯ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর খুন হয়েছেন চারজন করে সাংবাদিক। ডজনে ডজনে মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে সাংবাদিকদের। দৈনিক আমার দেশ এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের ঘাড়েই ঝুলছে ৫৫টি মামলার খড়্গ। ডজন ডজন হামলা মামলার শিকার আমার দেশ-এর সাংবাদিকরাও। এছাড়া দেশের সব জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিক, অনলাইন পত্রিকা ও স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিকরাও হামলা মামলা ও নির্যাতনের শিকার।

দৈনিক আমার দেশ-এর নিজস্ব অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ২০০৯ সালের ৩০ জানুয়ারি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সাড়ে ৩ বছর শাসনকালে ১৬ জন সাংবাদিক নিহত, কমপক্ষে ৪৬০ জন সাংবাদিক আহত, ২২৫ জন লাঞ্ছিত ও ১৪২ জন হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন। এ সময় পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে ৯০ জন সাংবাদিকের ওপর হামলা করা হয়েছে। ৩ জন সম্পাদক ও একজন বার্তা প্রযোজককে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। অপহরণের শিকার হয়েছে কমপক্ষে ৫ জন সাংবাদিক। শত শত সাংবাদিকের বিরুদ্ধে থানায়, আদালতে মানহানি কিংবা ফৌজদারি মামলা দেয়া হয়েছে। এমনকি নারী নির্যাতন ও মাদকদ্রব্যের সাজানো মামলাও দেয়া হয়েছে বহু সাংবাদিকের বিরুদ্ধে। অব্যাহত হুমকি, হামলা-মামলার শিকার হয়ে ঢাকাসহ দেশের জেলা উপজেলার সাংবাদিকরা চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তি, আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ কর্মী থেকে শুরু করে সাংবাদিকরা সরাসরি হুমকির শিকার হয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকেও। এমনকি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্টার্নি চিকিৎসকরাও একজোট হয়ে সাংবাদিকদের ওপর ন্যাক্কারজনক হামলা চালিয়েছে।'[৩৫]

**২০০৯ সালে ৪ সাংবাদিক খুন :** ২০০৯ সালে নিহত হয়েছেন ৪ জন। ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় এনটিভির ভিডিও এডিটর আতিকুল ইসলাম আতিক, জুলাই মাসে ঢাকার পাক্ষিক মুক্তমন-এর স্টাফ রিপোর্টার নুরুল ইসলাম ওরফে রানা, অগাস্ট মাসে গাজীপুরে ঢাকার সাপ্তাহিক সাম্প্রতিক সময়-এর নির্বাহী সম্পাদক এম এম আহসান হাবিব বারী, ডিসেম্বরে রূপগঞ্জে দৈনিক ইনকিলাব সংবাদদাতা ও রূপগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি আবুল হাসান আসিফ খুন হন।

আসিফ হত্যাকাণ্ডের রহস্য উন্মোচন হয়েছে দাবি করে পুলিশ বলেছে, ছিনতাইকারীরা মোটরসাইকেল ছিনিয়ে নেয়ার জন্য তাকে খুন করেছে। এছাড়া সাংবাদিক আবুল হাসান আসিফ খুনের বিষয়ে পুলিশের বক্তব্য হচ্ছে- খুন নয়, তিনি সড়ক দুর্ঘটনার

৩৫. আলাউদ্দিন আরিফ, মহাজোট সরকারের সাড়ে তিন বছরে ১৬ সাংবাদিক খুন, দৈনিক আমার দেশ, ৮ অগাস্ট ২০১২, পৃ-১-১৩।



www.pathagar.com

শিকার হয়েছেন। এছাড়া ঢাকার ডেমরায় সাংবাদিক নুরুল ইসলাম ওরফে রানা ও গাজীপুরে আহসান হাবিব বারী হত্যাকাণ্ডের রহস্য উন্মোচন করতে পারেনি পুলিশ।

২০০৯ সালের ১২ এপ্রিল দুপুরে ময়মনসিংহ-এর গফরগাঁওয়ের আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি ক্যাপটেন (অব) গিয়াস উদ্দিন আহামদ (১৫৫ ময়মনসিংহ-১০) সমকালের গফরগাঁও প্রতিনিধি আবদুল্লাহ আল আমীন বিপ্লবকে ধমক দিয়ে বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে লেখেন কেন? আমার বিরুদ্ধে পাঁচ বছর পত্রিকায় কিছু লেখা যাবে না। আর লিখলে আমি ছাড়ব না।' ওই সংসদ সদস্য কথা রেখেছেন। সমকাল প্রতিনিধিকে শনিবার সন্ধ্যাতেই কয়েজন সন্ত্রাসী এলোপাতাড়ি কুপিয়ে আহত করে। এ জঘন্য অপরাধের সঙ্গ যুক্তরা সংসদ সদস্যের লোক বলে স্থানীয় জনসাধারণের ধারণা। রোববার দুপুরে সমকালের গফরগাঁও প্রতিনিধির অস্ত্রোপচার হয়েছে ময়মনসিংহ হাসপাতালে। এ ন্যক্কারজনক ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ হয়েছে সর্বত্র। তবে আলোচিত ওই সংসদ সদস্য দাবি করেছেন, তিনি ধমক দেননি। বরং সমকাল প্রতিনিধি 'মোটরসাইকেলে বসে তার সঙ্গে কথা বলে বেয়াদবি করেছেন।' সংসদ সদস্য 'তার বিরুদ্ধে লিখলে কাউকে ছাড়ব না বলে' দ্রুত তা রক্ষা করে কথা রেখেছেন।[৩৬]

২০০৯ সালে ৭১ জন সাংবাদিক আহত, ৩৬ জন লাঞ্ছিত, ৬৮ জন হুমকির শিকারসহ ২২৯ জন সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।[৩৭]

**২০১০ সালে ৪ সাংবাদিক খুন :** ওই বছর ৪ সাংবাদিক খুন হয়েছেন। তাদের মধ্যে ওই বছরের ৯ মে গুপ্তহত্যার শিকার হন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এটিএন বাংলার সিনিয়র ক্যামেরাম্যান শফিকুল ইসলাম টুটুল। যদিও পরবর্তীতে পুলিশ জানিয়েছে তিনি ছিনতাইকারীদের হাতে খুন হয়েছেন। পুলিশ ছিনতাইকারীদের গ্রেফতার করেছে। ২০১০ সালের ২৮ এপ্রিল খুন হন বিশিষ্ট সাংবাদিক ফতেহ ওসমানী। সাপ্তাহিক ২০০০-এর সিলেট প্রতিনিধি ফতেহ ওসমানীকে ওই বছর ১৮ এপ্রিল কুড়াল ও রামদা দিয়ে কুপিয়ে আহত করার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকায় তার মৃত্যু হয়। ফতেহ ওসমানী হত্যাকাণ্ডে পুলিশ ৬ জনকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট দিয়েছে। ওই মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন।

২০১০ সালের ২৩ ডিসেম্বর প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হন বারিশালের মুলাদী প্রেস ক্লাব সভাপতি মনির হোসেন রাঢ়ী। তাকে পুর্বপরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাসীরা খুন করেছিল। ওই হত্যা মামলার তদন্তেও তেমন কোনো সফলতা দেখাতে পারেনি পুলিশ।

---

৩৬. গফরগাঁওয়ে সাংবাদিক নির্যাতন-জনপ্রতিনিধি যখন বিপজ্জনক (সম্পাদকীয়), দৈনিক সমকাল, ১৩ এপ্রিল ২০০৯, পৃঃ ৪।

৩৭. মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দৈনিক যায়যায়দিন, ২২ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃঃ ৯।



www.pathagar.com

**২০১১ সালে ৪ সাংবাদিক খুন :** ২০১১ সালে ৪ সাংবাদিক খুন হয়েছেন। ওই বছরের ২৮ জানুয়ারি ৭৭, নয়াপল্টনের বাসায় খুন হন প্রবীণ সাংবাদিক ও দৈনিক জনতার সহ-সম্পাদক ফরহাদ খাঁ ও তার স্ত্রী রহিমা খাঁ। ফরহাদ খাঁর হত্যাকারীদের পুলিশ গ্রেফতার করেছেন। মহানগর দায়রা জজ আদালতে গ্রেফতারকৃতদের বিচার চলছে।

গত ৭ ডিসেম্বর গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার কুকরাইল এলাকায় গলাকেটে ও কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল দৈনিক ভোরের ডাক-এর গোবিন্দগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি ফরিদুল ইসলাম রঞ্জুকে। এ মামলাটির কোনো কিনারা করতে পারেনি পুলিশ।

গত ৭ এপ্রিল ঢাকার উত্তরা ও চট্টগ্রামের পোর্ট কলোনিতে খুন হয়েছেন ২ সাংবাদিক। পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যমতে, ৭ এপ্রিল চট্টগ্রামের পোর্ট কলোনি এলাকায় দৈনিক আজকের প্রত্যাশা, সাপ্তাহিক সংবাদচিত্র ও আজকের সূর্যোদয় পত্রিকার সাংবাদিক মাহবুব টুটুলকে হত্যা করা হয়েছে। একইদিন উত্তরার ৪ নম্বর সেক্টরের ১১ নম্বর সড়কের ১০ নম্বর বাসার বাসিন্দা সাপ্তাহিক বজ্রকণ্ঠ'র সাংবাদিক আলতাফ হোসেনের লাশ উদ্ধার করা হয়। এর ১১ দিন আগ থেকে নিখোঁজ ছিলেন সাংবাদিক আলতাফ। আলতাফ সুইডেন প্রবাসী ছিলেন। হত্যাকাণ্ডের এক মাস পর র‍্যাব বাড়ির দারোয়ান সাজুকে গ্রেফতার করে বলেছে- সাজুই হত্যা করেছে আলতাফকে। এর আগে পুলিশ বলেছিল, বাড়ি নিয়ে বিরোধের জের হিসেবে খুন হয়েছেন আলতাফ। সাংবাদিক মাহবুব টুটুল হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে আজও কোনো কূলকিনারা করতে পারেনি পুলিশ। প্রখ্যাত সাংবাদিক আতাউস সামাদ বলেছেন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান RSF (Reporters Sans Frontiers) এর বিবেচনায় ২০১১ সালে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা কমেছে।[৩৮]

**২০১২ সালে ৪ সাংবাদিক খুন :** চলতি বছর খুন হয়েছেন ৪ সাংবাদিক। এরা হলেন গত ১১ ফেব্রুয়ারি নিজ ফ্ল্যাটে খুন হওয়া বহুল আলোচিত সাংবাদিক দম্পতি মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক সাগর সারোয়ার ও এটিএন বাংলার সিনিয়র সাংবাদিক মেহেরুন রুনি হত্যাকাণ্ড। গত ১৬ জুন যশোরের শার্শা উপজেলায় দৈনিক গ্রামের কাগজের শার্শা প্রতিনিধি জামাল উদ্দিন হত্যাকাণ্ড ও গত ১০ জুলাই হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জে দৈনিক বিবিয়ানার স্টাফ রিপোর্টার জুনায়েদ আহমদ জুনেদ হত্যাকাণ্ড।

বহুল আলোচিত সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ড আজও রহস্যাবৃত। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর নৃশংস

---

৩৮. আতাউস সামাদ, কালোদিবসে সম্পাদক ও সাংবাদিক নেতাদের ভাবনা, দৈনিক আমার দেশ, ১৬ জুন ২০১২, পৃঃ ৭।



www.pathagar.com

এ হত্যাকাণ্ডের ৮ মাস অতিক্রম করবে। কিন্তু খুনিদের আজও শনাক্ত করতে পারেনি তদন্ত সংস্থাগুলো। সাংবাদিকরা রাজপথে আন্দোলন করছেন, বক্তৃতা বিবৃতি দিচ্ছেন। প্রথমে পুলিশ, পরে ডিবি পুলিশের তদন্ত শেষে এখন মামলাটি তদন্ত করছে র‍্যাব। র‍্যাবের তদন্তের চার মাসে পড়েছে। সাগর-রুনির লাশ পুনরায় কবর থেকে তুলে ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। কিন্তু রহস্যের কোনো কিনারা হয়নি। এ হত্যাকাণ্ড ঘিরে জনমনে তৈরি হচ্ছে নানা প্রশ্ন। পত্রপত্রিকা, টেলিভিশন, সামাজিক যোগাযোগের সাইট ও ব্লগগুলোতে এই হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে নানা তথ্য আসছে। কিন্তু আজও দেশের মানুষ জানতে পারেনি কারা নিজেদের বেডরুমে খুন করেছে ওই সাংবাদিক দম্পতিকে।

সাংবাদিক খুনের আরেকটি নৃশংস ঘটনা ঘটেছে যশোরে। গত ১৫ জুন যশোর থেকে প্রকাশিত দৈনিক গ্রামের কাগজ এর শার্শা উপজেলার কাশিপুর প্রতিনিধি জামাল উদ্দিনকে চোরাচালানিদের বিরুদ্ধে সংবাদ লেখায় দুর্বৃত্তরা প্রথমে হুমকি, পরে কাশিপুর বাজার থেকে অপহরণ করে কুপিয়ে জখম করে, চোখ তুলে নেয় এবং পায়ের রগ কেটে দেয়। স্থানীয়রা গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়।

সংবেদনশীল এ মামলাটি নিয়েও টালবাহানা করছে পুলিশ। মামলার অগ্রগতি বলতে র‍্যাব রাজু নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে। ভারতে একজন গ্রেফতার হয়েছে বলে জানা গেছে। এর বাইরে তেমন কোনো অগ্রগতি নেই। গ্রামের কাগজ সম্পাদক মবিনুল ইসলাম মবিন আমার দেশকে বলেন, পুলিশ বলছে আসামিরা দেশের বাইরে পালিয়ে গেছে। অথচ তাদের কাছে থাকা তথ্যমতে জামালের ঘাতকরা দেশেই আছে। জামালকে যে পুলিশ ক্যাম্পের পাশে খুন করা হয়েছে, ওই ক্যাম্প ইনচার্জ অনেক কিছু জানেন। কিন্তু রহস্যজনক কারণে পুলিশ আসামিদের ধরছে না বরং পুলিশ হত্যাকাণ্ডের মূল ইন্ধনদাতাদের শেল্টার দিচ্ছে। তিনি আরও জানান, শুধু সংবাদ প্রকাশই নয়, জামাল উদ্দিন মাদকবিরোধী অনেক ক্যাম্পেইন করেছেন, মাদক ব্যবসায় বাধা দিয়েছেন। এসব কারণে তিনি দুর্বৃত্তদের টার্গেটে পরিণত হয়েছেন।

গত ১০ জুলাই হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে সংবাদ প্রকাশের জের ধরে দৈনিক বিবিয়ানার স্টাফ রিপোর্টার তরুণ সাংবাদিক জুনাইদ আহমদ জুনেদকে পরিকল্পিতভাবে নৃশংসভাবে হত্যা করে টুকরো টুকরো লাশ শায়েস্তাগঞ্জ রেলস্টেশনে ফেলে দেয়া হয়েছে। প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল তিনি ট্রেন দুঘটনায় মারা গেছেন। কিন্তু পরে জুনেদের ২০ টাকুরো লাশ উদ্ধার করেছে জিআরপি থানা পুলিশ। কারা তাকে এরকম নৃশংসভাবে হত্যা করেছে- সে তথ্য আজও উন্মোচিত হয়নি।

২০১২ সালে গণমাধ্যমের পরিস্থিতির সার্বিক অবনিত হয়েছে। এ বছর জাতীয় সংসদ, বিচার বিভাগ ও সরকারের নির্বাহী বিভাগ বিভিন্ন সময়ে সংবাদপত্র ও সম্প্রচার



www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে ক্ষোভ ও বিরক্তি প্রকাশ করেছে। এ সময়ে সাংবাদিকদের প্রাণহানি, দৈহিক নির্যাতন ও উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। হত্যা করার হুমকি প্রদান করা হয়েছে বহু সাংবাদিককে।

সাংবাদিক দম্পতি সাগর ও রুনী তাদের নিজ বাড়িতে খুন হওয়ার রহস্য আজও উদঘাটিত হয়নি। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী পুলিশি তৎপরতার সময় সাংবাদিকদের পুলিশদের কাছ থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন, যাতে তারা পুলিশের লাঠির বাড়ি না খান। রাজধানী ঢাকার বাইরে প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো সাংবাদিক সন্ত্রাসী, ক্ষমতাসীন দলীয় রাজনৈতিক ব্যক্তি অথবা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে নিপীড়িত ও নিগৃহীত হচ্ছেন। একই সময়ে সরকারের অসহিষ্ণুতা এবং স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব দিনে দিনে প্রকট হয়ে উঠেছে।[৩৯]

হরতালসহ বিভিন্ন প্রোগ্রামে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময়ে সাংবাদিকদের নাজেহাল ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে। জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি কামাল উদ্দিন সবুজ বলেন, সত্যিকার গণতান্ত্রিক ধারায় দেশ চলছে বলে মনে হয় না। সাংবাদিকদের হত্যা করা হচ্ছে, হরতালে সাংবাদিকদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। এগুলো সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য হুমকিস্বরূপ।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি বলেন, সাংবাদিকরা সরকার পতনের আন্দোলন করে না। তবে মৌলিক অধিকারের জন্য, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য, সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদার জন্য, সাংবাদিকদের নিরাপত্তার জন্য সংগ্রাম করার সংঘবদ্ধ শক্তি নিয়ে জেগে উঠতে তারা বদ্ধপরিকর। আজকে সাধারণ মানুষ এবং সাংবাদিকদের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, গণতন্ত্রের জন্য আদালতগুলো, নির্বাচন কমিশন এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তর যদি নিজ নিজ স্বকীয় সত্তায় জাগরুক ও বলীয়ান না হয় তবে গণতন্ত্র, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মানবাধিকার আমাদের জন্য সোনার হরিণ হয়ে থাকবে। স্বাধীনতার চেতনা হবে বিপন্ন।

ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার টকশোগুলোতে এক ধরনের অঘোষিত কালো তালিকা কার্যকর করা হয়েছে। এসবের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভয়ভীতি ছড়িয়ে স্বাধীন এবং বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা ব্যাহত করা। এই অবস্থা চলতে থাকলে দেশে গণতন্ত্র বিকশিত হবে না। স্বাধীন সাংবাদিকতা না থাকলে সাধারণ মানুষ তাদের অধিকার হারাবে। এই পথ ধরে সমাজে অশুভ শক্তি মাথাছাড়া দিয়ে উঠবে। সুতরাং কী রাজনীতিবিদ, কী পেশাজীবী- সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফ্যাসিবাদের এই বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন, সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণের পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, সাংবাদিক

৩৯. আতাউস সামাদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭।



www.pathagar.com

সংগঠনগুলো রাস্তা থেকে উঠতেই পারছে না। রাস্তাই যেন আমাদের ঠিকানা। এতে পেশাগত দায়িত্ব পালন ব্যাহত হচ্ছে। পুরো গণমাধ্যমে ভয়ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে। মুক্ত সাংবাদিকতা রুদ্ধ হয়ে আসছে। সাংবাদিকদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা নেই। নির্যাতনের একটি ঘটনারও প্রতিকার নেই। প্রথম আলোর তিন সাংবাদিককে পেটানোর সময় পুলিশ বলেছে, সাংবাদিক পেটালে কিছু হয় না। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও সাংবাদিক সংগঠনগুলো বাংলাদেশ সাংবাদিক নির্যাতনে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এরপরও সরকারের কোনো সচেতন পদক্ষেপ নেই। একটি ঘটনার পর আরেকটি ঘটনা চলছে। এসব ঘটনার তথ্যমন্ত্রীর আচরণে মনে হচ্ছে, তার যেন কোনো দায়িত্ব নেই। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা করা সম্ভব হচ্ছে না।[৪০]

গত ১৫ জুন ২০১২ ঢাকা বিমান বন্দরে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে পুলিশ কর্তৃক এনটিভির ক্যামেরাম্যান অর্জিত আইচ তাপসকে নির্যাতন করা হয়।[৪১] তিনি পুলিশের মারপিটের শিকার হন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সৌদী আরব যাওয়ার জন্য তার গাড়ি বিমান বন্দরের ভিআইপি গেট দিয়ে ঢোকার সময় দৃশ্য ধারণ করতে গেলে দু'তিন পুলিশ তাপসকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। এরপর তার বুকে, পিঠে, হাতে ও পায়ে সজোরে লাথি দিতে থাকে। এ সময় অন্য সাংবাদিকরা এগিয়ে এলে পুলিশরা চলে যায়।[৪২]

গত ২৮ অগাস্ট ২০১২, সোনালী ব্যাংক কেলেঙ্কারীর হোতা হলমার্ক গ্রুপের দুর্নীতিবাজ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সংবাদ সংগ্রহে সাভারের হেমায়েতপুরে তাদের কারখানায় গেলে বৈশাখী টেলিভিশনের দুই সাংবাদিক সিনিয়র রিপোর্টার দিপু সরোয়ার, ক্যামেরা ম্যান মিরন শাহ ও এক গাড়িচালককে লাঞ্ছিত করে হলমার্ক গ্রুপের সন্ত্রাসীবাহিনী। এ সময় তারা মোবাইল ফোন, ক্যামেরা ছিনতাই ও গাড়ি ভাংচুর করে। এ ঘটনায় হলমার্ক গ্রুপের এমডি তানভীর মাহমুদ ও জিএম শামীম আতিয়ারসহ জড়িতদের আসামী করে একটি মামলা দায়ের করা হলেও সাভার মডেল থানা পুলিশ এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি।[৪৩]

দৈনিক আমাদের অর্থনীতি পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খান কে ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১২ হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় শাহবাগ থানায় জিডি করা হয়েছে। এর আগে অগাস্ট মাসেও তাঁকে মোবাইলে হত্যার

৪০. মাহাবুবুর রহমান, কালোদিবসে সম্পাদক ও সাংবাদিক নেতাদের ভাবনা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭।

৪১. দেখুন দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৭ জুন ২০১২, পৃঃ ২।

৪২. দৈনিক সংগ্রাম, ১৬ জুন ২০১২, পৃঃ ১-৩।

৪৩. হলমার্কের এমডির গ্রেফতার দাবিতে সাভারে মানববন্ধন সমাবেশ, সময়কাল রিপোর্ট, দৈনিক সমকাল ১ সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ-৯।



www.pathagar.com

হুমকি দেয়া হয়েছিলো।[৪৪] গত ৫ নভেম্বর, ২০১২ সোনাগাজী প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, দৈনিক ফেনী'র সময়ের বিশেষ প্রতিনিধি এবং দৈনিক সংগ্রাম ও সাপ্তাহিক ফেনী বার্তার সোনাগাজী সংবাদদাতা মাহমুদুল হাসানকে কর্তব্যরত অবস্থায় গ্রেফতার করে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে জেল হাজতে পাঠানো হয়। ২২ ঘন্টা পর তিনি জামিনে মুক্তি পান।

ক্ষমতাসীন মহাজোট সরকারের পোনে চার বছরে ঢাকার বাইরে থেকে প্রকাশিত দু-শ' সংবাদ পত্রের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেছে। সরকারের গণমাধ্যম দলন, পত্রিকা পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা তথা বিজ্ঞাপন না পাওয়া আর্থিক সংকট আর কাগজের (নিউজপ্রিন্ট) দাম বাড়ায় এসব পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হওয়া পত্রিকার বেশিরভাগই ভিন্নমতের। সরকার দলীয় সংসদ সদস্য, সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তি, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়সহ বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতার অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায় গত ৪৭ মাসে অনেক পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেয় সরকার। প্রকাশনা বন্ধ করার আগে ক্ষমতাসীন দলের নেতা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অনেক পত্রিকার কার্যালয়ে ভাংচুর ও সাংবাদিকদের নির্যাতন করে। শাসক দলের নেতা-কর্মীদের টেন্ডারবাজী, চাঁদাবাজী, জমি দখল ইত্যাদি এসব অপতৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিবেদন প্রকাশ করে সরকারের রোষাণলের শিকার হয় এসব সংবাদপত্র।

আর এভাবেই বর্তমান সরকারের গত ৪৭টি মাসজুড়ে সাংবাদিকদের ওপর চলেছে হত্যা ও অকথ্য নির্যাতন। আর এর সাথে ক্ষমতাসীন এমপি-মন্ত্রী ও দলীয় ক্যাডারদের হুমকি এবং মামলার ঘটনা ঘটেছে আহরহ। এছাড়া সাংবাদিকদের কন্ঠরোধ করতে অনলাইন নীতিমালা ও বেসরকারী সম্প্রচার নীতিমালা বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে সরকার।

বেসরকারী মানবাধিকার সংস্থা অধিকারে রিপোর্ট অনুসারে, গত ৪৭ মাসে এক হাজার সাংবাদিক হত্যা, নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে পেশাগত কারণে হত্যার শিকার হয়েছেন ১২ জন সাংবাদিক। তবে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) তথ্য মতে সাংবাদিক হত্যার সংখ্যা ১৭ জন। যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও পুলিশি হামলার শিকার হয়েছেন ৫ শতাধিক। হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন ৪ শতাধিক সাংবাদিক। লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন অগণিত।

অধিকারের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ২০০৯ সালে ২৬৬ জন সাংবাদিক হত্যা,

৪৪. সাংবাদিক নাঈমুল ইসলামকে হত্যার হুমকি, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১২, পৃ-২।



www.pathagar.com

নির্যাতন, হুমকির শিকার হন। এর মধ্যে ৩ জনকে হত্যা, ৮৪ জনতে আহত, ৪৫ জনকে লাঞ্ছিত এবং ৭৩ জনকে হুমকি দেয়া হয়। তবে আইন ও সালিস কেন্দ্রের (আসক) রিপোর্ট থেকে জানা যায়, এ বছর ২৭০ জন হত্যা, নির্যাতনের শিকার হন। এর মধ্যে ৪ জন সাংবাদিককে হত্যা, ১৯ জনকে প্রাণনাশের হুমকি, ৮৪ জনের নামে মামলা, ৭৯ জন সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্যাতন এবং ৪১ জন ছাত্রলীগ-যুবলীগ কর্তৃক হামলা, হুমকি ও নির্যাতনের শিকার হন।

অধিকারের রিপোর্ট অনুসারে ২০১০ সালে ২৩১ জন হত্যা, নির্যাতনের শিকার হয়। এর মধ্যে ৪ জনকে হত্যা, ১১৮ জনকে আহত, ৪৩ জনকে লাঞ্ছিত ও ৪৯ জন হুমকির শিকার হন।

২০১১ সালে ২৯১ জন হত্যা, নির্যাতনের শিকার হয়। এর মধ্যে ১৩৯ জন আহত, ৫৩ জন হুমকি, ৪৩ জন লাঞ্ছিত ও আক্রমণের শিকার হয়।

তবে আইন ও সালিস কেন্দ্রের (আসক) রিপোর্ট অনুসারে ২০১১ সালে সারা দেশে ৩০৪ জন সাংবাদিকের ওপর নির্যাতন করা হয়।

২০১২ সালের নবেম্বর পর্যন্ত ২৭১ জন সাংবাদিক হত্যা, নির্যাতনের শিকার হয়। এর মধ্যে ৫ জনকে হত্যা, ১৫৬ জনকে আহত, ৬১ জন হুমকির সম্মুখীন ও ৪৯ জন বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন।

ঘটনার বিশ্লেষণে দেখা যায়, মফস্বলের সাংবাদিকরাই বেশি নির্যাতন, হামলা, মামলা ও হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। গত ৪৭ মাসে মফস্বলে সাংবাদিকদের নির্যাতন, লাঞ্ছিত ও আহত হওয়ার শত শত ঘটনা ঘটে। পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে শতাধিক সাংবাদিকের ওপর হামলা হয়। প্রায় ৪ বছরে হত্যাকাণ্ডের শিকার ১৭ সাংবাদিকের মধ্যে ১১ জন মফস্বলের। এ পর্যন্ত হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে ২০৭ সাংবাদিককে। সরকার দলীয় সংসদ সদস্য, সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তি, আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা এসব নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত। সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে গণমাধ্যমকে বারবার হুমকি দেয়া হচ্ছে। অনিরাপদ হওয়ায় মফস্বলের সাংবাদিকরা এতে বেশি শঙ্কিত। হামলাকারীরা গ্রেফতার না হওয়ায় নিরাপত্তার অভাবে আতঙ্কে আছেন আহত সাংবাদিকরা। তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করছেন। প্রশাসন তাদের পাশে দাঁড়ানো বদলে সরকার দলীয় লোকের পক্ষ নিচ্ছে প্রকাশ্যে। এ পর্যন্ত পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছেন মফস্বলের ৩৭০ সাংবাদিক। মফস্বল সাংবাদিকতা এখন চরম ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।[৪৫]

---

৪৫. দৈনিক সংগ্রাম, ২৯ ডিসেম্বর, ২০১২, পৃ-২।



www.pathagar.com

## উপসংহার ও সুপারিশমালা

দেশের প্রতিটি দুর্যোগ মুহূর্তে সাংবাদিকদের সাহসী ভূমিকার কথা সবারই জানা। তাদের অপরাধ অকুতোভয় সত্য লেখা। বাংলাদেশের সাংবাদিকরা সকল যুলুম ও স্বৈরাচারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বর্তমানে দলমত নির্বিশেষে যেভাবে সাংবাদিকরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন তাতে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ছাড়া কেউই পেশাগত স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবেন না, এটা জোর দিয়েই বলা যায়। ক্ষুদ্র স্বার্থের কারণে যারা এখনও মুখ ফিরিয়ে আছেন বর্তমান পরিস্থিতি উপলব্ধি করে তারা শুধু পেশাগত স্বার্থেই নয়, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষার স্বার্থে এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমানে যারা সাংবাদিকদের কলমের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে চায় সেই গণতন্ত্র বিরোধী অপশক্তিকে রুখতে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের বিকল্প নেই- এটি কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না।

**এ বিষয়ে সুপারিশ সমূহ নিম্নরূপ ঃ**

১। তথ্য অধিকার আইন করার পরও তার বাস্তবায়ন আটকে রেখে বাস্তবে কলমের স্বাধীনতাকেই অস্বীকার করা হচ্ছে। তাই এ আইনের বাস্তবায়ন করতে হবে।

২। অবিলম্বে সব গণমাধ্যমে সপ্তম ওয়েজবোর্ড বাস্তবায়ন ও মফস্বল সাংবাদিকদের নিয়মিত বেতন কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তিকরণ, টিভি চ্যানেলের জন্য পৃথক বেতন কাঠামো, সংবাদপত্রকে শিল্প হিসেবে মর্যাদাদান ও শ্রম আইন সংশোধন করে সাংবাদিকদের আইনগত মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩। সাংবাদিকদের ওপর হামলা, মামলা, হুমকি ও নির্যাতন বন্ধ, নির্যাতনকারীদের গ্রেফতার এবং বিচার করতে হবে। এটি দেশবাসী দেখতে চায় যে, নির্যাতিত সাংবাদিকরা সুবিচার পেয়েছেন এবং নিপীড়করা দৃষ্টান্তমূলক সাজা পেয়েছেন।

৪। অন্যান্য পেশাজীবী নেতৃবৃন্দকে কলম-সৈনিকদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

৫। সকল সাংবাদিক হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত করে খুনীদের গ্রেফতার ও দ্রুত বিচার করতে হবে। তদন্ত ও বিচারের নামে কোন প্রহসন দেশবাসী দেখতে চায় না।

৬। বাংলাদেশে গণমাধ্যমের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সংবাদপত্রের অতীত সঙ্কটের ইতিহাস এক মুহূর্তের জন্যও ভুললে চলবে না। এদেশের গণমাধ্যমের সব কর্মীর মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য থাকতে হবে।

৭। সাংবাদিকদের সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতা এবং বিশ্লেষণের মান সম্পর্কে নিরাপদ থাকা অতি জরুরী। এ বিষয়ে যেন ঘাটতি দেখা না দেয় তা খেয়াল রাখতে হবে।



www.pathagar.com

৮। দেশের ব্যাপক গণমানুষকে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সংবাদ মাধ্যমকে ভয়ভীতি থেকে রক্ষা করার বিষয়ে অধিকতর উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এটি আশার কথা যে সাংবাদিকরা যে এখন দেশের সবচেয়ে বিপদাপন্ন পেশাজীবী সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছেন, তা এখন দেশের বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ বোঝেন। বাংলাদেশে সাংবাদিক নির্যাতনের ব্যাপকতা, নির্মমতা ও বীভৎসতা সম্পর্কে সবাইকে অবশ্যই আরও সজাগ ও সচেতন হতে হবে।

৯। জনগণের জন্য জোর সুপারিশ হচ্ছে সাংবাদিকদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করতে হবে, তাদের দাবীগুলো সমর্থন করতে হবে। কারণ, সাংবাদিকরা জনগণের স্বার্থেই কাজ করেন। খুবই ভালো হয় কোনখানে সাংবাদিকদের ওপর নির্যাতন হলে সঙ্গ সঙ্গে যেন সারাদেশে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের গর্জন ওঠে।

১০। সাংবাদিক নেতাদের জন্য সুপারিশ হচ্ছে তারা যেন সংবাদপত্র ও সাংবাদিক দলন-নির্যাতনের বিষয়গুলো কমনওয়েলথ প্রেস এসোসিয়েশন, প্রেস ফাউন্ডেশন এশিয়া, নিউইয়র্কের কমিটি টু প্রটেক্ট জর্নালিস্টস ও প্যারিসের রিপোর্টার্স স্যানস ফ্রন্টিয়ার্সের মতো আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংগঠন এবং জাতিসংঘের ইউনেস্কোকেও নির্যাতনের কথা নিয়মিত জানিয়ে রাখেন।

১২। সাংবাদিকদের সাথে কথায় ও কাজে মর্যাদা সম্পন্ন ব্যবহার করতে হবে।

জনগণের পূর্ণ অধিকার রয়েছে তথ্য জানার। সে অধিকার, এই বাংলাদেশে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে নিশ্চিত করে গণমাধ্যম কর্মীরা। গণমাধ্যম কোন বিচ্ছিন্ন সমাজ নয়। গণমাধ্যম এরপরও বাংলাদেশে এমন কিছু অর্জন করেছে যা অন্য অনেক সেক্টরে অর্জিত হয়নি। শুধু সাংবাদিক বা গণমাধ্যমই নয়, দেশের সকল মানুষ এবং প্রতিষ্ঠানের উচিৎ সবকিছুর ঊর্ধ্বে জাতীয় ও আদর্শিক স্বার্থকে স্থান দেয়া। এক্ষেত্রে কোন আপোষ নয়।

---

**লেখক-পরিচিতি :** ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। লেখক, প্রাবন্ধিক ও এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

**লেখা পরিচিতি :** প্রবন্ধটি ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার আয়োজিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসাবে পঠিত হয়।



www.pathagar.com

# বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ : জন্ম, বিকাশ ও পরিণতি

শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির

**শুরুর কথা**

উদারবাদ বা লিবারালিজম কখন কবে প্রথম উচ্চারিত হয়েছে, দানা বেধেছে কিংবা কে বা কারা এর মূল প্রবক্তা এ নিয়ে বিস্তর মতভেদ, বিশ্লেষণ ও পুস্তকাদি রয়েছে। কিন্তু উদারবাদের বা লিবারালিজমের অনুজ মতবাদ যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। তেমনি উদারবাদের গর্ভেই যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের জন্ম এবং এর বিকাশ তা নিয়েও কোনো মতভেদ নেই। আমেরিকা ও ইউরোপে সপ্তদশ শতাব্দীতে [১৭৭৬] উদারবাদ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে [১৮৪৬] ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ জন্ম ও বিকাশ লাভ করেছে। তবে তৎকালীন সময়ে আমেরিকা ও ইউরোপে ইসলাম একটি অপরিচিত চেতনা। তথায় ধর্ম বলতে যাজকতন্ত্র; রাজনীতি বলতে রাজতন্ত্র বা সমান্ততন্ত্র; অর্থনীতি বলতে ধনী-দরিদ্রের অমোচনীয় ব্যবধান এবং সামাজিক অধিকার বলতে দাসপ্রথার নামে মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ এবং দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারের অধিকারকেই বুঝাতো। এমনি এক ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমেরিকা ও ইউরোপে উদারবাদ বা লিবারালিজমের এবং তৎপরবর্তী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উদ্ভব ঘটেছে।



www.pathagar.com

উদারবাদ বা লিবারালিজম সমাজের গুরুত্বপূর্ণ চারটি মৌলিক ক্ষেত্রে ব্যাপক দৃষ্টিভংগিগত পরিবর্তন এনেছে; প্রভাব বিস্তার করেছে ঃ

প্রথমত ঃ খ্রীস্ট ধর্মের তথা চার্চের এখতিয়ার বিষয়ক।

দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক বিষয়ক।

তৃতীয়তঃ রাজনৈতিক বিষয়ক।

চতুর্থত ঃ সামাজিক অধিকার বিষয়ক।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে উদারবাদের প্রধান দৃষ্টিভংগিগত পরিবর্তন হলো রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে চার্চের [ইসলামের নয়] প্রভাবমুক্ত রাখা। আর অর্থনীতিতে অবাধ নীতি [Laissez Faire]-এর বিকাশ ও সংরক্ষণনীতির মূলোচ্ছেদে উদারবাদের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। ১৭৭৬ সালে প্রকাশিত এ্যাডাম স্মিথ লিখিত, "দি ওয়েলথ অব নেশনস বা জাতিসমূহের সম্পদ" গ্রন্থ অর্থনীতিতে উদারবাদের বিকাশের মূলভিত্তিরূপে অবদান রেখেছে। রাজনীতিতে উদারবাদের ফলে প্রধান প্রধান দৃষ্টিভংগিগত পরিবর্তন হলো নিম্নরূপঃ

০১. রাষ্ট্রীয় সংগঠনে চার্চের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা।

০২. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সূচনা ও বিকাশ ঘটানো।

০৩. সংসদীয় ধারার সরকার গঠন।

০৪. লিখিত সংবিধানের সূচনা।

০৫. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ও মহিলাদের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি ও নিয়মিতভাবে নির্বাচন নিশ্চিত করা।

সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে উদারবাদের প্রভাব ছিল নিম্নরূপ ঃ

০১. রক্ত, বংশভিত্তিক আভিজাত্য, বর্ণ ও নারী-পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদ ও বৈষম্যের অবসান বা সমানাধিকারের সূত্রপাত।

০২. দাস ও বর্ণ প্রথার অবসান।

০৩. কর্তৃত্ববাদী পিতামাতার নিয়ন্ত্রণ থেকে শিশুদের মুক্তি।

০৪. অত্যাচারী স্বামীর কবল থেকে স্ত্রীর মুক্তি।

ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের উক্ত প্রেক্ষাপটে অষ্টাদশ শতকে জন্ম নেয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। যেখানে রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে চার্চের [ইসলামের নয়] প্রভাবমুক্ত রাখা মূল প্রেরণা হিসেবে বিবেচিত। এরই ধারাবাহিকতায় মুসলিম দেশগুলোতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অনুসরণের ক্ষেত্রে চার্চের স্থলে না বুঝেই ইসলামকে বাদ দেয়ার বা রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে ইসলামের প্রভাবমুক্ত রাখার প্রেরণা গৃহীত হয়েছে এবং বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের জন্ম ও বিকাশ আমেরিকা ও ইউরোপের চেয়ে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ গ্রহণে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মেধা ও বিবেচনাবোধের পরিবর্তে পার্শ্ববর্তী দেশসহ বৈশ্বিক রাজনৈতিক প্রভাব এবং অন্ধ



www.pathagar.com

অনুকরণের মোহের প্রভাব ছিল অনস্বীকার্য। বিষয়টি নিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সে যাই হোক, উদারবাদের ধারাবাহিকতায় জন্মলাভ করা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এখন একটি প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক আদর্শ, একটি রাজনৈতিক বিশ্বাস। যার মূল কথা হলো "The belief that religion should not be involved in the organization of society, education etc. [১] – সমাজ [এর যে কোনো] সংগঠন, শিক্ষা ইত্যাদিতে ধর্মের সংশ্লিষ্টতা থাকা উচিত নয়-এমন বিশ্বাসের নাম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।" যিনি এই বিশ্বাসের ধারক তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী। আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী বা আস্থা স্থাপনকারী মানুষকে যেমন বলা হয় মুসলিম, তেমনি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী বা আস্থা স্থাপনকারী মানুষকে বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী। সাচ্চাভাবে যিনি বা যারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ওপর ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তিনি বা তাদের পক্ষে একই সাথে আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী বা আস্থা স্থাপনকারী মুসলিম হওয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলের অন্যতম কর্মকর্তার মুখে এ কথারই প্রতিফলন হয়েছে। তিনি বলেছেন, "আমি মুসলিম নই বা হিন্দুও নই।" অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বিশ্বাস ধারণ করে তিনি আর মুসলিম নন একথার সহজ স্বীকৃতি দিয়েছেন। সংগতভাবে এ কথার আরো একটি অর্থ দাঁড়ায়। তা হলো যেহেতু ধর্ম মাত্রই স্রষ্টার ধারণা [প্রকৃত বা বিকৃত যাই হোক] আছে; তাই একজন সাচ্চা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, স্রষ্টাতে বিশ্বাসী নন। তিনি হন স্রষ্টায় অবিশ্বাসী বা নাস্তিক। যুক্তির নিরিখে আদর্শ হিসেবে বা বিশ্বাস হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা ইসলাম; কোন্‌টি শ্রেষ্ঠতম কিংবা প্রায়োগিক দিক থেকে কোন্‌টি মানব সভ্যতায় সর্বোচ্চ মানবিক কল্যাণময় নিদর্শন স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে কিংবা ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ঘুচাতে সফল হয়েছে বা মানুষের মৃত্যু পরবর্তী জীবনের দিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম হয়েছে - আলোচ্য প্রবন্ধে তা আলোচনার অবকাশ নেই। বৃটিশ বুদ্ধিজীবি জর্জ জ্যাকব হোলিয়াক-এর বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা-চেতনার ফসল, ইংল্যান্ডে জন্মলাভকারী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা স্রষ্টায় অবিশ্বাসী এ মতবাদ, বাংলাদেশে কিভাবে জন্মলাভ করলো বা অনুপ্রবেশ করলো এবং বিকাশ লাভ করলো বা করছে এবং এর সম্ভাব্য পরিণতি কী হতে পারে তার একটি নির্মোহ এবং বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

## হাজার বছরের বাঙালি, বাংলাভাষা ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের জন্ম, বিকাশ ও পরিণতি নিয়ে আলোচনার শুরুতে বাংলাদেশ, বাংলাভাষা ও বাঙালি বিষয়ে ঐতিহাসিকভাবে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশেষ করে হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতির বিষয়টি অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশে

---

১. Oxford Advanced Learners Dictionary.



www.pathagar.com

বর্তমানে বহুল প্রচলিত একটি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মিথ হচ্ছে 'হাজার বছরের' বাঙালি সংস্কৃতি ইত্যাদি। ফলে বিষয়টির বস্তুনিষ্ঠতা যাচাইয়ে জনাব গোলাম মুরশিদ বিরচিত 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি' হতে প্রয়োজনীয় অংশের উদ্বৃতি উপস্থাপন করা হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায় বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাস হাজার বছরের চেয়ে কম মনে করাই সঙ্গত। অর্থাৎ বাংলাদেশে হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি মিথ কার্যতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। লেখকের ভাষায় ঃ

"... আমাদের দেখা দরকার, বাঙালি সংস্কৃতি যে অঞ্চলের, সেই অঞ্চল কখন থেকে বাংলা নামে পরিচিত হলো। অবশ্য গোড়াতে আরও একটা কথা বলা দরকার - বাঙালি সংস্কৃতি কোনো অখণ্ড অথবা অভিন্ন সংস্কৃতি নয়। এ সমাজ যেমন বহু ভাগে বিভক্ত, এ সংস্কৃতিও তেমনি বহু রঙে রাঙানো। রাজনৈতিক সীমানা দিয়ে চিহ্নিত করলে এই সমাজকে এখন প্রায় সমান দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ধর্মের কথা তুললেও তা দ্বিধাবিভক্ত - প্রধানত হিন্দু আর মুসলিম সমাজ। .... সে জন্যে বলতে হয়, বাঙালি সংস্কৃতি হিন্দু, মুসলমান, উচ্চবর্ণের হিন্দু, নিম্নবর্ণের হিন্দু, বৈষ্ণব, শাক্ত, বাউল, আশরাফ, আতরাফ, বৌদ্ধ, খৃস্টান - সবার সংস্কৃতি। সে কারণে এ সংস্কৃতির অবয়ব আদৌ সাদামাটা অথবা একমাত্রিক নয়।

.....রবীন্দ্রনাথের মতে, 'বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, রাঢ় বরেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয়; অন্তরের ভাগও ছিলো তার সঙ্গে জড়িয়ে, সমাজের মিলও ছিলো না। তবু এর মধ্যে এক ঐক্যের ধারা চলে এসেছে সে ভাষার ঐক্য নিয়ে। আমাদের যে বাঙালি বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে, আমরা বাংলা বলে থাকি।' অর্থাৎ বাঙালি সংস্কৃতিতে যেসব অভিন্ন উপাদান রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বাংলা ভাষা। সমাজের ভিন্নতা সত্ত্বেও বাংলা ভাষা সব বাঙালির ভাষা এবং সে কারণে যখন থেকে বাংলা ভাষার উন্মেষ, তখন থেকে বাঙালি সংস্কৃতির সূচনা। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, বাংলা ভাষার জন্মের আগে এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠির যে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রচলিত ছিলো, তাকে আমরা অস্বীকার করছি। বস্তুত অস্বীকার করে নয়, বরং সেই বাংলা-পূর্ব ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে সত্যিকার বাঙালি সংস্কৃতি।

এ ছাড়া আরও একটা মাত্রা আছে এই সংস্কৃতির - তার স্থানিক পরিচয়। যে অঞ্চলের লোকেরা বাংলায় কথা বলে বাঙালি সংস্কৃতি সে অঞ্চলের। যখন থেকে বাংলা ভাষা এবং বাঙ্গালা নামে একটি অঞ্চলের জন্ম হলো তখন থেকে এই সংস্কৃতির সূচনা ধরতে হবে। কিন্তু বাংলা ভাষার জন্ম হলো কখন? কখন বাঙ্গালা নামে একটি দেশ গড়ে উঠলো? সে দেশের লোকেরা বাঙালি নামে পরিচিত হলেন কখন?

জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ কোনো কোনো লেখক সাম্প্রতিক কালে বাঙালি



www.pathagar.com

সংস্কৃতিকে খুব পুরোনো, এমনকি পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো বলে দাবি করেছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় বাঙালি সংস্কৃতি আদৌ অতো পুরোনো নয়। কারণ, বাংলা ভাষা দূরে থাক, তার জননীরও তখন জন্ম হয়নি। সত্যি বলতে কি, বাংলা ভাষার বয়স এক হাজার বছর হয়েছে কিনা, তাতেও সন্দেহ আছে। সন্দেহ আছে বলছি এ জন্যে যে, একদিনে - এমনকি এক শতাব্দীতে - একটা ভাষা তার বৈশিষ্ট্য অর্জন করে না। এ কথা মেনে নিলে নীহাররঞ্জন রায় যাকে বাঙ্গালীর ইতিহাস বলেছেন, তাকে বাঙালির ইতিহাস অথবা বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাস বলা সঙ্গত নয়। কারণ, তিনি যখনকার ইতিহাস লিখেছেন, তখনও এই অঞ্চলের ভাষা তার বৈশিষ্ট্য লাভ করে রীতিমতো বাংলা হয়ে ওঠেনি। এমন কি, এই এলাকাও তখন এক অখণ্ড বঙ্গভূমিতে পরিণত হয়নি। তখনও বঙ্গদেশ বিভক্ত ছিলো গৌড়, বরেন্দ্রী, রাঢ়, সমতট, সুহ্ম, বঙ্গ ইত্যাদি নানা ভাগে। বস্তুত এই ছোট ছোট অঞ্চল মিলে একটি অখণ্ড বঙ্গভূমি পাল-বর্মণ-সেন রাজাদের সময়ে গড়ে ওঠেনি। সুতরাং সেই যুগে যাঁরা বাস করতেন তাঁদেরও বাঙালি বলার কোনো যুক্তি নেই। তবে এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, বাংলা-পূর্ব সেই পুরোনোকালের লোকেদের যে সাংস্কৃতিক এবং নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্য ছিলো, তা ধুয়ে-মুছে সেখানে নতুন সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। বরং সেই পুরোনো সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে বিভিন্ন নতুন উপাদানে গড়ে উঠেছে বাঙালি সংস্কৃতির এমারত। তাই দেখতে পাই, সেই প্রাচীন কালে যে -আদিবাসীরা এ অঞ্চলে বাস করতেন, তাঁদের রক্ত এখনো আমাদের ধমনীতে প্রবহমান। প্রথমে রাঢ় এবং তারপর বরেন্দ্রীতে আর্যরা এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন খৃস্টের জন্মেরও আগে। কিন্তু তারও আগে এ অঞ্চলে কেবল অস্ট্রিক শ্রেণীর লোকেরা বাস করতেন না। দ্রাবিড়রা বাস করতেন, ভোট-চীনারাও বাস করতেন। এই ভিন্ন ভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির লোকেদের রক্তের এবং ভাষার প্রভূত মিশ্রণ হয়েছিলো। তার সঙ্গে মিশেছে আর্যদের রক্ত। আরও পরে মিশেছে সেমিটিক রক্ত। কেন্দ্রীয় এশিয়ার রক্ত। ইউরোপীয় রক্তও যে একেবারে মিশেনি, তা নয়। আজকের বাঙালির দেহে যেমন এই বিচিত্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির জীনই বহমান, তেমনি আজকের বাংলা ভাষাতেও সকল জনগোষ্ঠির ভাষার উপাদানই বর্তমান। ........যে ভাষার ওপর ভিত্তি করে বাঙালি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, সেই বাংলা ভাষা কখন জন্ম লাভ করে এখানে তা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরোনো যে নমুনা পাওয়া গেছে চর্যাপদে, সেই চর্যাপদের বয়স পুরো এক হাজার বছর হয়েছে কিনা, তা নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। নেপালের রাজ-দরবার থেকে চর্যাপদ উদ্ধার করে এনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিশ শতকের গোড়ায় তাকে



www.pathagar.com

এক হাজার বছরের পুরোনো বাংলার নমুনা বলে দাবি করছিলেন। কিন্তু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সুকুমার সেনের মতো ভাষাতাত্ত্বিকরা চর্যাপদকে অতোটা পুরোনো বলে মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা প্রাকৃত ভাষা থেকে অপভ্রংশ এবং অপভ্রংশ থেকে আঞ্চলিক ভাষা উন্মেষের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে চর্যাপদগুলোকে দশ থেকে দ্বাদশ শতকের রচনা বলে দাবি করেছেন। অপর পক্ষে, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রধানত চর্যাপদে উল্লেখিত ব্যক্তি অথবা তথ্য থেকে চর্যাপদ সপ্তম/অষ্টম শতক থেকে লেখা হয়েছে বলে দাবি করেছেন। সমগ্র উত্তর এবং পূর্ব ভারতে নব্যভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনের কালানুক্রম তাঁর এই বিবেচনায় অতোটা প্রাধান্য পায়নি।

শহীদুল্লাহ এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের রচনার সময়টাকে একটু পিছিয়ে দিলেও, তাঁরা এটা স্বীকার করেছেন যে, চর্যাপদের ভাষাকে ঠিক বাংলা ভাষা বলা যায় না। পরের আলোচনায় দেখতে পাবো, তার মধ্যে বাংলা ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা দিলেও, তখনও তার অনেক কিছুই ওড়িয়া-অহমিয়ার সঙ্গে অভিন্ন ছিলো। তার মানে, চর্যাপদেরও পরে বাংলা ভাষার উদ্ভব। চর্যার বয়স এক হাজার বছর হয়ে থাকলে, বাংলা ভাষার বয়স এখনো এক হাজার বছর হয়নি। সুতরাং বাংলা ভাষাকে বাঙালি সংস্কৃতির সবচেয়ে অভিন্ন উপাদান বলে গণ্য করলে, বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাসকে এক হাজার বছরের চেয়ে কম বয়সী বলে মনে করাই সঙ্গত।" [২]

"যে বিস্তীর্ণ এলাকাকে বঙ্গদেশ বলা হয়, সেই এলাকা সাত-আটশো বছর আগেও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত ছিলো। চোদ্দো শতকের দ্বিতীয় ভাগে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ এই বিভক্ত অঞ্চলগুলোকে একই শাসনের অধীনে একত্রিত করেন। তার আগ পর্যন্ত এই অঞ্চল একটি অখণ্ড এলাকা বা দেশ হিসেবে পরিচিত হয়নি। তখন এই অঞ্চলে ছিলো ছোটো ছোটো কয়েকটি দেশ। ... এগুলোর মধ্যে গৌড়, বরেন্দ্রী এবং বঙ্গ শব্দ তিনটিই সবচেয়ে পুরোনো। এবং সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত বলে মনে হয়। কিন্তু কতটা পুরোনো? ..... সেন আমলের শেষে, তেরো শতকের গোড়ায়, তুর্কীরা যখন এ দেশ জয় করেন, তখনও এ দেশ বঙ্গদেশ নামে পরিচিত ছিলো না। তাঁরা যে অঞ্চল জয় করেছিলেন, তাঁর নাম ছিলো গৌড়, বঙ্গ নয়। তার রাজধানী ছিলো লক্ষ্মণসেনের নাম অনুসারে লক্ষ্মণাবতী। বখতিয়ার খিলজি যে মুদ্রা প্রবর্তন করেছিলেন, তাতে সংস্কৃতে লিখেছিলেন "গৌড় বিজয়"। আর প্রথম যুগের মুসলমান ঐতিহাসিকরাও বাঙ্গালা বলে কোনো এলাকার উল্লেখ করেননি। .... পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে এবং ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে রাজত্ব করতেন মধ্যযুগের সবচেয়ে বিখ্যাত সুলতান, আলাউদ্দীন হোসেন শাহ।

২. গোলাম মুরশিদ, হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০, পৃ. ১৪-১৮।



www.pathagar.com

একাধিক বাঙালি কবি তাঁর প্রশস্তি গেয়েছেন। মিথিলার কবি বিদ্যাপতির একটি পদেও তাঁর গুণকীর্তণ আছে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হলো: এই কবিদের কেউই তাঁকে তখনও বঙ্গের সুলতান বলেননি, বলেছেন গৌড়ের রাজা বা সুলতান। ....সরকারীভাবে মোগল যুগে - ষোড়শ শতকের শেষ দিকে - এই পুরো এলাকার নাম হলো সুবাহ বাঙ্গালাহ্। সমসাময়িক ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরাও এর নাম লিখেছেন বেঙ্গল। সরকারী নাম সুবাহ বাঙ্গালাহ হলেও, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই লিখিত বাংলায় বৃহত্তর বঙ্গদেশ অর্থে 'বাঙ্গালা' শব্দের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, তার আগে নয়।"[৩]

"অষ্টাদশ শতকের সবচেয়ে বড় কবি ভারতচন্দ্র রায়ই প্রথমে বৃহত্তর বঙ্গকে বার বার বাঙ্গালা নামে চিহ্নিত করেছেন এবং তার চেয়েও যা গুরুত্বপূর্ণ - সেই বাঙ্গালার অধিবাসীদের পরিষ্কার বাঙ্গালি বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনিও বাঙ্গালা দেশের ভাষাকে বাংলা ভাষা বলে কোথাও উল্লেখ করেননি। তাঁর বাঙালির সংজ্ঞা সে জন্যে দেশ-নির্ভর, ভাষাভিত্তিক নয়। ভারতচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই মনোয়েল দা আস্সুম্পসাঁও যে বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ রচনা করেছিলেন, তাতে বাংলাকে বেঙ্গালা [Bengalla] বলেছেন। এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয় ১৭৪৩ সালে, লিসবন শহর থেকে। ভারতচন্দ্র মারা যাওয়ার সতেরো-আঠারো বছর পরে ন্যাথনিয়েল হ্যালহেড যখন তাঁর বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশ করেন, তখন তিনি এ ভাষাকে বলেছেন বেঙ্গল ল্যাংগুয়েজ [Bengal Language]। হ্যালহেডের ব্যাকরণ প্রকাশের ছ' বছর পরে যখন জোনাথান ডানকানের অনূদিত কোম্পানীর আইনের বই প্রকাশিত হয়, তখনও "বাঙ্গালা" ভাষা কথাটার অনুবাদ করে ইংরেজিতে বেঙ্গল ল্যাংগুয়েজই বলা হয়েছে। ১৭৮৭ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে জর্জ মেয়ার, জর্জ ফ্রেডারিক চেরী, নীল এডমনস্টোন এবং হেনরি পিটস ফরস্টারের অনূদিত আইনের বইগুলোতে ইংরেজিতে বাংলা ভাষাকে কোথাও বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ, কোথাও বেঙ্গলি বলা হয়েছে, কিন্তু বাংলায় বলা হয়েছে বাঙ্গালা। ১৭৯০-এর দশকে হেনরি পিটস ফরস্টার সর্বত্র অঞ্চল বুঝাতে 'বাঙ্গালা' লিখেছেন। তিনি "বাঙ্গালাদেশ"-ও লিখেছেন। ....... ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর আগে সত্যিকার বাংলাভাষা বিকাশ লাভ করেনি। চতুর্দশ শতাব্দীর আগে অখণ্ড বঙ্গদেশও গড়ে ওঠেনি। আর এ অঞ্চলের লোকেরা বাঙ্গালি বলে পরিচিত হননি আঠারো শতকের আগে। সুতরাং তেরো-চৌদ্দ শতকের আগেকার সংস্কৃতিকে বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি হিসেবে বিবেচনা করতে পারি, কিন্তু তা সত্যিকার অর্থে বাঙালি সংস্কৃতি নয়।" [৪]

৩. গোলাম মুরশিদ, হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-২১।
৪. গোলাম মুরশিদ, হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬।



www.pathagar.com

## ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ

'ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদটি মানব রচিত। একজন বৃটিশ বুদ্ধিজীবি জর্জ জ্যাকব হোলিয়্যাক[৫] (Holyoake) প্রথম একে হাজির করেন ১৮৪৬ সালে। জর্জ হোলিয়্যাক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের তিনটি অত্যাবশ্যকীয় নীতির কথা উল্লেখ করেন ঃ[৬]

a) The improvement of this life by material means.
b) That science is the available Providence (the care and kindness of God or fate) of man.
c) That it is good to do good. Whether there be other good or not the good of the present life is good and it is good to seek that good. (English Secularism, 35)

নীতি তিনটির বক্তব্য দাঁড়ায় এরকম ঃ

ক) মানব জীবনের সব উন্নয়ন [আত্মিক উন্নতিও!] বস্তুনির্ভর।
খ) বিজ্ঞান মানুষের তাকদীর বা ভাগ্য নির্ধারিক বা ভালমন্দের নিয়ামক। [অন্যকথায় বিজ্ঞানই জীবন-মৃত্যুর মালিক।]
গ) ভালো কাজ করা ভালো । অন্য কোথাও ভালো থাকুক বা না থাকুক, বর্তমানে জীবনের যা ভালো তাই ভালো এবং এই ভালো অনুসন্ধানও ভালো। [কিন্তু এই ভালোকাজের সংজ্ঞা যেহেতু প্রমিতকরণ নয় তাই যার মনে যা ভাল মনে হয় তাই-ই ভালো বুঝায়, অর্থাৎ কারও কাছে যদি ঘুষ, দুর্নীতি, খুন, গুম, ধর্ষণ, সমকামিতা, ব্যভিচার ভাল কাজ মনে হয় তবে তা ভাল এবং তা করা উচিৎ।]

আর এই প্রধান তিনটি নীতিমালার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে Secular ethics এবং Secular humanism. জর্জ হোলিয়্যাকের অত্যাবশ্যকীয় তিনটি নীতি মানবজীবনের জন্য পূর্ণাঙ্গ কোন নীতিমালা হতে পারেনি। এ নীতিমালা খণ্ডিত, অপূর্ণাঙ্গ এবং Abstract বা বিমূর্ত। সুনির্দিষ্ট নয়, অস্বচ্ছ। আর এমন ধরনের নীতিমালার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা Secular ethics এবং Secular humanism এর রূপ দ্ব্যর্থবোধকতা বা ambiguity এবং double নয় multi-standard দোষে দুষ্ট হবে এটাই স্বাভাবিক। যেমনঃ "End justifies the means." Or "Everything is fair in love and war." হচ্ছে দু'টি অন্যতম Secular ethics. আর এজন্যই war-এর নামে গুম, খুন ও নিরীহ নারী-শিশু ও বেসামরিক নাগরিক হত্যা Secular ethics-এ দোষনীয় নয় এবং love-এর নামে ব্যভিচার, পর্ণোগ্রাফি এবং পশুচার সবই ভালকাজ। রাজনীতিতে

---

৫. জন্ম : বার্মিংহাম, ১৩ এপ্রিল, ১৮১৭; জীবনাবসান : ব্রাইটন, ২২ জানুয়ারী, ১৯০৬।

৬. http://www.newadvent.org/cathen/13676a.htm



www.pathagar.com

একটি কথা খুবই প্রচলিত যে, রাজীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের শেষ কথা আছে - তা হলো বস্তুই জীবনের শেষ কথা। বস্তু জীবনই জীবনের শেষ উপাখ্যান। "The moment I die- আমি মাটির সাথে মিশে যাব"-এটাই ধর্মনিরপেক্ষ জীবনের একমাত্র Philosophy. তাই বস্তুই জীবনের একমাত্র আরাধ্য। জীবনের সফলতা-ব্যর্থতার একমাত্র নিয়ামক মাপকাঠি হচ্ছে ছলে-বলে-কৌশলে শুধুই বস্তুগত উপার্জন। সুতরাং যখন যে তন্ত্র প্রয়োজন তা ধনতন্ত্র-সমাজতন্ত্র যে কোনো তন্ত্রই হোক না কেন অর্থ-সম্পদ উপাজর্নই বড় কথা। টাকা সাদা না কালো সেটি বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে, টাকা আপনার আছে কি-না। টাকার কোনো ধর্ম নেই। টাকা ধর্মনিরপেক্ষ।

কারো কারো মতে সেক্যুলারিজমের অর্থ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নয়, ধর্মবর্জনবাদ। ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি ব্যবহার করে এখানে চতুরতার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। ধর্মবিশ্বাসী মানুষদের সাথে প্রতারণা করার, বিভ্রান্ত করার অবকাশ রাখা হয়েছে। কারণ ধর্মবর্জনবাদ বলা হলে তাতে সেক্যুলারিজম-এর রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজির মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায় এবং মানুষের কাছে তা আদৃত হওয়ার পরিবর্তে রাজনৈতিকভাবে আবর্জনার আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাকেই নিশ্চিত করে বেশি।

Wikipedia তে রাষ্ট্রীয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা স্টেইট সেক্যুলারিজম এর রূপ তুলে ধরা হয়েছে এভাবে- "secularism is a movement towards the separation of religion and government [often termed the separation of church and state]. This can refer to reducing ties between a government and a state religion, replacing laws based on scripture [such as the Torah and Shariah law] with civil laws, and eliminating discrimination on the basis of religion. This is said to add democracy by protecting the rights of religious minorities."[৭] ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে সরকার ও ধর্মের মাঝে বিভেদের প্রাচীর গড়ে তোলার আন্দোলন। যাকে প্রায়শই চিহ্নিত করা হয় চার্চ ও রাষ্ট্রের মাঝে বিচ্ছেদের কারণ হিসেবে। ধর্মের নামে বৈষম্য দূর করা, নাযিলকৃত আসমানী আইনকে [তাওরাত ও শারীয়া ল'] সিভিল ল' দ্বারা প্রতিস্থাপন করা এবং সরকার ও রাষ্ট্রীয় ধর্মের মাঝে দূরত্ব তৈরির জন্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে উপায় হিসেবে অবলম্বন করা হয়। [রাষ্ট্রীয়ভাবে] ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সাথে গণতন্ত্রের সংমিশ্রণ করার কথা বলা হয়ে থাকে। [আর তাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের কাছে গণতন্ত্রের কথা, গালভরা চর্চার বিষয়। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের নিকট গণতন্ত্রের সংজ্ঞা হলো ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার

---

৭. http://en.wikipedia.org/wiki/Secularism



www.pathagar.com

{সংখ্যালঘুদের দৃষ্টিতে নয়, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের দৃষ্টিতে অধিকার বলে যা বিবেচিত হয়, তাই অধিকার হিসেবে চিহ্নিত} সংরক্ষণ করা। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় সম্প্রদায়কে কঠোরহস্তে দমন করা। ]"

Secularism এর পুরো বিষয়টি শুধুই Church এবং State উভয়ের সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট। রাজনৈতিক আধিপত্য বা সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের কারণে ইসলামকে Church-এর স্থানে বসিয়ে Shariah law এর স্থলে সিভিল 'ল-কে প্রতিষ্ঠিত করতে ক্লান্তিহীন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল। বস্তুতঃ ধর্ম, বর্ণ, রক্ত, ভাষা ইত্যাদির নামে ইসলামে কোনো DISCRIMINATION নেই। কিন্তু তাহলে মুসলিম বিশ্বে কিভাবে এ আদর্শ বিকশিত হল? প্রতিষ্ঠিত হল? এ এক দুর্ভাগ্যজনক প্রশ্ন।

বস্তুতঃ এর পেছনে দুটো কারণ ঃ

০১) মুসলিম বিশ্বকে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের মধ্যে ইসলামের শ্বাশত রূপের জ্ঞান এবং তার প্রায়োগিক জ্ঞানের অভাব।

০২) রাজনৈতিক ও ভৌগলিক স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ জনগণকে ইসলামের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করতে, ইসলামী জীবনাচরণে উদ্বুদ্ধ করতে বা Motivate করতে অক্ষমতা।

সার্বিক প্রেক্ষাপটে মুসলিম দেশগুলোতে Secularism এর দিকে মানুষকে ডাকা মানে নাস্তিকতার দিকে মানুষকে ডাকা। ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করার দিকে ডাকার নামান্তর। মুসলিম বিশ্বে যারাই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে Secularism প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে সবার পরিণতির দিকে দৃষ্টি ফেরালে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে কতটা concerned . বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বাস্তব প্রায়োগিক রূপের কারণে এ মতবাদ পাশবিক মতবাদে পরিণত হয়েছে। কেউ জাতীয় কেউবা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এ পাশবিকতা করে যাচ্ছে। এ মতবাদ ধোঁকাবাজ, মানবতাবিরোধী পুঁজিপতি ধনিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা আর প্রবৃত্তির উপাসকদের প্রিয় মতবাদ। এ মতবাদ দুর্নীতিবাজদের শেষ ভরসা বা আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে। এ মতবাদ তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতকে অস্বীকার করার মতবাদ। এ মতবাদ মানুষকে তার খেয়াল খুশীর দাসত্বের নিগড়ে এতটা আবদ্ধ করে যে, খেয়াল-খুশীর আনুগত্য করাই তার একমাত্র এজেন্ডাতে পরিণত হয়। তাই কার্যতঃ মানুষের খেয়াল খুশীই হয়ে ওঠে তার একমাত্র প্রভু। আর রক্ত-মাংসের মানুষটি হয়ে ওঠে নিজের খেয়াল-খুশী বা প্রবৃত্তির উপাসক। তার জীবনে কয়েকটি নীতিই হয়ে ওঠে মুখ্য; তা হলো -"শক্তের ভক্ত নরমের যম" কিংবা "জোর যার মুল্লুক তার" বা "মগের মুল্লুক" বা "Survival of the fitest" কিংবা "বিচার মানি তালগাছ আমার" ইত্যাদি।



www.pathagar.com

# বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের জন্ম

এই উপমহাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আদর্শের প্রয়োগ বৃটিশ শাসনামল হতেই। ইংরেজ আমলেই ধর্মনিরপেক্ষ মূলনীতিসমূহ আমদানী করা হয়। ১৮৩৫ সালে মুসলিম আইনের বদলে বৃটিশ আইন চালু করা হয়। পরবর্তীতে লর্ড ম্যাকলের সুপারিশ অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আর ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশের সংবিধান বলবৎ হয়। তাতে ভারতীয় সংবিধানের অনুকরণে বাংলাদেশের সংবিধানে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অর্ন্তভুক্ত করা হয়।

উপমহাদেশের মুসলিমগণ তাদের মৌল বিশ্বাস, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে স্বতন্ত্র মুসলিম জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার জন্য একটি পৃথক আবাসভূমির দাবীতে সংগ্রাম করেছিলো। তার ফলশ্রুতিতে ভারত বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করে। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিত অনুধাবনের লক্ষ্যে ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ আন্দোলনের পটভূমিকে অনুধাবন করা প্রয়োজন। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ প্রকৃতপক্ষে নিম্নোক্ত মৌলিক বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছে ঃ

০১. ব্রিটিশ সরকারের divide and rule নীতি। [যা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের একটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি]

০২. ঊনিশ শতকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের উন্মেষ। [divide and rule নীতির উর্বর ফসল]

০৩. বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে ভারতের মুসলিমদের প্রতি বৈরীভাব ও দমননীতি। ['জোর যার মুল্লুক তার' নীতি]

০৪. হিন্দুদের অসহিষ্ণু ও সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগি এবং সুদের নির্মম শোষণ। [ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে সুদ সর্বোতভাবে অনুমোদিত]

০৫. হিন্দুদের উগ্র সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দাঙ্গার উস্কানি ['জোর যার মুল্লুক তার' নীতি]

০৬. ভারত বর্ষের বিশালত্ব ও ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির তুলনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ প্রশাসকের ও উন্নত যোগাযোগের অভাব। [শাসক চক্রের সর্বগ্রাসী স্বার্থপরতার ফসল]

১৯৩৭ সালে ও ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভারতের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা বাংলায় [বর্তমান বাংলাদেশে] "মুসলিম লীগের" বিজয় ছিল অভূতপূর্ব। এ বিজয়ের পেছনে ছিল বাংলার মুসলিমদের মুক্তির উদগ্র আকাংখা। তাই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান



www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে এবং বাঙালী মুসলিমরা নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের সাথে একাত্মতা অনুভব করে তার গতিকে তরান্বিত করে। ক্রমশঃই পাকিস্তান দাবী অপ্রতিহত হয়ে উঠে। সুতরাং ব্রিটিশ সরকারের divide and rule নীতি ও মুসলিমদের প্রতি বৈরীভাব এবং দমননীতি, হিন্দুদের অসহিষ্ণু ও সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগি, উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং সুদের নির্মম শোষণ যেমন ভারত বিভাগের জন্য দায়ী, তেমনি পরবর্তী পর্যায়ে অখণ্ড পাকিস্তানের বিভক্তির পেছনেও ছিলো কিছু মৌলিক বিষয়। যেমন ঃ

০১. পাকিস্তানের শাসক চক্রের সর্বগ্রাসী স্বার্থপরতা,
০২. সুন্নী-শিয়া, এজাতীয় সংকীর্ণ ধর্মীয় বিদ্বেষের নীরব প্রশ্রয় দেয়া বা ইন্ধন দেয়া,
০৩. অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা,
০৪. বাঙালী মুসলিম ভাইদের প্রতি সীমাহীন বঞ্চনা,
০৫. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের রায়কে অবজ্ঞা করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা,
০৬. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাঙালী মুসলিমদের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে শত্রুর ফাঁদে ঠেলে দেয়া এবং এ যুদ্ধের পক্ষে সাফাই গাওয়া,
০৭. জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের আলোচনাকে দাম্ভিকতার সাথে প্রত্যাখ্যান করা,
০৮. পাকিস্তানকে ইসলামিক রিপাবলিক[৮] ঘোষণা করা হলেও বিচার ব্যবস্থা ও শিক্ষানীতিতে বৃটিশ মডেলকে অনুসরণ করা এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানে অবিচারকে অব্যাহত রাখা ইত্যাদি অবিমৃশ্যকারী আচরণ পাকিস্তান রাষ্ট্রটির মৃত্যুর জন্য দায়ী।

অখণ্ড পাকিস্তানের অবসানের ধ্বংসস্তূপের গর্ভেই বাংলাদেশের জন্ম। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠির নির্বিচার গণহত্যা আর তার প্রতিবাদে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের মানুষের ন্যায়সংগত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে রক্তস্নাত স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) এর ঘোষিত ছয় দফা [৯] কর্মসূচির

---

৮. Pakistan shall be a Federal Republic to be known as the Islamic Republic of Pakistan. [The Constitution of Pakistan, 1 (1)]

৯. ছয় দফা ঃ ০১. পাকিস্তানের সরকার হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও সংসদীয়। কেন্দ্রীয় আইন সভার এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ইউনিটগুলোর আইন সভার নির্বাচন হবে প্রত্যক্ষ এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। কেন্দ্রীয় আইন সভার প্রতিনিধি হবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে। ০২. যুক্তরাষ্ট্র সরকারের হাতে থাকবে কেবলমাত্র দেশ রক্ষা, পররাষ্ট্রীয় বিষয় এবং তৃতীয় দফায় বর্ণিত শর্তাধীনে মুদ্রা। ০৩. দেশের দুটি অংশের জন্য দুটি পৃথক এবং সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে অথবা ফেডারেল রিজার্ভ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে দু'অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। একটি



www.pathagar.com

ভিত্তিতে ১৯৭০ এর নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অখণ্ড পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে পাকিস্তানে কেন্দ্রিয় সরকার গঠন ও পরিচালনার অধিকার অর্জন করে। কিন্তু সে ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত করে ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের [বর্তমান বাংলাদেশের] সাধারণ জনগণের ওপর একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়। এতে করে ছয় দফায় রাজনৈতিক অঙ্গীকার যাই থাকুক না কেন, সামরিক পদক্ষেপের কারণে সে অঙ্গীকারের আবেদন ফুরিয়ে যায়। যদিও ছয়দফায় রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে "ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ"-এর কথা বলা ছিল না কিংবা "১৯৫৩ সালের ৫ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ [তৎকালে আওয়ামী মুসলিম লীগ], কৃষক শ্রমিক পার্টিসহ আরো কয়েকটি দল মিলে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন এবং এই ফ্রন্টের ২১ দফার প্রথম দফার ওপরে লিখা ছিল ঃ কোরআন-সুন্নাহর মৌলিক খেলাফ কোনো আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।"[১০]

---

আঞ্চলিক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। এই ব্যাংকগুলো এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সম্পদ হস্তান্তর এবং মূলধন পাচার বন্ধ করবে। ০৪. রাজস্ব সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব এবং কর ধার্যের ক্ষমতা অংগরাজ্যগুলোর হাতে থাকবে। দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র দফতর পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয়া হবে। সংবিধানে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে নির্ধারিত হারে উক্ত রাজস্ব আদায়ের সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে জমা হবে। কর নীতির উপর অংগরাজ্যগুলোর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার লক্ষ্যের সাথে সংগতি রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের প্রয়োজন মিটাবার নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা সংবিধানে থাকবে। ০৫. যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত অংগরাজ্যগুলোর নিয়ন্ত্রণে প্রত্যেকটি ইউনিটের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পৃথক হিসাব রাখার শাসনতান্ত্রিক বিধান থাকবে। শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী ধার্য হারের ভিত্তিতে অংগরাজ্যগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মিটাবে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পররাষ্ট্র নীতির কাঠামোর মধ্যে আঞ্চলিক সরকারগুলোকে বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা এবং চুক্তির ক্ষমতা সংবিধানে দেয়া হবে। ০৬. কার্যকরভাবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার অংশগ্রহণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যগুলোকে প্যারামিলিশিয়া বা আধা-সামরিক বাহিনী সংগঠনের ক্ষমতা দেয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সকল শাখায় ও কেন্দ্রীয় সার্ভিসে জনসংখ্যার ভিত্তিতে পাকিস্তানের সকল অংশের মানুষের ন্যায্য প্রতিনিধিত্বের জন্য সংবিধানে বিধান থাকবে। স্বল্প প্রতিনিধিত্বশীল অঞ্চলগুলো, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বর্ধিত হারে লোক নিয়োগের মাধ্যমে যত সত্বর সম্ভব বর্তমানের স্বল্প প্রতিনিধিত্বের অবসান করা হবে। প্রাথমিক সংশোধনমূলক পদক্ষেপ হিসেবে বর্তমানে করাচীতে অবস্থিত নৌবাহিনীর সদর দফতর ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত করা হবে। [ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, ঢাকা; পৃ. ৭৩৬-৭৩৭।]

১০. মাহমুদউল্লাহ [সম্পাদিত], বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্র [ঢাকা: গতিধারা ১৯৯৯], খ.১, পৃ. ২১৬-২২২



www.pathagar.com

পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকটকে রাজনৈতিকভাবে মুকাবিলা না করে সামরিকভাবে মুকাবিলা করতে গিয়ে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। আর পাকিস্তানের চিরশত্রু ভারত সে সুযোগ হেলায় হারাতে দেয়নি। বাংলাদেশের শরণার্থীদের মানবিক সহযোগিতার হাত বাড়ানোর মধ্য দিয়ে ভারত তার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণ করার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে এবং অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে, শেখ মুজিবুর রহমান সহ শুধুমাত্র ভারতের অনুরক্ত সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার হাত বাড়িয়ে দেয়। ফলে ভারতের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণকারী সকল পক্ষই এক ধরণের নৈতিক ঋণে ঋণী হয়ে যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানও তেমনি এক নৈতিক ঋণে ঘটনাচক্রে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। আর একটি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশের কর্ণধার হিসেবে প্রতিবেশী দেশের সার্বিক সহযোগিতার মুখাপেক্ষীও ছিলেন। এমনি এক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ 'ধর্মনিরপেক্ষতা'-র জন্ম। স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণার মাধ্যমে এর সূচনা হয়েছিলো ভারতে।[১১] পাকিস্তানের কারাগার হতে ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় ভারতে যাত্রাবিরতির প্রাক্কালে ভারতের দিল্লিতে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমান-এর সম্মানে দিল্লির লালকেল্লা ময়দানে সংবর্ধনা সভায় প্রদত্ত তাঁর ভাষণ-এ তিনি এ ঘোষণা দেন।[১২] তাঁর ভাষায়, "আমার ভাই ও বোনেরা। আপনাদের প্রধানমন্ত্রী, আপনাদের সরকার, সৈন্যবাহিনী, আপনাদের জনসাধারণ যে সাহায্য এবং সহানুভূতি আমার দুঃখী মানুষকে দেখিয়েছে চিরদিন বাংলার মানুষ তা ভুলতে পারবে না। ব্যক্তিগতভাবে, আপনারা জানেন, আমি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্ধকার সেলের মধ্যে বন্দি ছিলাম দুদিন আগেও। শ্রীমতি গান্ধী আমার জন্য দুনিয়ার এমন জাগা নাই যেখানে তিনি চেষ্টা করেন নাই আমাকে রক্ষা

---

১১. আওয়ামী লীগের ছয় দফা বা ১৯৭০ এর নির্বাচনী ইশতেহার ও কর্মসূচীতে কিংবা ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের ১৯৭১ সালের ঘোষণাপত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা বা সমাজতন্ত্রের প্রতি কোনো রাজনৈতিক অঙ্গীকার না থাকলেও ১৯৭২ সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে ভারতে যাত্রাবিরতিতে ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সংবর্ধনায় শেখ মুজিবুর রহমান ধর্মনিরপেক্ষতায় তার দৃঢ় বিশ্বাসের কথা ঘোষণা দেন। ফলে ছয় দফা, ১৯৭০-এর নির্বাচনী ইশতেহার, মুজিবনগর সরকারের ঘোষণাপত্র সবই সে ঘোষণার সাথে সাথে অকার্যকর হয়ে পড়ে। ধর্মনিরপেক্ষতা বাংলাদেশের রাজনীতিতে অনিবার্য হয়ে ওঠে।

১২. An ATN Bangla Production [DVD] "History of Liberation" Planning, Editing, Research, Collection & Directing by- DR. MAHFUZUR RAHMAN, Chairman ATN Bangla, ATN Music Ltd. Dhaka Trade Center. 99 Kazi Nazrul Islam Avenue [3rd Floor], Kawran Bazar, Dhaka-1215. TEL- 9136288 Mobile-01199933431



www.pathagar.com

করার জন্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে তার কাছে কৃতজ্ঞ। আমার সাড়ে সাত কোটি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে এবং তার সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার জনসাধারণ ভারত বর্ষের জনসাধারণের কাছে কৃতজ্ঞ। আর যেভাবে এককোটি লোকের খাওয়ার বন্দোবস্ত এবং থাকার বন্দোবস্ত আপনারা করেছেন, আমি জানি ভারত বর্ষের মানুষও দুঃখী আছে সেখানে, তারাও কষ্ট পাচ্ছে, তাদেরও অভাব-অভিযোগ আছে, তা থাকতেও তারা সর্বস্ব দিয়েছে আমার লোকদের সাহায্য করার জন্য। চিরদিন আমরা তা ভুলতে পারব না। আমরা আশা করি, আজ জানেন বাংলাদেশ শেষ হয়ে গেছে। আমি সমস্ত সকল প্রকার সাহায্য সহানুভূতি আশা করি এবং এও আশা করি যে দুনিয়ার শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক যে মানুষ আছে তারা এগিয়ে আসবে আমার মানুষকে সাহায্য করার জন্য। আমি বিশ্বাস করি সেক্যুলারিজমে। আমি বিশ্বাস করি গণতন্ত্রে। আমি বিশ্বাস করি সোশ্যালিজমে। আমাকে প্রশ্ন করা হয়, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আপনার আদর্শের এত মিল কেন? আমি বলি এটা আদর্শের মিল, এটা নীতির মিল, এটা মনুষ্যত্বের মিল, এটা বিশ্ব-শান্তির মিল।"

বাংলাদেশে Secularism কিভাবে দানা বেঁধেছিল, কোন উৎস হতে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল The New York Times, MAY,15,1971 এর একটি উদ্বৃতি হতে তা আরো সুস্পষ্ট হতে পারে ঃ[১৩]

এরপর বাংলাদেশে যখন সংবিধান রচনা করা হয় তখন সংবিধানের চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি গ্রহণ করা হয়েছিল - ০১. গণতন্ত্র ০২. সমাজতন্ত্র ০৩. জাতীয়তাবাদ ও ০৪. ধর্মনিরপেক্ষতা তা মূলতঃ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের অনুসৃত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিরই প্রতিফলন। তবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'-র জন্ম, দিল্লির লালকেল্লা ময়দানে সংবর্ধনা সভায় প্রদত্ত শেখ মুজিবুর রহমানের উক্ত ভাষণের আলোকে ভারতের মাটিতেই হয়েছে বলে উল্লেখ করা হলেও এর পটভূমি কিন্তু তৈরি হয়েছিলো অখণ্ড পাকিস্তানেই। এ নিয়ে কিছু কেসস্টাডি তুলে ধরা হলো ঃ

**কেসস্টাডি-০১ ঃ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও জীবন্ত কবর**

৩রা জানুয়ারী, ১৯৭১ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে প্রায় বিশ লাখ লোকের এক সমাবেশে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নব নির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যরা জনগণের সামনে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ ঃ

---

১৩. www.albd.org



www.pathagar.com

"...........আমরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। শুধু বাংলারই নই। আমরা সারা পাকিস্তানের মেজরিটি। আমরা যে শাসনতন্ত্র রচনা করবো, সেটাই জনগণ গ্রহণ করবে এবং তা বানচালের অধিকার কারো নেই। মরহুম নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেছেন, শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে জনগণের রায়ই শেষ কথা। আর সে রায় আমরা পেয়েছি। যদি কেউ এ রায়ের বিরোধিতা করে তবে রক্তক্ষয় হবে এবং যে অভ্যুত্থান ঘটবে তা কেউ রোধ করতে পারবে না।

পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র ৬ দফার ভিত্তিতে প্রণীত হবে এবং তাতে ১১ দফার প্রতিফলন থাকবে - কেউ তা রোধ করতে পারবে না। ৬ দফা ও ১১ দফা এখন আর আওয়ামী লীগের সম্পত্তি নয়, বাংলার জনগণ গত নির্বাচনে ৬ দফার পক্ষে রায় দিয়েছেন। ৬ দফা পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের কোন ক্ষমতা বা অধিকার এখন আর আওয়ামী লীগ বা আমার নেই।

কিন্তু সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের সহযোগিতা নেব না এ ধরণের কথা আমরা বলি না। আমরা অবশ্যই তাদের সহযোগিতা কামনা করি। কিন্তু একটি কথা আমি পরিস্কার ভাষায় বলে দিতে চাই - নীতির প্রশ্নে কোনো আপোষ নাই।

আমরা দেশের একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবো, কারণ আমরা এই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিনিধি। এই প্রক্রিয়ায় যারা বাধা সৃষ্টি করবে তাদেরকে নির্মূল করা হবে। অতীতে আমাদেরকে হিন্দুদের এজেন্ট হিসেবে অ্যাখ্যা দেয়া হয়েছিল এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা দেওয়া হয়। কারণ আমরা বাঙালী। এদেশের প্রতি আমাদের আনুগত্যের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা হয়। আমরা অনেক অন্যায় সহ্য করেছি। অন্যায়ের শিকার কিভাবে হয় তা আমরা জানি। তাই আমরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রতি ন্যায় বিচার করব। যদিও আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা করাচীকে পাকিস্তানের রাজধানী করতে দিয়েছি। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য প্রথম জাতীয় পরিষদের ৬টি আসন ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু প্রতিদানে আমরা কি পেলাম? অবিচার।

কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিতে তোমরা ৮৫ জন, আমরা ১৫ জন। সামরিক বিভাগে ৯০ জন, আমাদের দিয়েছো ১০ জন। বৈদেশিক সাহায্যের তোমরা খরচ করছো ৮০ ভাগ, আমাদের দিয়েছো ২০ ভাগ। মহাপ্রলয়ে দক্ষিণ বাংলার ১০ লাখ লোক মারা গেল। লাখ লাখ লোক অসহায় অবস্থায় রইলো। রিলিফ কাজের জন্য বিদেশ থেকে হেলিকপ্টার এসে কাজ করে গেলো - অথচ ঢাকায় একখানা মাত্র সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টার ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আর কোন হেলিকপ্টার আসলো না। আমরা এসব বেইনসাফীর অবসান করব। বাংলার গরীব আর পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের গরীবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমাদের সংগ্রাম পশ্চিম



www.pathagar.com

পাকিস্তানের দুঃখী মানুষের বিরুদ্ধে নয়, বরং যেসব শোষকদের কারণে বাংলার মানুষ গৃহহারা হয়েছে, বাস্তুহারা হয়েছে, সর্বস্বান্ত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম। এসব শোষকের সাথে কোন আপোষ নেই।

আওয়ামী লীগ যদি সরকার গঠন করে তবে দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গ্রহণ করা হবে। শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং কল-কারখানার শেয়ার শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। ২৩ বছর দেশের গরীব জনগণকে কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহল শোষণ করেছে। আওয়ামী লীগ এই শোষণের শেষ দেখতে চায়। শুধু মাত্র কয়েক মাস সময় আছে, লুটপাট যা করার করে নেন। এরপর আর সময় পাবেন না।

আমার দল ক্ষমতায় যাওয়ার সাথে সাথেই ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দেওয়া হবে। আর দশ বছর পর বাংলাদেশের কাউকেই জমির খাজনা দিতে হবে না। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলাও এই একই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। আইয়ুবী আমলে বাস্তুহারা হয়েছে বাংলার মানুষ। সরকারের খাস জমিগুলো বন্টন করা হবে এবং চর এলাকায়ও বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। আমি কৃষক এবং শ্রমিকদের কথা দিচ্ছি, আওয়ামী লীগ তাদের আদর্শের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, কারণ আমি বিশ্বাস করি আওয়ামী লীগের মাথা কেনার মতো ক্ষমতা পুঁজিপতিদের নেই। এরা কেউ এমনকি আমি নিজেও যদি বিশ্বাসঘাতকতা করি তবে আমাদের জীবন্ত কবর দেবেন।" [১৪]

## কেসস্টাডি-০২ ঃ 'সমাজতান্ত্রিক' কর্মসূচি ও ভোটের বাজার

"আওয়ামী লীগ আজ ব্যাংক, বীমা জাতীয়করণ ইত্যাদি অনেক 'সমাজতান্ত্রিক' কর্মসূচি হাজির করে ভোটের বাজার দখলের উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু তথাকথিত গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে ব্যাংক, বীমা জাতীয়করণ করে যে কিছুই হয় না, জনগণ যে তার কোনো সুফল পায় না ভারতে ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসী সরকারই তার সব থেকে বড় উদাহরণ। সামন্ত বুর্জোয়া শোষকশ্রেণীর রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ভারতীয় জনগণকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে জাতীয়করণের যে উদ্যোগ নিয়েছে আওয়ামী লীগের ব্যাংক, বীমা জাতীয়করণের কর্মসূচি সেই একই জাতের। এ ব্যাপারে ভারতে ইন্দিরা সরকারের ধাপ্পাবাজী যেভাবে জনগণের কাছে ধরা পড়েছে এখানেও তার ব্যতিক্রম হবে না। আওয়ামী লীগের মুখোশও এ ব্যাপারে খসে পড়বে। শুধু তাদের গদীনসীন হতে যা দেরী। ঘটনা প্রবাহ ১৪ জুন, ১৯৭০।"[১৫]

---

১৪. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধঃ ঐতিহাসিক ভাষণ ইশতেহার ও চিঠি, আহমদ পাবলিশিং হাউস,ঢাকা-১১০০, পৃ. ৩-৫ এবং দৈনিক পূর্বদেশ ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৭১।

১৫. বদরুদ্দীন উমর, যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ, আফসার ব্রাদার্স, ৩৮/৪, বাংলাবাজার [২য় তলা], ঢাকা-১০০০। পৃ. - ৭৩।



www.pathagar.com

**কেসস্টাডি-০৩ ঃ রাজনৈতিক বিরোধকে সামরিক বিরোধে রূপদান এবং একটি অনিবার্য সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়া**

৭মার্চ ১৯৭১ শেখ মুজিবুর রহমানের বিবৃতি ঃ

"১লা মার্চ আকস্মিকভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণার পর থেকে ৬ই মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসাধারণকে সামরিক বাহিনীর মোকাবেলা করতে হচ্ছে। নিরস্ত্র বেসামরিক জনগণ [শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র] যারা জাতীয় পরিষদ স্থগিত রাখার আকস্মিক ও অনভিপ্রেত ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য রুখে দাঁড়িয়েছিল, তাদের উপর বেপরোয়াভাবে গুলিবর্ষণ করা হয়েছে। গত সপ্তাহে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার স্বেচ্ছাচারমূলক ও অযাচিত কাজের বিরুদ্ধে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে গিয়েই তাঁরা শহীদ হয়েছেন। এই শহীদদের ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত ব্যক্তি বলে চিত্রিত করা সত্যের অপলাপ মাত্র। সত্যিকারের ত্রাসের রাজত্ব কায়েমের জন্য যারা দায়ী বস্তুতপক্ষে তারাই আসল দুস্কৃতিকারী। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, গত সপ্তাহে যে ভয়াবহ অবস্থার অবতারণা করা হয়েছে তা দেখার জন্য প্রেসিডেন্ট ঢাকা আসার একটু সময় করতেও সক্ষম হননি। প্রেসিডেন্ট যাকে 'ক্ষমতার ন্যূনতম প্রয়োগ' বলে অভিহিত করেছেন, তার ফলেই যদি হাজার হাজার লোক হতাহত হয়ে থাকে, তাহলে কি আমাদের এটাই বুঝতে হবে যে, তিনি যাকে 'পর্যাপ্ত ক্ষমতার প্রয়োগ' বলবেন, তার লক্ষ্য হবে সবকিছু নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া? ..............১লা মার্চ এক বেতার বিবৃতিতে আকস্মিক ও অহেতুকভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। এজন্য অজুহাত দেখান হয়, সমঝোতা সৃষ্টির জন্য আরো সময়ের প্রয়োজন রয়েছে। এ কথাও বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ চলছে। বাংলাদেশের মানুষ কি এর থেকে মনে করতে পারে যে, একটি অগণতান্ত্রিক সংখ্যালঘু দলের নির্দেশে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার মারাত্মকভাবে ক্ষুন্ন করা হচ্ছে? তারা কি যুক্তিসংগতভাবেই ভাবতে পারে না যে, একটি সংখ্যালঘু গ্রুপ শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিকে ব্যাহত করা এবং সংখ্যাগুরু জনসাধারণকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে কতিপয় শক্তির সাথে হাত মিলিয়েছে? দ্রুত সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ থেকে এসব সন্দেহ আরো দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। এতে প্রমাণ হয় 'রাজনৈতিক বিরোধ' অচিরেই 'সামরিক বিরোধের' রূপ নিচ্ছে, যদি না সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘুর নির্দেশের কাছে মাথা নত না করে। ....... প্রতিটি সুস্থমনা ব্যক্তিই আজ যে প্রশ্নটি উত্থাপন করবেন তা হচ্ছেঃ বাংলাদেশের সর্বত্র নিরস্ত্র জনতাকে গুলী করে সেনাবাহিনী 'পাকিস্তানী সংহতি, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা' নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করছে, না অন্য কিছু? এ ভূমিকা



www.pathagar.com

নিয়ে তারা কি কার্যতঃ বিচ্ছিন্নতার প্রধান শক্তি হিসেবে কাজ করছে না? নির্বাচন হয়ে যাবার পর এখন দেশে ক্ষমতার একমাত্র বৈধ উৎস হচ্ছে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। কোন ব্যক্তিবিশেষই নিজেকে নির্বাচিত প্রতিনিধির চেয়ে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে দাবী করতে পারেন না। .....”[১৬]

**কেসস্টাডি-০৪ : প্রতিরোধ দিবস পালন ও রবীন্দ্রনাথ**

........২২শে মার্চ প্রেসিডেন্ট ২৫শে মার্চ থেকে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন পুনরায় স্থগিত ঘোষণা করেন। কারণ হিসেবে 'রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টির' কথা বলা হয়। পাকিস্তান দিবসের প্রাক্কালে পৃথক এক বাণীতে ইয়াহিয়া খান 'আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একযোগে কাজ করার জন্যে এখন ক্ষেত্র প্রস্তুত' বলে উল্লেখ করেন। ২৩ মার্চ, ১৯৭১ সারা বাংলাদেশে পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়। পাকিস্তানী পতাকার পরিবর্তে সর্বত্র বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ছাত্রলীগের প্রতিরোধ বাহিনী ঢাকার পল্টন ময়দানে এক আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজের আয়োজন করে, যেখানে রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি গেয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।[১৭]

**কেসস্টাডি-০৫ : ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচন ও লাইসেন্স-পারমিটের ব্যাপারী**

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাচ্ছে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সারা দেশের সেরা সুবিধাবাদীরা আজ আওয়ামী লীগের পতাকার নীচে জমায়েত হচ্ছে। এম.এন.এ., এম.পি.এ. হওয়ার উমেদার ছাড়াও লাইসেন্স-পারমিটের ব্যাপারীরা শেখ মুজিবের চারিদিকে এখন মাছির মতো ভনভন করে ঘুরছে। ঘটনা প্রবাহ ২৬ জুলাই, ১৯৭০।”[১৮]

**কেসস্টাডি-০৬ : জনসমর্থন ও গণতান্ত্রিক চরিত্র।**

“কাজেই জনগণের বিরাট সমর্থন থাকলেই কোন সংগঠন সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক হয় না, গণতান্ত্রিক হতে হলে তার নেতৃত্বের চরিত্র হতে হয় গণতান্ত্রিক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, বিভাগপূর্ব যুগের মুসলিম লীগ, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট এবং বর্তমান আওয়ামী লীগ এদের প্রত্যেকটিই হলো গণবিরোধী এবং

---

১৬. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধঃ ঐতিহাসিক ভাষণ ইশতেহার ও চিঠি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৫ এবং দৈনিক পাকিস্তান, ৮ই মার্চ, ১৯৭১।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০ এবং আজাদ ও দৈনিক পাকিস্তান, ২৪ শে মার্চ, ১৯৭১।

১৮. বদরুদ্দীন উমর, যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত; পৃ.-১০০।



www.pathagar.com

অগণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। শোষক শ্রেণীর স্বার্থ উদ্ধার করাই এদের আসল উদ্দেশ্য। ঘটনা প্রবাহ ০৪ অকটোবর, ১৯৭০।" [১৯]

**কেসস্টাডি-০৭ ঃ তফাজ্জল হোসেন [মানিক মিয়া] ও কায়েদে আযম**

তফাজ্জল হোসেন [১৯১১-১৯৬৯] মানিক মিয়া এদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর একজন নিবিড় বস্তুনিষ্ঠ সাক্ষী। রাজনৈতিক বোদ্ধাদের কাছে মানিক মিয়া এক পরিচিত মুখ। তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর যেমন রাজনৈতিক সহকর্মী ছিলেন তেমনি কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকেও ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ তাঁর হয়েছিলো। কায়েদে আযম সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ছিলো নিম্নরূপ ঃ "কায়েদে আজমের বক্তৃতা-বিবৃতি হইতে তাঁর গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু পাকিস্তান আন্দোলনকালেই নয়, পাকিস্তানের জন্ম দিবসেও তিনি পাকিস্তানকে একটি গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করার নীতিই ঘোষণা করেন।"[২০]

**কেসস্টাডি-০৮ ঃ পাকিস্তান আন্দোলন, কায়েদে আযম ও ধর্মনিরপেক্ষতা**

পাকিস্তান আন্দোলনের সময় ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা কায়েদে আযম ব্যক্তিগতভাবে অথবা নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগের কোনো প্রস্তাবের মাধ্যমে না বললেও ১৯৪৭ এর ১৪ই আগষ্টের পর থেকে এদেশে শাসক শ্রেণী ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা অনর্গল বলে এসেছেন। শুধু তাই নয়। তাঁরা সব সময় দাবী করে এসেছেন যে তাঁরাই ইসলামের সত্যিকার পাবন্দ এবং অন্যেরা পাকিস্তান ও ইসলামের দুশমন। ..... গত বাইশ তেইশ বছর ধরে যারা পাকিস্তানে অবাধ রাজত্ব করে এসেছে তারা অন্যকে দমন করার জন্যে ইসলামকে একটা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে কসুর করেনি। এর ফলে সব রকম গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে তারা ইসলাম বিরোধী বলে আখ্যা দিয়ে অঙ্কুরে বিনাশ করতে চেয়েছে। কিন্তু তাদের এই প্রচারণার ফলে আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনেক বাধা সৃষ্টি হলেও আন্দোলন দমিত অথবা ব্যর্থ হয়নি। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বিগত ডিসেম্বর-মার্চ আন্দোলনের ইতিহাসই সে কথা প্রমাণ করে। শাসকচক্র ইসলামকে এইভাবে ব্যবহার দ্বারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শেষ পর্যন্ত দমিয়ে রাখতে না পারার ফলে ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণাও অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছে। যাঁরা আগে আন্তরিকভাবে ইসলামের পক্ষে দাঁড়াতেন এমন অনেক মানুষ ইসলামপন্থীদেরকে শোষকচক্রের অন্তর্গত অথবা তাদের সাথে আঁতাতকারী হিসাবে মনে করে আজ

---

১৯. বদরুদ্দীন উমর, যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত; পৃ.-১৩৫।

২০. তফাজ্জল হোসেন [মানিক মিয়া], পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর, বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লিঃ, পৃ.- ৩৭।



www.pathagar.com

ইসলামের প্রতি অনেকখানি উদাসীন অথবা বিরূপভাবাপন্ন হয়েছেন। ......... ইসলামের প্রতি পাকিস্তানের এবং বিশেষ করে পূর্ব বাংলার মানুষের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য ১৯৪৭ সাল থেকে বিগত বাইশ বছরে ইসলামের শ্লোগান দেনেওয়ালা শাসকচক্রের গণবিরোধী কীর্তিকলাপই দায়ী। ধর্মের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন এদেশের পক্ষে ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে সেটা পৃথক কথা, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে এই মনোভাব সৃষ্টির জন্য শাসকগোষ্ঠি ও তাদের পদলেহী দালালরাই যে মূলত দায়ী সে কথা অস্বীকার করবে কে?

আজ এদেশের মানুষ চান এক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। এই দাবী কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। গত বাইশ তেইশ বছরের অবিরাম সংগ্রামই এদেশের রাজনীতিকে তার বর্তমান পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়েছে। বিগত ডিসেম্বর-মার্চের গণ আন্দোলনের সময় মানুষের এই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আরও উচ্চতর স্তরে ওঠে...। ঘটনা প্রবাহ ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০।"[২১]

**কেসস্টাডি-০৯ ঃ পরিশ্রম+প্রার্থনা = ফসল এবং নিরীশ্বরে বিশ্বাস।**

"১৮৩২ সালে হিন্দু কলেজের বিশেষ করে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, মহেশচন্দ্র ঘোষ, মাধবচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ হিন্দু ধর্মের ওপর প্রচন্ড আক্রমণ করেন। মাধবচন্দ্র ঘোষ ১৮৩২ সালে তখনকার সবচেয়ে বহুল প্রচলিত ইংরেজি দৈনিক বেঙ্গল হরকরার পাতায় লেখেন যে, তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা যদি তাঁদের অন্তর থেকে কোনো কিছু সবচেয়ে ঘৃণা করেন, তা হলে সে হলো হিন্দু ধর্ম। এখানেই তারা থেমে থাকেননি। ঐ একই বছর প্রথমে মহেশচন্দ্র ঘোষ এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর ১৮৪০-এর দশকে রাজনারায়ণ বসু ইসলাম ধর্মে আগ্রহ দেখান, ভূদেব মুখোপাধ্যায় খৃস্ট ধর্মের প্রতি কৌতুহল প্রকাশ করেন আর মধুসূদন দত্ত রীতিমতো খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন। ............ নতুন শিক্ষা ও সামাজিক পরিবর্তনের মুখে সে যুগে ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মনোভাবই দেখা দিয়েছিলো। এই প্রসঙ্গে আরও দুজনের নাম না বললে চলে না - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম বিদ্যাসাগরের। দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজে ধর্মনিরপেক্ষ পাঠক্রম পড়ে মানুষ হয়েছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর লেখাপড়া শেখেন রক্ষণশীল ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান - সংস্কৃত কলেজে। অথচ তিনি আত্মপ্রকাশ করেন ১৮৪২ সালে প্রকাশিত বিধবাবিবাহের পক্ষে একটি বেনামী রচনার মধ্য দিয়ে। সে লেখায় এবং পরবর্তীকালে তাঁর অসংখ্য লেখায় বারবার তিনি শাস্ত্রের দোহাই এবং নতুন ব্যাখ্যা

২১. বদরুদ্দীন উমর, যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ, আফসার ব্রাদার্স, ৩৮/৪, বাংলাবাজার [২য় তলা], ঢাকা-১০০০। পৃ. - ১১-১২।



www.pathagar.com

দিয়ে হিন্দু সমাজের সংস্কার করতে চেয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস কি ছিলো, কার্যতঃ তিনি তা গোপন রেখেছিলেন। সম্ভবত তিনি ছিলেন সংশয়বাদী। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মে তাঁর আস্থা এবং অন্ধবিশ্বাস বৃদ্ধি না পেয়ে, বৃদ্ধি পেয়েছিলো তাঁর সংশয়।

অপর পক্ষে, অক্ষয়কুমার দত্ত সংশয়বাদের উর্ধ্বে উঠে প্রায় নিরীশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। তিনি গাণিতিক সমীকরণের মাধ্যমে প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন যে, প্রার্থনা অর্থহীন এবং এ থেকে কোনো ফল মেলে না। তাঁর সমীকরণটি ছিল এমন ঃ

পরিশ্রম = ফসল।

আবার, পরিশ্রম+প্রার্থনা = ফসল।

সুতরাং, প্রার্থনা = শূন্য [০]

তাঁর এই সমীকরণের কথা মনে রাখলেই তাঁর যুক্তিবাদের স্বরূপ খানিকটা উপলব্ধি করা যায়। এই যুক্তিবাদী ধারা উনিশ শতকে জোরালো হয়নি ঠিকই, কিন্তু পাশ্চাত্যের সর্বব্যাপী প্রভাবের মুখে বাঙালি সমাজ কিভাবে সাড়া দিয়েছিলো, অক্ষয়কুমার দত্তের মতো স্বল্পসংখ্যক চিন্তাবিদের কথা বাদ দিয়ে তা বোঝা যায় না।"[২২]

**কেসস্টাডি-১০ ঃ 'বিসমিল্লাহ' বললে কী হয়, প্রার্থনায় কিছুই হয় না - পরিকল্পনা সচিব।**

"ইউনিসেফের বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি রিপোর্ট প্রকাশনা উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনায় পরিকল্পনা সচিব ভুঁইয়া শফিকুল ইসলাম বললেন, বস্তির শিশুরা গ্রামের দরিদ্রতম শিশুর চেয়েও অপুষ্টিতে ভুগছে। বিধাতা জন্ম-মৃত্যুর নায়ক। তিনি কেন বস্তিতে এত শিশু জন্ম দিতে যান তা আমি বুঝি না। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে এই রিপোর্ট প্রকাশনা উপলক্ষ্যে আলোচনায় শফিকুল ইসলাম বিসমিল্লাহ প্রসঙ্গে বলেন, 'বিসমিল্লাহ বললে কী হয়? প্রার্থনা দিয়ে কিছু হয় না।' কেননা, ফিলিস্তিন মুক্ত করার জন্য মক্কায় যে প্রার্থনা করা হয় তা কবুল হলে এত দিনে ফিলিস্তিন মুক্ত হয়ে যেত ....... ইত্যাদি। সচিব মহোদয় আলোচ্য বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা উপেক্ষা করে এভাবেই আরো কিছু অরুচিকর বক্তব্যের অবতারণা করেন তার এ জাতীয় বক্তব্যে বিব্রত বোধ করেন শ্রোতৃমন্ডলী।"[২৩]

**কেসস্টাডি পর্যালোচনা ঃ**

কেসস্টাডি-১ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ক্ষমতায় যাবার সাথে সাথেই ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দেওয়া হবে। আর দশ বছর পর বাংলাদেশের

---

২২. গোলাম মুরশিদ, হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৩৭-১৪০।

২৩. দৈনিক নয়া দিগন্ত, ০১ মার্চ ২০১২, পৃ.-০১।



www.pathagar.com

কাউকেই জমির খাজনা দিতে হবে না......আওয়ামী লীগ যদি সরকার গঠন করে তবে দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গ্রহণ করা হবে। শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং কল-কারখানার শেয়ার শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে - মর্মে যে প্রতিশ্রুতি আওয়ামী লীগ দিয়েছিলো তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়নি; অথবা আওয়ামী লীগের এটা ছিল রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি যা বাস্তবায়নে কোনো দায়বদ্ধতা নেই বলে আওয়ামী লীগ মনে করে; অথবা এও হতে পারে যে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিটি ছিল অখন্ড পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে। বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে তা বাস্তবায়নের কোনো অবকাশ নেই। বিশ্লেষণ যাই হোক না কেন, ক্ষমতায় যাবার সাথে সাথে "২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দেয়ার, শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং কল-কারখানার শেয়ার শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ করার" প্রতিশ্রুতি আওয়ামী লীগ যে দিয়েছিলো পরবর্তীতে তা বাস্তবায়নে অক্ষম হওয়ায়, সেই প্রতিশ্রুতি জনগণকে প্রতারিত করার পর্যায়ে পর্যবসিত হয়। ১৯৭০ এর নির্বাচনে জয়লাভের পর ৩রা জানুয়ারী ১৯৭১ -এ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন প্রসঙ্গে ঘোষণা দিয়েছিলো "সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি" গ্রহণ করার। এই ঘোষণাও ছিল অখন্ড পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর "বাকশাল" ছিলো ঘোষিত সেই সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি ও অর্থনীতির বাংলাদেশ সংস্করণ। অখন্ড পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে প্রদত্ত উক্ত প্রতিশ্রুতিগুলোর মধ্যে যেটি সরাসরি জনগণের অর্থনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শুধু সেই প্রতিশ্রুতিটিই বাস্তবায়িত হয়নি। উপরন্তু মানুষকে চরম অর্থনৈতিক মন্দার মুকাবিলা করতে হয়েছে। দেশের মানুষ দুর্ভিক্ষাক্রান্ত হয়ে ক্ষুধার জ্বালায় ধুকে ধুকে মরেছে। মর্মান্তিক সে অর্থনৈতিক চিত্র এদেশের এক অমোচনীয় ইতিহাস। সমাজতন্ত্রের নামে বাকশাল ডকট্রিন এদেশের মানুষকে দুর্ভিক্ষের যাতাকলে পিষ্ট করে ক্ষুধার সঙ্গীন দিয়ে হত্যা করা ছাড়া আর কোনো অবদান রাখতে পারেনি। ঐতিহাসিক ৬ দফার ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জনগণের যে ম্যান্ডেট পেয়েছিলো তাতে ধর্মনিরপেক্ষতা কিংবা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কোনো অঙ্গীকার ছিলো না।[২৪] ঐতিহাসিক ৬ দফার ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জনগণের ম্যান্ডেট পাবার পর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পূর্বেই প্রায় বিশ লাখ লোকের সমাবেশে [৩রা জানুয়ারী ১৯৭১ -এ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে] আওয়ামী লীগ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ঘোষণা দিলো, ধর্মনিরপেক্ষতা ছিলো যার রাজনৈতিক সহোদর। এই ঘোষণা ছিলো ঐতিহাসিক ছয় দফার ঘোষণা হতে সুস্পষ্ট স্খলন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রতিফলিত জনগণের মতামতকে ভিন্নখাতে ধাবিত করার, জনগণকে ইসলামী মূল্যবোধ ও চেতনা থেকে সরে আসার, প্রকারান্তরে ইসলামকে ত্যাগ করার কৌশলী আহবান এবং কেসস্টাডি-২ পর্যালোচনায় সুস্পষ্ট

২৪. ০৯ নং টীকায় "ঐতিহাসিক ৬ দফা" উল্লেখ করা হয়েছে।



www.pathagar.com

হয়ে ওঠে যে আওয়ামী লীগের উক্ত সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী ছিলো ভারতের ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস সরকারের নীতির অন্ধ অনুকরণ মাত্র। অথচ পাকিস্তানের আত্মস্বীকৃত চিরশত্রু এবং বাংলাদেশের বন্ধুখ্যাত এই ভারত বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের দিনে বন্ধুর পরিচয় দিতে অক্ষম হয়ে পড়েছিলো। বিপদে বন্ধুর পরিচয় কী তা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ পলে পলে উপলব্ধি করেছিলো। এখনও করছে। সীমান্তে বাংলাদেশ, ফেলানীর লাশ হয়ে ঝুলে থাকার মাধ্যমে।

কেসস্টাডি-৩ পর্যালোচনায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দুর্দশার এক নিখুঁত চিত্র। যা আওয়ামী লীগের সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিকে নিবিড় পরিচর্যায় সামনে এগিয়ে নিতে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করেছে। ধর্মনিরপেক্ষতার রাজনীতির পটভূমি তৈরিতে ব্যাপক অবদান রেখেছে। আওয়ামী লীগ যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার কথা কিংবা ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবার জন্য সুবিচার এই অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার কথা বলেনি এবং বুঝায়ওনি। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ইসলাম ও মুসলিম; ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আওয়ামী ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার যে প্রতিফলন ঘটেছিলো তাতে সবার জন্য সুবিচার অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো প্রমাণ মেলেনি। বরং ইসলামের নাম-গন্ধ-ছায়া সর্বোতভাবে বর্জনই ছিলো আওয়ামী ধর্মনিরপেক্ষতার নিখুঁত ও নিখাদ প্রমাণ।

তাই বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের জন্ম ও বিকাশে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দুর্দশার পাশাপাশি অর্থনৈতিক বৈষম্য, অবিচার ও যুলুম ব্যাপক অবদান রেখেছে!! এই দুর্দশার পেছনে আরো ছিলো তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্টির অহেতুক অর্থহীন অহং নিঃসৃত মুসলিম জাতিসত্তার প্রতি হিংসাত্মক আচরণ এবং শক্তির ভাষায় কথা বলার উগ্র প্রবণতা। সেই সাথে ইসলামী বিধানের বাস্তব জীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জ্ঞানগত দক্ষতার সীমাহীন অভাব। যা এক ধরণের মূর্খতার নামান্তর। এই মূর্খতাকে অহংয়ের চাদরে ঢেকে স্বৈরাচারী কর্মকান্ডকে বৈধতা দিতে চেয়েছিলো পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠি। অহংকারকে এবং অহংকারীকে আল্লাহর ভালোবাসেন না; তাই পরাজয়ের গ্লানি নিয়েই বিদায় নিতে হয়েছে তাদের। ইসলামের দোহাই দিয়েও আল্লাহর অনুগ্রহ পেতে ব্যর্থ হয়েছিলো তারা। কোনো ফায়দা অর্জন সম্ভব হয়নি। ১৯৫৬ সালে যে শাসনতন্ত্র তৈরি হলো, তাতে পাকিস্তানের নাম ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান রাখা হলো। কিন্তু শাসনতন্ত্রে এমন কোনো বিধান রাখা হলো না যার দ্বারা আইন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনাকে ইসলামীকরণ করা সম্ভব হয়। আইন ও জীবনাচরণের ক্ষেত্রে এই লক্ষ্যগত রাষ্ট্রীয় শূন্যতা বয়ে আনলো এক হতাশাব্যঞ্জক পরিবেশ। সেই হতাশাব্যঞ্জক পরিবেশে নব্য স্বাধীন সমাজ পরিমন্ডলে বিজাতীয় আদর্শ ও নীতি পাকিস্তানের তরুণ বুদ্ধিজীবিদের মন-মানসে সন্তর্পণে ক্রটির অনুপ্রবেশ ঘটালো



www.pathagar.com

এবং জাতিকে লক্ষ্যচ্যুতি ও পরিচয় বিকৃতির দিকে ঠেলে দিল। এভাবে একদিকে আদর্শিক শূণ্যতা অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষতার আবরণে ধর্ম বর্জনের আহ্বান ও ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার এবং প্রতিপক্ষের সব ইস্যুতেই যুক্তিপূর্ণ ও বস্তুনিষ্ঠ জবাবের পরিবর্তে পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠি কর্তৃক "ইসলাম গেল, ইসলাম গেল" আর্তনাদ, অথচ বাস্তব জীবনে নিজেদের ইসলাম চর্চার অভাব বিশেষভাবে তরুণদের উপর একটি নেতিবাচক বিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিলো। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দুর্দশা ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসনের একের পর এক অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ এবং ক্ষমতার প্রতি মোহের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ, পূর্ব পাকিস্তানী তরুণ সম্প্রদায়ের মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলো। এই আগুনে পুড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আব্দুল মালেকের শাহাদাত ছিলো পাকিস্তানী শাসকদের প্রতি জাতীয় আদর্শ রক্ষার সর্বশেষ আসমানী সতর্ক সংকেত। কিন্তু এই সংকেত উপলব্ধির মতো কোনো ব্যক্তি শাসকবর্গের মধ্যে দেখা যায়নি। তারপর শুধুই পরিস্থিতির ক্রমান্বয় অধঃপতন। পূর্ব পাকিস্তান উত্তাল। বিক্ষোভ হরতাল আর হানাহানিতে পাকিস্তানের ঐক্যের বুনিয়াদ দ্রুতই ধসে পড়ছিল। অবশেষে বিশ্বের ইতিহাসে নজিরবিহীন নারকীয় ভ্রাতৃহত্যাকান্ডে লিপ্ত হয়ে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসনের শোচনীয় পতন ঘটে। অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের।

"দেশ পরিচালনার জাতীয় আদর্শ, জাতীয় লক্ষ্য ও নীতিবোধের অনুপস্থিতি যেমন দেশের শাসকদের রাজনৈতিক অবিচার ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের দিকে ঠেলে দিয়েছিলো, তেমনি দেশ বিভাগের আগে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে যতটুকু রেনেঁসা হয়েছিলো, স্বকীয়তার ছাপ ছিলো, পাকিস্তান হওয়ার পর তা যেন উবে যেতে লাগলো আর সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে লাগলো। সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের এই বাম ও ধর্মনিরপেক্ষমুখিতা দেশের ভাষা, সাহিত্য ও রাজনীতিকে বিদেশমুখী, পরজীবি তথা কোলকাতামুখী করে তুললো।"[২৫]

কোলকাতামুখী পরজীবি সাহিত্য-সংস্কৃতির কিছু তৎপরতা তুলে ধরেছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক সাংবাদিক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন তাঁর "অতীত দিনের স্মৃতি" গ্রন্থে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কোটারীর রাজনৈতিক নির্যাতন এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং সেইসাথে আদর্শিক শূন্যতা - এর প্রতিক্রিয়ায় বাম ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবিদের কোলকাতা ও দিল্লীমুখী প্রবণতা এক দশকেরও কম সময়ের মধ্যে পাকিস্তানের ভিত্তিকে ধসিয়ে দিল এবং পরবর্তী দেড় দশকেই ভেঙ্গে গেল পাকিস্তান। আদর্শিক শূন্যতা বা দেউলিয়াত্ব এবং তার আন্তরিক

২৫. আবুল আসাদ, একশ' বছরের রাজনীতি, বাংলাদেশ সাহিত্য পরিষদ ঢাকা, ১৭১, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭,পৃ-২৯২।



www.pathagar.com

চর্চার অভাবই এই পতনের একটি অন্যতম কারণ ছিল। পাকিস্তানের কারাগার হতে মুক্তি পেয়ে লন্ডন ও ভারত হয়ে বাংলাদেশের বুকে পা রেখে তাঁর সম্মানে রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত সংবর্ধনা সভায় তিনি তা উল্লেখ করেছেন এভাবে ঃ

"আমার ভাই ও বোনেরা, প্রথমে স্মরণ করি আমার বাংলাদেশের ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবি, সিপাহী, পুলিশ, জনগণকে, হিন্দু- মুসলমানকে, হত্যা করা হয়েছে। তাদের আত্মার মঙ্গল কামনা করে এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি আপনাদের কাছে দুই-এক কথা বলতে চাই। আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে। আমার জীবনের স্বাদ আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার বাংলার মানুষ আজ মুক্ত হয়েছে। আমার বাংলা আজ .............. আমি আজ বক্তৃতা করতে পারব না। বাংলার ছেলেরা, বাংলার মায়েরা, বাংলার কৃষক, বাংলার শ্রমিক, বাংলার বুদ্ধিজীবি যেভাবে সংগ্রাম করেছে, আমি কারাগারে বন্দি ছিলাম, ফাঁসিকাষ্ঠে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু আমি জানতাম আমার বাঙালীকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না। আমার বাংলার মানুষ ........। প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোককে মেরে ফেলে দেয়া হয়েছে বাংলায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও এবং প্রথম মহাযুদ্ধেও এত লোক, এত সাধারণ নাগরিক মৃত্যুবরণ করে নাই, শহীদ হয় নাই, যা আমার এই সাত কোটির বাংলাদেশে হয়েছে। আমি জানতাম না আপনাদের মাঝে আমি ফিরে আসব। আমি খালি একটা কথা বলেছিলাম, তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলে দাও, আমার আপত্তি নাই, মৃত্যুর পরে আমার লাশটা আমার বাঙালির কাছে দিয়ে দিও, এই একটা অনুরোধ তোমাদের কাছে আমার রইল। তবে মনে রাখা উচিৎ বাংলাদেশ স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবে, বাংলাদেশকে কেউ দমাতে পারবেনা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সাত কোটি বাঙালিরে হে বঙ্গজননী রেখেছো বাঙালী করে, মানুষ করনি। কবিগুরুর কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেছে। আমার বাঙালি আজ মানুষ। জানতাম না আমার ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে। আমার ছেলের পাশে আমার কবর খুদা হয়েছে। আমি প্রস্তুত হয়েছিলাম, বলেছিলাম, আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি ...... মোসলমান একবার মরে, দুইবার মরে না। আমি বলেছিলাম আমার মৃত্যু আজ থাকে যদি, আমি হাসতে হাসতে যাব, আমার বাঙালিদের অপমান করে যাব না, তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইব না এবং যাবার সময় বলে যাব, জয় বাংলা, স্বাধীন বাংলা, বাঙালী আমার জাতি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলার মাটি আমার মা।"[২৬]

---

২৬. পাকিস্তানের কারাগার হতে মুক্তি পেয়ে বাংলাদেশের স্থপতি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান ভারত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান [সোহরাওয়ার্দী উদ্যান]-এ এক বিশাল সংবর্ধনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ-এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ [An ATN Bangla Production [DVD] "History of Liberation" Planning, Editing, Research, Collection & Directing by- DR. MAHFUZUR RAHMAN, Chairman ATN



www.pathagar.com

বাস্তবতা ও বিশ্লেষণ যাই হোক না কেন বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলেও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত কবি রবীন্দ্রনাথেরই হলো। হয়তোবা এখানেও আওয়ামী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিশ্বাস ও চেতনা অনুযায়ী কবি নজরুলের ইসলাম সম্পর্কিত হামদ, নাত-এ-রাসূল, গান, কবিতা বাধা হয়েছিলো। যেটা রবীন্দ্রনাথের ছিল না। রবীন্দ্রনাথের ইসলাম নিয়ে কোনো লেখা বা আগ্রহ কোনোটিরই কোনো চিহ্ন নেই। বরং হিন্দু ধর্ম নিয়ে কম-বেশি তাঁর লেখা রয়েছে। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনার দৃষ্টিতে এতে দোষের কিছু নেই। এতে কোনো অসুবিধে নেই। ইসলাম নিয়ে তাঁর কোনো লেখা নেই;- এটাই ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের গ্রহণযোগ্যতার জন্য যথেষ্ট। কেসস্টাডি-৪ এ এরই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দুর্দশা চলাকালে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার যে প্রপাগান্ডা চলছিল, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তা সম্পূর্ণ অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। ভারতের বুকে শেখ মুজিবুর রহমানের ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর দৃঢ় বিশ্বাসের ঘোষণা এবং পরবর্তীতে তা বাংলাদেশের সংবিধানে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করার মধ্য দিয়েই কার্যতঃ বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম হলো। যদিও এর ধারাবাহিতা শুরু হয় পাকিস্তানের জন্মের কিছুকাল পরেই। এমনকি অখণ্ড পাকিস্তানে "ধর্মনিরপেক্ষতা" চিন্তা চেতনার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন স্বয়ং কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ - এমনই মনে করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব তফাজ্জল হোসেন [মানিক মিয়া][২৭] এবং বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা জনাব বদরুদ্দীন উমর। যা কেস স্টাডি - ৭ ও ৮ এ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ নিয়ে ভিন্ন মাত্রার মতামতও রয়েছে। কায়েদে আযমের যে বক্তব্যকে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় তা ছিল ১৯৪৭ সালের ১১ আগষ্ট পাকিস্তান গণপরিষদে প্রদত্ত বক্তব্য। তিনি বলেছিলেন, "এই মৌল নীতি নিয়ে আমরা কাজ শুরু করছি যে, আমরা সকলে একটি রাষ্ট্রের নাগরিক। সকলে সমান নাগরিক। এখন আমি ভাবছি, আমাদের এই আদর্শকে আপনারা সামনে রাখুন এবং আপনারা দেখবেন এক সময় হিন্দু আর হিন্দু থাকছেনা; মুসলমান আর মুসলমান থাকছেনা; কারণ এগুলো প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার, রাজনৈতিকভাবে আমরা সকলেই একই রাষ্ট্রের নাগরিক।"[২৮] জনাব জিন্নাহ্র এই বক্তব্যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রতিফলন

---

Bangla, ATN Music Ltd. Dhaka Trade Center. 99 Kazi Nazrul Islam Avenue [3rd Floor], Kawran Bazar, Dhaka-1215. TEL- 9136288 Mobile-01199933431]

২৭. জীবনকাল ঃ ১৯১১-১৯৬৯।

২৮. 'Pakistan from Jinnah to Zia' Muhammad Munir, Document Press. New Delhi-110048, Page-53.



www.pathagar.com

হয়েছে মর্মে বলা হলে তা যৌক্তিক বলেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু পরবর্তী বছরই অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে তিনি মার্কিনীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেন, "আমি জানিনা পাকিস্তানে অবশেষে কি ধরণের শাসনতন্ত্র প্রণীত হতে যাচ্ছে, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে তা হবে গণতান্ত্রিক যার মূলে থাকবে ইসলামের মৌল নীতিমালা। ইসলামের এই নীতিমালা ১৩০০ বছর আগে যেমন ছিলো, এখন তেমনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। ইসলাম এবং তার আদর্শবাদই আমাদেরকে গণতন্ত্র শিখিয়েছে। ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে সাম্য, সুবিচার এবং সকলের প্রতি সুব্যবহারের নীতিমালা। আমরা ইসলামের এই মহান ঐতিহ্যের উত্তরসূরী এবং আমরা যারা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করছি তাদের মধ্যে এই বোধ জীবন্ত।[২৯] জনাব জিন্নাহ্‌র এই বক্তব্যে ধর্মনিরপেক্ষতার ধর্ম-বর্জনের যে চেতনা তথা ইসলাম বর্জনের চেতনাকে ধারণ করে, তা নেই। বরং ইসলাম যে ধর্ম, বর্ণ, রক্ত, বংশ নির্বিশেষে সামাজিক সুবিচার অর্থে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার কথা বলে থাকে, তারই প্রতিফলন এতে রয়েছে।

বিষয়টির অবতারণা করতে হলো এজন্য যে, বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদের যে সূচনা বা জন্ম তাতে কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ পরোক্ষভাবে কোনো অবদান রেখেছেন কি না তা যাচাই করে দেখা।

কেস স্টাডি - ৫ ও ৬ পর্যালোচনায় দেখা যায়, জনাব বদরুদ্দীন উমর আওয়ামী লীগকে গণবিরোধী ও অগণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পুঁজিবাদী শোষক শ্রেণীর স্বার্থ উদ্ধার করাই যাদের আসল উদ্দেশ্য এবং যারা জনগণকে শত্রুপক্ষ মনে করে তাদের ঘাড়ে চড়ে তাদেরকে নানাভাবে শোষণ করার ফাঁদ পাতছে অথচ যারা সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রবক্তা। ১৯৭২ সাল হতে চলমান ২০১২ পর্যন্ত সময়ে যারা আওয়ামী লীগকে পর্যবেক্ষণ করেছেন তারা জনাব বদরুদ্দীন উমর-এর বক্তব্যের সত্যতা যাচাইয়ের অবকাশ পেয়েছেন বলে নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

কেস স্টাডি -১০ এ পরিকল্পনা সচিবের মন্তব্য "বিসমিল্লাহ বললে কী হয়, প্রার্থনায় কিছুই হয় না" বস্তুতঃ কেস স্টাডি - ৯ এ উল্লিখিত নিরীশ্বরে বিশ্বাসী অক্ষয়কুমার দত্তের গাণিতিক সমীকরণেরই প্রতিফলন মাত্র। যে অক্ষয়কুমার আঠার শতাব্দীর সমসাময়িককালে তাঁর নিরীশ্বরে বিশ্বাসকে উক্ত সমীকরণ দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। পরিকল্পনা সচিবের উক্ত মন্তব্য এবং অক্ষয় কুমারের নিরীশ্বরবাদী সমীকরণ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের তথা সংবিধান সংশোধনের বা সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মূলনীতি হিসেবে গ্রহণের শেকড় রয়েছে

---

২৯. 'Pakistan from Jinnah to Zia' Muhammad Munir, Page-54.



www.pathagar.com

মূলতঃ আঠারো শতাব্দীর নিরীশ্বরবাদী ও একইসাথে মানুষকে জন্ম ও রক্তের ভিত্তিতে ঘৃণা করার দর্শন; অন্ত্যজ জীবন দর্শনের নিভৃতলালনকারী অক্ষয়কুমারের সমীকরণে। সেই বিবেচনায় নিরীশ্বরে বিশ্বাস ও অন্ত্যজ[৩০] চেতনার গর্ভে বাংলাদেশে আওয়ামী ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম।

## বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিকাশ

১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে গণপরিষদে পাকিস্তানের সংবিধান পাশ হয়; পাকিস্তানকে ইসলামিক রিপাবলিক ঘোষণা করা হয়। সে সময় আওয়ামী লীগ এই ঘোষণার বিরোধিতা করেনি।[৩১] অখণ্ড পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে তখন সেটাই ছিলো আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির ধরণ। পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে ওআইসির সদস্য হয়েই তার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বিশ্বের জাতিসমূহের মাঝে তার পথচলা শুরু করেছিল। শুরু করেছিল এক অপার সম্ভাবনার দেশ হিসেবে। কিন্তু তারপর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের একমাত্রিক জীবনবোধের ভিত্তিতে ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার নামে শুরু হয়েছিল জীবন থেকে শুধু ইসলামকে বিতাড়নের এক ব্যাপক রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি। ধর্মহীনতা আর বাধাহীন নৈতিকতার ঔদ্ধত্যে মানবতার আর্ত চিৎকার ছিল নিত্যদিনের চিত্র। শুধু বস্তুতান্ত্রিক একমাত্রিক জীবনবোধ ধর্মনিরপেক্ষতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, বর্বরতা ও নির্যাতনের সব রূপেরই সফল রূপায়নের মাধ্যমে বিকাশ হচ্ছিল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আদর্শের। এভাবেই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শিক বিকাশ ঘটছিল বাংলাদেশে। অসাম্প্রদায়িক চেতনসমৃদ্ধ মানবিক জীবনবোধ, জাগতিক সাফল্য ও দারিদ্র বিমোচনের সফল দৃষ্টান্ত মুহাম্মাদ [সাঃ]-এর দ্বিমাত্রিক [জাগতিক ও পারলৌকিক] জীবন ব্যবস্থায় থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জীবন দর্শনে ধর্মনিরপেক্ষতা ও তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক চেতনার একমাত্রিক জীবনবোধ বাংলাদেশকে নিক্ষিপ্ত করেছিল মানবেতর প্রাণীর সাথে ডাস্টবিনের খাবার প্রতিযোগিতা করে অর্জনের দরিদ্রতায় ও দুর্ভিক্ষে, সামাজিক অনাচার ও বর্বরতায়। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-রক্ত-বংশ নির্বিশেষে সব মানুষের জীবনেই রয়েছে কিছু অনিবার্য চাওয়া-পাওয়া। স্বচ্ছলতা-দরিদ্রতা সব জীবনেই সুখ কিংবা দুঃখের কারণ। জীবনের এই সর্বজনীনতা বিবেচনায় মহানবী [সাঃ]-এর ধর্মীয় ও জাগতিক

---

৩০. অন্ত্যজ - যার নীচ কুলে জন্ম, নীচকুলজাত, নীচ; আধুনিক বাংলা অভিধান, মোসলেমউদ্দিন আহমদ, ইফাবা, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-২ এবং আহমদ শরীফ সম্পাদিত, সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী ঃ অন্ত্য - শূদ্র; চন্ডাল। অন্ত্যজ - নীচ বংশজাত; শূদ্রকুলজাত। অস্পৃশ্য।

৩১. আবু আল-সাঈদ, আওয়ামী লীগের ইতিহাস [ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী ১৯৯৬], পৃ. ৬৪-৬৫।



www.pathagar.com

জীবনের সফলতার দৃষ্টান্ত বিশ্ব-নন্দিত। যারা মহানবী [সাঃ]-এর আনীত জীবন বিধান ইসলামের অন্ধ সমালোচনায় বুঁদ হয়ে আছে তাদের জীবনে, মানবজাতির ক্ষুধা-দারিদ্র মুক্তির জন্য কোন দৃষ্টান্ত নেই, কিছু হিংসামুখর কথামালার ফুলঝুড়ি ছাড়া। দেশে-বিদেশে এমন হিংসুক মানুষ মানবজাতির দুঃখ-দুর্দশার অন্যতম উপলক্ষ।

নিরীশ্বরে বিশ্বাস ও অন্ত্যজ চেতনার গর্ভে জন্মলাভকারী বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার বিকাশ বিবেচনা করা হয়েছে মূলতঃ ১৯৭২ সালে সংবিধান বলবৎ হবার পর হতে। আর এই বিকাশকে মূল্যায়ন বা বিশ্লেষণ বা চিহ্নিত করা হয়েছে দেশের আদর্শিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-প্রশাসনিক বিভিন্ন সেক্টরে এর যে চিহ্ন এখনও পাওয়া যায় তার পর্যালোচনাকেন্দ্রিক। এক্ষেত্রে কিছু প্রতীকি উদ্বৃতির সহযোগিতা নিতে হয়েছে বিষয়টির বিশ্বস্ততা প্রমাণের জন্য এবং উদ্বৃতি সমূহ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রামাণ্য ব্যক্তিদের উদ্বৃতিকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

**ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আদর্শিক বিকাশ ঃ**

যদি সব ধর্ম, বর্ণ, বংশ, গোত্র ও জাতীয়তা নির্বিশেষে মানবজাতির কল্যাণে কাজ করা ও পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতার সাথে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুবিচার করার মত আদর্শ পাওয়া যায় তবে সে আদর্শ কী রাষ্ট্রীয় আদর্শ হওয়া উচিত নয়? যদি জাগতিক ও পারলৌকিক সফলতার কোন একক আদর্শ পাওয়া যায় তবে সে আদর্শ কী রাষ্ট্রীয় আদর্শ হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়? যদি ধর্ম, বর্ণ, বংশ, গোত্র ও জাতীয়তা নির্বিশেষে যে কোন মানুষের মাঝে অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার মত আদর্শ পাওয়া যায়, তবে সে আদর্শ কী রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে বরণীয় হওয়া উচিত নয়? ইসলাম মানবজাতির জন্য তেমনি এক অনন্য আদর্শ। ব্যক্তিগতভাবে যে কোন মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য যেমন ইসলামের কোন বিকল্প নেই। তেমনি যে কোন জাতি ও রাষ্ট্রের জন্যেও ইসলাম এক অনন্য রাষ্ট্রীয় আদর্শ। তাই রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম নয় বরং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হবে অন্ত্যজ জীবনদর্শনের সংকীর্ণতামুক্ত ইসলাম এবং একমাত্র ইসলামেরই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য সুবিচার নিশ্চিত করার সক্ষমতা রয়েছে। আর রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে ইসলাম, রাষ্ট্রের নিরাপত্তায় যে নৈতিক, যৌক্তিক ও জাগতিক শক্তির যোগান দিতে সক্ষম অন্যকোন আদর্শের সে সক্ষমতা নেই। রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য আদর্শের চর্চা বাংলাদেশে অতীতে হয়েছে এখনও হচ্ছে। আর তার ফলাফলও অনুসন্ধিৎসু মানুষের কাছে অস্পষ্ট রয়ে যায়নি। এ বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডারের মূল্যায়ন ছিল এমন ঃ

"দলীয় জীবনে ... নেতা-কর্মীরা ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দেয়ার ফলে নৈতিকতার ক্ষেত্রে অবক্ষয় ঘটে, ব্যক্তিজীবনে আসে বিশৃংখলা এবং ধর্মীয় নৈতিকতা



www.pathagar.com

এবং মূল্যবোধে পরিচালিত সমাজদেহ থেকে নিজেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও সমাজে বসবাসরত জনগণকে ঐতিহ্যবাহী ইসলামী সাংস্কৃতিক জীবন এবং মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে মোটেও সক্ষম হয়নি। প্রচলিত পারিবারিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনধারা থেকে কেবল নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখলেই বিকল্প সংস্কৃতি জন্ম নেয় না, বরং এই ধরণের রণকৌশল অবলম্বন সমাজে প্রচলিত নীতি, নৈতিকতা, আচার-অনুষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রতি তাচ্ছিল্য, উপহাস এবং ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, যা প্রকারান্তরে ....... বিপক্ষে চলে যায়।

"ইসলাম ধর্ম এ দেশের শতকরা ৯০ জন গণমানুষের কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসই নয়, ইসলাম ধর্মভিত্তিক নীতি-নৈতিকতা, আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব-পর্ব, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং এদেশের সাধারণ গণমানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানান ঘটনার সাথে ইসলাম ধর্ম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জন্মপর্ব থেকে শুরু করে জানাযা পর্যন্ত ইসলামের নীতি-নির্দেশের আওতায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবন। এমন একটি জীবনাদর্শকে অবহেলা, উপেক্ষা কিংবা সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে চলার নীতিকে বাস্ত বসম্মত কিংবা বিজ্ঞানসম্মত বলা যায় না।"[৩২]

"বাংলাদেশের সমাজদেহে অন্যান্য বাস্তবতার সাথে ইসলাম ধর্ম হচ্ছে একটি জাগ্রত এবং জীবন্ত আবেগ। ইসলাম হচ্ছে একটি জীবন্ত এবং নিয়মিত অনুশীলিত একটি ধর্ম। ইসলাম এদেশের গণ-মানুষের কাছে একটি সার্বিক জীবনসত্তাবোধ। এই গণমানুষের মুক্তির প্রশ্নটি ঐ সার্বিক জীবনসত্তাবোধকে বাদ দিয়ে মীমাংসিত করার যে কোন প্রয়াসই অবৈজ্ঞানিক এবং অবাস্তব হিসেবে বিবেচিত হতে বাধ্য।"[৩৩]

"মার্কসবাদের অনুসারীদের জন্য নিজস্ব কোন নীতি-নৈতিকতা কিংবা সুনির্দিষ্ট কোন জীবনপদ্ধতি নেই। তর্কের খাতিরেই যদি ধরে নিই যে, বাংলাদেশে একটি মার্কসবাদী বিপ্লবের মাধ্যমে বামপন্থী বন্ধুরা ক্ষমতাসীন হলেন, তারা কি বিপ্লবোত্তরকালে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের যুগ যুগের ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সামাজিক এবং নৈতিক মূল্যবোধ ধুয়ে-মুছে ফেলে দিবেন, না প্রচলিত সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকেই বহাল রাখবেন? তারা কি এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ-ইসলামের অনুসারীদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বাতিল ঘোষণা করে দিতে সক্ষম হবেন? যদি কেউ বলেন হ্যাঁ তারা সক্ষম হবেন, এ ধরণের উক্তি হবে পাগলের প্রলাপেরই শামিল।"[৩৪]

---

৩২. মেজর [অবঃ] এম এ জলিল, কৈফিয়ত ও কিছু কথা, প্রকাশক- এফ রহমান, সাভার, ঢাকা। পৃ-৪ ও ৫।

৩৩. মেজর [অবঃ] এম এ জলিল, কৈফিয়ত ও কিছু কথা, প্রাগুক্ত। পৃ-৬।

৩৪. মেজর [অবঃ] এম এ জলিল, কৈফিয়ত ও কিছু কথা, প্রাগুক্ত। পৃ-৭।



www.pathagar.com

এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ - ইসলামের অনুসারীদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বাতিল ঘোষণা করে দিতে সক্ষম হবেন না বিধায় সর্বশেষ সংশোধনকৃত বাংলাদেশের সংবিধানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ধর্ম রাখা হয়েছে ইসলাম কিন্তু সংবিধান হতে 'আল্লাহর ওপর আস্থা'-র ঘোষণাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহর ওপর আস্থা নেই এমন ইসলামই হলো এখন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ধর্ম। আল্লাহর ওপর আস্থা নেই এমন ইসলামের অস্তিত্ব পৃথিবীতে কোথাও নেই। এমন একটি মরীচিকাবৎ প্রলাপ সদৃশ রাষ্ট্রীয় দর্শন - ধর্মনিরপেক্ষতা এখন বাংলাদেশের সংবিধানের অলংকার। যদিও এ বিষয়টি ১৯৭৫ সালেই একজন বিদেশী সাংবাদিক এন্থনী ম্যাসকারেন-হাস কর্তৃক সুস্পষ্টভাবেই মূল্যায়িত হয়েছিলো। তাঁর ভাষায়, " 'এক হাজার মসজিদের শহর' বলে ঢাকা বরাবরই গর্ব করেছে এবং বাঙালিরা ঐতিহ্যগতভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানীদের চেয়ে বেশী ধর্মানুরাগী। অপরদিকে বাঙালি মুসলমানেরা উপমহাদেশে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্রের পরিকল্পনা অবিচলিতভাবে সমর্থন করেছিলো বলেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল। এই পশ্চাদভূমিতে মুজিবের অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাংলাদেশের জনগণের বৃহত্তম অংশকে আহত করেছিল।"[৩৫] এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের ধর্মনিরপেক্ষতার মূলনীতিতে ফিরে যাওয়া মূলতঃ বাংলাদেশের জনগণের বৃহত্তম অংশকে অবজ্ঞা করার শামিল।

**শিক্ষাক্ষেত্রে বিকাশ ঃ**

ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থায় জীবনের কোনো সুস্পষ্ট লক্ষ্য নেই। পার্থিব জগতই একমাত্র লক্ষ্য। এ জগতে পাওয়া না পাওয়ার উপরই সফলতা-ব্যর্থতা নির্ভরশীল। ফলে এখানে নৈতিকতা হলো বস্তুকেন্দ্রিক। মানবিকতা কেন্দ্রিক নয়। ব্যক্তি তার চিন্তা ও কর্মে সম্পূর্ণ স্বাধীন; ব্যক্তিগত খেয়াল খুশির অধীন। ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা শিরক বা নাস্তিক্যবাদ ভিত্তিক। আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বে অবিশ্বাসপূর্ণ এ শিক্ষাধারা সম্পূর্ণ বস্তুবাদনির্ভর। শিক্ষার্থীদের বস্তুপূজারী ও ধর্মের প্রতি অহেতুক অসহিষ্ণু মনোভাব এবং উগ্র ধর্মবিরোধী করে তোলে। শিক্ষার বিষয়বস্তু রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ইচ্ছামত নির্ধারিত হয়। এ শিক্ষায় বস্তুর ঊর্ধ্বে কোন রকম চিন্তা-চেতনার স্থান নেই। অর্থই শিক্ষা অর্জনের নিয়ামক। যার অর্থ নেই তার শিক্ষা অর্জনের সুযোগ নেই। শিক্ষা সুযোগ, কোন অধিকার নয়। তবে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যহীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের কর্মসূচি গৃহীত হয়। চিরস্থায়ী আদর্শহীন বিধায় বিভিন্ন সময়ে শিক্ষানীতি পরিবর্তিত হতে থাকে। এতে জাতি কোন সুনির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছার সুযোগ পায়না। সর্বদাই ভাঙ্গা-গড়ার মহড়া চলে। শিক্ষা গ্রহণ ও

---

৩৫. এন্থনী ম্যাসকারেন-হাস, সানডে টাইমস, লন্ডন, ১৭ আগষ্ট, ১৯৭৫।



www.pathagar.com

দানের ক্ষেত্রে স্থায়ী আদর্শ না থাকাতে শিক্ষকের খেয়াল খুশীই আদর্শ। ফলে কোন আদর্শবাদী মানবিক চরিত্রের উন্মেষ যেমন ঘটে না তেমনি মূল্যবোধেরও ঐক্য থাকে না। মূল্যবোধের ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক অবস্থা বিরাজ করে। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিত্তশালী শ্রেণী, শিক্ষার সকল সুযোগ গ্রহণপূর্বক বিত্তহীনদের অধিকতর শোষণের সুযোগ পেয়ে থাকে। ধনী-দরিদ্রের মাঝে সংঘাত বা দ্বন্দ্ব সৃষ্টির মানসিকতা সৃষ্টি করে। শিক্ষক ছাত্রের মাঝে কেবল আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে জ্ঞান বিতরণ হয় বলে সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ দিন দিন নিঃশেষ হতে থাকে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা; সৌজন্য, ভদ্রতা, পরমতসহিষ্ণুতা বর্জিত এক ধরণের ফ্যানাটিসিজম এবং ফ্যাসিজমের জন্মদাতা।

যেখানে শিক্ষা সেখানেই নৈতিকতার পাঠ। শিক্ষা যখন অশিক্ষা-কুশিক্ষার নামান্তর হয়; তখন নৈতিকতাও এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। নৈতিকতা সবসময়ই শিক্ষার অনুগামী। নৈতিকতা ছাড়া যেমন কোনো মানুষ নেই; তেমনি শিক্ষা নিরপেক্ষ নৈতিকতার কোন অস্তিত্ব নেই। শিক্ষাই নৈতিকতার উৎস। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আমরা নৈতিকতার বহুরূপ দেখতে পাই। আর এর পেছনে রয়েছে শিক্ষার ভূমিকা। রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতার পৃষ্ঠপোষকতায় পাশ্চাত্য, ভারতীয় ইত্যাদি নানা আদর্শের শিক্ষা নানামুখী নৈতিকতা সৃষ্টিতে নিরলস অবদান রেখে যাচ্ছে এ দেশে। এ শিক্ষা যে শুধু আনুষ্ঠানিক তা নয়, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার অবদান এক্ষেত্রে সিংহভাগ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীরা যতটুকু নৈতিকতার পাঠ পায় তার চেয়ে বেশি পায় টিভি, মুভি, ইন্টারনেট এসব অনানুষ্ঠানিক Education Source হতে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্যহীনতায় এমন একটি সমাজ ক্রমশঃ গড়ে উঠছে বা উঠেছে যেখানে নাগরিকদের মাঝে চিন্তার কোনো ঐক্য নেই। নৈতিকতার ঐক্য নেই। বাংলাদেশে বর্তমানে অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি কার্যতঃ ম্যাকিয়াভেলীর শৃগাল ও সিংহের নৈতিকতাসম্পন্ন পাশবিক সমাজ গঠনের বিকাশ ঘটাচ্ছে এবং সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে নৈরাজ্য, রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা, খুন-খারাবি, গুম, ছিনতাই-রাহাজানি, সম্ভ্রমহানি আর ধনী-দরিদ্রের অর্থনৈতিক বৈষম্যের আকাশ ছোঁয়া ব্যবধান। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আদর্শের কারণে চূড়ান্তভাবে বাংলাদেশ একটি ঐক্যবদ্ধ জাতির পরিবর্তে একটি দ্বিধাবিভক্ত জাতি হিসেবে বেড়ে উঠছে। বিগত ৪০ বছরেও এ অবস্থার অবসান হয়নি। অবস্থাদৃষ্টে যে কোন বিদগ্ধ ব্যক্তির মনে হতে পারে বাংলাদেশ এক অজানা গন্তব্যের পথে চলছে।

ইসলামকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ না করায় ৪০ বছরেও কোনো কাঙ্ক্ষিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭৪ সনে ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছিলো। কিন্তু বাংলাদেশের মুসলিম জাতিসত্তার চিন্তা-চেতনার



www.pathagar.com

পরিপন্থী হওয়ায় তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। পরবর্তী কালে আরো কয়েকটি শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছিলো। কিন্তু ড. কুদরাত-ই-খুদা কমিশন প্রণীত শিক্ষানীতি অবলম্বন করে এগুতে গিয়ে সেই কমিটিগুলোও জাতীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি। কিন্তু কুদরাত-ই-খুদা কমিশন কর্তৃক প্রণীত এবং জাতি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত সেই শিক্ষা নীতিকেই ভিত্তি বানিয়ে অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ২০০৯ কর্তৃক সুপারিশের আলোকে নতুন শিক্ষানীতি সম্প্রতি দেশে চালু করা হয়েছে। যা 'সেক্যুলার ও গণমুখী' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশে গণমুখী শিক্ষা বলতে মুসলিম জনসাধারণের কাঙ্খিত শিক্ষাকে বুঝায়। অন্যদিকে সেক্যুলার বলতে ধর্মবর্জিত তথা ইসলামবিহীন এদেশের মানুষের ইসলামী চেতনা বিরোধী শিক্ষাকেই বুঝায়। ফলে বর্তমান শিক্ষানীতি একটি স্ববিরোধী ও প্রতারণামূলক শিক্ষানীতিতে পর্যবসিত হয়েছে। ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের প্রাক্কালে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি অঙ্কশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র ও ব্যাকরণ শিক্ষার প্রচলন ছিল। মুসলিম শাসনের আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। মক্তব ও মাদ্রাসা, মাসজিদ ও মঠ এবং ব্যক্তিগত বাড়িতেও শিক্ষা কর্ম চলতো এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্ণ-গোত্র-ধর্ম নির্বিশেষে সবার সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্থায়ী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে সে শিক্ষানীতি পরিচালিত হওয়ায় দীর্ঘ মুসলিম শাসনামলে শিক্ষানীতিতে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন করতে হয়নি। কিন্তু, বৃটিশ শাসনের পত্তন হবার পর হতে এদেশের তথা এ উপমহাদেশের শিক্ষানীতির ইতিহাস সদা পরিবর্তনশীলতার ইতিহাস। তার কিছু নমুনা উল্লেখ করছি ঃ এডামস রিপোর্ট (১৮৪৪); উডস ডেসপাস (১৮৫৪); হান্টার কমিশন (১৮৮২); লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কার (১৮৯৮); স্যাডলার কমিশন (১৯১৭); সার্জেন্ট পরিকল্পনা (১৯৪৪); আকরাম খান কমিটি (১৯৫২); আতাউর রহমান খান কমিশন (১৯৫৭); শরীফ কমিশন (১৯৫৮); এয়ার মার্শাল নূর খান শিক্ষা কমিশন (১৯৬৯); জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ এবং সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ২০০৯। শিক্ষা নীতিতে এই অস্থিরতা ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা-চেতনা উদ্ভূত। শিক্ষানীতির এই অস্থিরতা মাঠ পর্যায়ে নিয়মিতভাবেই যে নজির উপস্থাপন করে যাচ্ছে তার একটি প্রতীকি চিত্র 'কয়লার ময়লা' শিরোনামে জনপ্রিয় দৈনিক 'বাংলাদেশ প্রতিদিন'-এর সম্পাদকীয় হতে নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

"মাঝে মাস কয়েক ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা কিছুটা দমে ছিল। একেবারে না দমলেও কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকার আলামত পাওয়া যাচ্ছিল। গত কয়েক মাস তাদের চাঁদাবাজি, ছিনতাই, লুটতরাজ, টেন্ডারবাজির মতো কলঙ্কজনক কর্মকান্ডের সিরিজ খবর আগের মতো গণমাধ্যমে দেখা যায়নি। তারা হেদায়েত হয়েছেন বা শোধরে আসতে শুরু করেছে বলে আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন অনেকে। ধোয়ামোছায় তাদের ময়লা সাফ



www.pathagar.com

হতে শুরু করেছে বলে আশা করা যাচ্ছিল। কিন্তু সেই আশাবাদে ঘা দিয়ে সোমবার তারা জানিয়েছে, না ময়লা যায়নি। কয়লার ময়লার মতো সেদিন তারা ফের দেখিয়েছে শৌর্যবীর্যের নমুনা। খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-কুয়েটের একটি ছাত্রাবাসে বার্ষিক ভোজের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় ও বহিরাগত ছাত্রলীগ কর্মীরা দাঙ্গায় লিপ্ত হয়েছে। পরিস্থিতির অনিবার্যতায় কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং ছাত্রাবাস বন্ধ ঘোষণা করতে। এদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি চত্বরেও ছাত্রলীগ কর্মীরা নিজেদের মধ্যে শক্তির মহড়া দিয়েছে। সিনিয়র এক ছাত্রলীগ কর্মীকে আধামরা করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে জুনিয়ররা। তার মাথায় সেলাই লেগেছে মাত্র ১৪টি। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়-বুয়েটেও সেদিন ঘটেছে দুঃখজনক ঘটনা। সন্ত্রাসসহ বিভিন্ন অপকর্মে অভিযুক্ত তিন ছাত্রলীগ কর্মীকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কারের দাবীতে ভিসি-প্রোভিসির কার্যালয় অবরুদ্ধ করেছে শিক্ষার্থীরা। ওই তিনজনকে সোমবার ছয় মাসের জন্য বহিষ্কার করা হলেও শিক্ষার্থীরা তা মানছিল না। তাদের দাবী, স্থায়ী বহিষ্কারাদেশ। তার আগের দিন রবিবার রাতে ছাত্রলীগ হিম্মত দেখিয়েছে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক গ্রুপের দুই শিক্ষার্থীকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে আহত করেছে অপর গ্রুপ। বিক্ষুব্ধ কর্মীরা আহতদের হাসপাতালে নেওয়ার জন্য মাইক্রোবাস চেয়ে না পাওয়ায় প্রশাসনিক ভবনে হামলা ও গাড়ি ভাঙচুর করেছে। একই দিনে সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রলীগ পিটিয়েছে শিবিরকে। বনভোজনের ম্যানু কী হবে এ নিয়ে ছাত্রলীগের খবরদারি মানতে চায়নি শিবির। তাই শিবিরকে শিক্ষা দিয়েছে ছাত্রলীগ কর্মীরা। দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ ধরণের কার্যকলাপের মাধ্যমে ছাত্রলীগ ফের যে ময়লা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে তা শুধু দুঃখজনক নয়, উদ্বেগজনকও।"[৩৬]

**ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিকাশ ঃ**

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিকাশকে তুলে ধরতে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ সরকারের সাথে ভারতের আচরণ এবং বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূলনীতির পুনরুদ্ধারকারী সরকারের প্রতি ভারতের মনোভাবকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

**প্রথমতঃ স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ সরকারের সাথে ভারতের আচরণ ও মনোভাব বিশ্লেষণ ঃ**

বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র রচনার পর তাতে ভারতীয় কংগ্রেসের চারটি আদর্শিক স্তম্ভ - সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র শাসনতন্ত্রের মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হওয়ায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, কার্যতঃ স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিবর্তে ভারতীয়

---

৩৬. সম্পাদকীয়, কয়লার ময়লা, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ঢাকা; বুধবার, ৪ জানুয়ারি ২০১২; পৃ.-০৪।



www.pathagar.com

আধিপত্যবাদী যুদ্ধে পর্যবসিত হয়ে পড়ে এবং বাংলাদেশ এক নতুন শোষক গোষ্ঠির অধীনস্থ হয়ে পড়ে। ফলে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ভারতবিরোধী চেতনার বিকাশ ঘটে। নতুন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রশ্ন জনমনে উত্থাপিত হয়। এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের তৎকালীন সরকার ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যাহার নিশ্চিত করেছিলেন। বাংলাদেশের নিরাপত্তার প্রশ্নে ভারতীয় বাহিনী প্রত্যাহার করার ক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধুর মতই ভূমিকা রেখেছিলেন তখন। "শেখ মুজিবুর রহমান ইন্দিরা গান্ধীকে স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন, একাত্তরের সাত দফা চুক্তি তিনি মানেন না [১৯৭১ সালে দুর্যোগের ঘনঘটার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের শরণার্থী সরকার ভারতের সাথে একটা সাত দফা চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছিল। সে চুক্তিতে শর্ত ছিল, স্বাধীন হলে বাংলাদেশের স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি থাকবে না। অর্থাৎ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হবে দিল্লির নির্দেশে। এমনকি দিল্লি যদি আরবদের স্বার্থের বিরুদ্ধে ইসরাইলের সাথে হাত মেলাত তাহলেও। দিল্লি চুক্তিতে আরো শর্ত ছিল, বাংলাদেশের নিজস্ব কোনো সশস্ত্র বাহিনী থাকবে না, তার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব থাকবে ভারতের হাতে। চুক্তিতে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী গঠিত ও পরিচালিত হবে ভারতীয় বিএসএফ বাহিনীর পরামর্শে।]।"[৩৭] ১৯৭১-এর দুঃসময়ে ওই সাত দফা চুক্তি কি বন্ধুত্বের নিদর্শন নাকি আধিপত্যের দাসখত তা আশাকরি পাঠককে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই এবং বাংলাদেশের প্রতি ভারতের মনোভাব এতে নগ্নভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমানের সেই ঐতিহাসিক ভূমিকার পর ভারত, বন্ধুর ছদ্মাবরণে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে বার বার অরক্ষিত রাখতে নিরলসভাবে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। তার প্রথম পদক্ষেপ ছিল পরীক্ষামূলকভাবে "ফারাক্কা" বাঁধ চালু। কৃতজ্ঞচিত্তে শেখ মুজিবুর রহমান ভারতকে অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু ভারত কৃতঘ্নের পরিচয় দিল। বাংলাদেশের কৃতজ্ঞতার বিপরীতে ভারত বাংলাদেশকে পানিতে মারার কৌশল অবলম্বন করল। ১৯৭৪ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ৩৭ বৎসর যাবৎ এ পরীক্ষা আর শেষ হয়নি। বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে বাংলাদেশকে বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে দেয়ার আগ পর্যন্ত এ পরীক্ষা চলতেই থাকবে। ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত ঘিরে সম্ভাব্য সকল নদীর উপর ভারত বাঁধের পর বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশকে মরুভূমি বানিয়ে বন্ধুত্বের ঋণ শোধ করে নিচ্ছে। ফারাক্কা বাঁধ চালুর পূর্বে "পরীক্ষামূলক" শব্দটি ব্যবহার করে যে আন্তর্জাতিক সৌজন্যবোধ ভারত দেখিয়েছিল এখন তাও আর দেখানোর কোন প্রয়োজনবোধ করে না। ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের ফলে ভারতীয় আধিপত্যবাদের স্বপ্নভংগ,

---

৩৭. অধ্যাপক রাজ্জাক ও উপমহাদেশের রূপরেখা, সিরাজুর রহমান, দৈনিক নয়া দিগন্ত, মঙ্গলবার, ০১ ফেব্রুয়ারী ২০১১, পৃ-৬।



www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গের মতই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে ভারতীয় কর্পোরেট মহলে। এ যেন, হায়! শিকার হাতছাড়া হয়ে গেল যে! আর তাই বন্ধুত্বের আবরণে বাংলাদেশকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে পরাজিত করার কৌশল নিয়েছে ভারত। বাংলাদেশের ৩৯ বৎসরের ইতিহাস, বন্ধুর ছদ্মাবরণে ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে পরাজিত করার সংগ্রামের ইতিহাস। ন্যায়সংগত যুদ্ধে বিজয়ী বাংলাদেশ এখনও অপরাজিত। কিন্তু তার নিরাপত্তা আধিপত্যবাদের নিশানায় পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন আজ তাই এদেশের জনগণের উৎকণ্ঠায় পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা যে আধিপত্যবাদী ভারতের নিশানায় পরিণত হয়েছে তার সামান্য কিছু তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরলাম ঃ

০১. ২৫ জুলাই ২০০৯ সাল। জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত এক গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনায় নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শেখ তৌফিক-এর উপস্থাপিত তথ্য ছিল এমন: "ভারত সরকার তাদের পররাষ্ট্র নীতি হিসেবে যা গ্রহণ করে আসছে তা ২৪০০ বছর আগের কৌটিল্য প্রদত্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসনব্যবস্থার জন্য প্রণীত বৈদেশিক নীতি, যার মূল কথা হলো - 'হয় আধিপত্য কর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ওপর অথবা আধিপত্যের শিকার হও।' কৌটিল্যের মতে, কূটনীতি হলো যুদ্ধের আরেকটি হাতিয়ার, সে যুদ্ধ হয় চলছে অথবা যার জন্য পরিকল্পনা করা হচ্ছে। অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তারের পদ্ধতির ব্যাপারে তিনি অসত্য ভাষণ, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দান, গুপ্তচরবৃত্তির ক্ষেত্রে নিজের স্ত্রীকে অনৈতিকভাবে ব্যবহারসহ বিভিন্ন কূটকৌশল প্রয়োগের কথা বলেছেন, যা এখন পর্যন্ত চাণক্যনীতি নামে পরিচিত। কৌটিল্যের সময় থেকে গত দুই হাজার বছরের অধিককাল ধরে ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকরা একই আধিপত্যবাদী বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করে আসছেন।[৩৮]"

০২. ভারত বাংলাদেশের উজানে স্থায়ীভাবে গঙ্গা নদীতে ফারাক্কা বাঁধ, তিস্তায় গজলডোবা বাঁধ, মনু নদীতে নলকাথা বাঁধ, খোয়াই নদীর উপর চাকমাঘাট বাঁধ, বাংলাবন্ধে মহানন্দা নদীর ওপর বাঁধ, গোমতী নদীর ওপর কলসী বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করেছে। এছাড়া আরো ১৫টি নদীর ওপর অস্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করেছে। বাংলাদেশের ক্ষতি হবে জেনেও ভারত মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প হাতে নিয়ে বহুদূর এগিয়ে গেছে।[৩৯]

---

৩৮. দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২৬ জুলাই, ২০০৯ সংখ্যা।

৩৯. ভারত রাষ্ট্রের স্বরূপ -এম রহমান, দৈনিক নয়া দিগন্ত, শুক্রবার, ২৪ ডিসেম্বর ২০১০, পৃ-০৭।



www.pathagar.com

০৩. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেনানায়ক ফিল্ড মার্শাল মানেক শ'-র ভাষায়, "আমাদেরকে সত্যাশ্রয়ী হতে হবে। বাংলাদেশীদের প্রতি আমরা সঠিক আচরণ করিনি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের সব রকমের সাহায্য করা উচিৎ ছিল। কিন্তু আমাদের রাজনীতিবিদরা তা করেননি। তারা বেনিয়ার মতো আচরণ করেছেন।"[৪০]

০৪. ভারতের সাথে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, চীন, নেপাল ও ভূটানের সীমানা রয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি মানুষ হত্যা করা হয় বাংলাদেশ-ভারত সীমানায়। "প্রশ্ন হচ্ছে, আর কত লাশ পড়লে বন্ধ হবে বিএসএফের হত্যাযজ্ঞ? প্রতিবছর বিভিন্ন পর্যায়ের বৈঠকে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে বাংলাদেশ উদ্বেগ জানালে ভারত হত্যা বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অব্যাহতভাবে চলছে এ হত্যাকাণ্ড। ... প্রতিশ্রুতি দেয়ার পরও বাংলাদেশী হত্যা বন্ধে ভারতের আন্তরিকতা প্রশ্নবিদ্ধ। আর নিরপরাধ লোকজনের হত্যা রোধে বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপও যথেষ্ট নয়। বিশেষ করে ফেলানীর মৃত্যুর ৪৮ ঘন্টা পরও পররাষ্ট্র কিংবা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সক্রিয় হতে দেখা যায়নি। এ অবস্থায় আমরা আর কত ফেলানীর স্বপ্ন চুরমার হওয়ার দর্শক হয়ে থাকব?"[৪১]

০৫. ভারতের কাছে 'বাংলাদেশ ও তার সরকারের মূল্য' কিশোরী 'ফেলানী'-র চেয়ে বেশি নয়। বাঁচার অধিকার, শিশু অধিকার, নারী অধিকার - "কোন অধিকারের যুক্তিই ফেলানীকে পাখির মত গুলি করে মারা থেকে যেমন বাঁচাতে পারেনি"[৪২] - তেমনি ভারতীয় কর্পোরেট মহলের কাছে বাংলাদেশের মাথা উচু করে দাঁড়াবার কোন অধিকার স্বীকৃত নয়।

০৬. ভারতীয় বুদ্ধিজীবী কে. সুব্রামোনিয়াম লিখেছেন, "This country [i.e.India] with its population, size, resources and industrial output will be a dominant country in the region just as USA and Soviet Union and China happen to be in their respective areas. This is a fact of

৪০. দ্য স্টেটসম্যান, ২৯ এপ্রিল ১৯৮৮।

৪১. শাসকের কানে পৌঁছায় না ফেলানীর বাবার বিলাপ! সংবাদ বিশ্লেষণ, রাহীদ এজাজ, দৈনিক প্রথম আলো, সোমবার, ১০ জানুয়ারী ২০১১, পৃ. ০১-০২।

৪২. দৈনিক প্রথম আলো, বুধবার, ১২ জানুয়ারী ২০১১।



www.pathagar.com

geography, economics and technology. অর্থাৎ পুরো দক্ষিণ এশিয়া বাধ্য হয়ে একদিন তার সংগে মিশে যাবে।"[৪৩]

**দ্বিতীয়তঃ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূলনীতির পুনরুদ্ধারকারী বর্তমান সরকারের প্রতি ভারতের মনোভাব বিশ্লেষণ ঃ** এই বিশ্লেষণের জন্য ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার প্রধানের [শেখ হাসিনা] ভারত সফরের পর আনন্দবাজার গ্রুপের 'দেশ' পত্রিকার বৈদেশিকী পাতায়, পুষ্পল গঙ্গোপাধ্যায় 'হাসিনার ভারত সফর ঘিরে পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে দু'দেশের সম্পর্ক' শীর্ষক প্রতিবেদনকে এখানে উপস্থাপন করা হলো। জনাব পুষ্পল গঙ্গোপাধ্যায়ের উক্ত প্রতিবেদনে ভারত সরকারের মতামত প্রতিফলিত হয়েছে মর্মে বিবেচনা করার সুযোগ না থাকলেও ২০০৯ হতে ২০১২ সাল পর্যন্ত মোট ৪ [চার] বছরে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ এবং ভারতের উদ্যোগ পর্যবেক্ষণ করলে পুষ্পল গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই প্রতিবেদনকে ভারত সরকারের মতামত প্রতিফলিত হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়।

০১. জনাব পুষ্পল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, "চীন এবং পাকিস্তান, এই দুই 'সন্দেহজনক' প্রতিবেশীকে নিয়ে নয়াদিল্লির মাথাব্যথার অন্ত নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মসনদে আওয়ামী লীগ এবং শেখ হাসিনার পুনরাগমন ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী প্রক্রিয়াকে একটি উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ভারতের বিদেশমন্ত্রকের অন্যতম সংকল্পকে ত্বরান্বিত করেছে।" বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে উক্ত প্রতিবেদনে তাঁর মন্তব্য ছিল এমন : "মুজিব কন্যা চিরকালই 'ভারতপন্থী'। এই মর্মে তাঁর দিকে বহু সমালোচনা ধেয়ে এসেছে। এমনকি শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক সফরকে 'ব্যর্থ' হিসেবে অভিহিত করেছে বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল, 'বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি'। কিন্তু হাসিনা পিছু হঠছেন না।"

০২. জনাব পুষ্পল তার প্রতিবেদনে আরো বলেছেন, "তিস্তার প্রবাহ কমে যাওয়ায় নিদারুন জলসংকটের মুখে পড়েছে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ভারতীয় কূটনৈতিক মহলের হাবভাবেই পরিস্কার, সে দেশের সংকটজনক পরিস্থিতির সমাধান করতে তাঁরা আগ্রহী। এরই পাশাপাশি আছে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ঘাটতির সময়ে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি। ১০০ কোটি ডলার অর্থ সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে ভারত। দু'দেশের মানুষকে আরও কাছে আনতে ভারত-বাংলাদেশ ২০১১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী একসঙ্গে উদ্‌যাপন করবে। অর্থাৎ সমঝোতার রাস্তাটিকে সুগম

---

৪৩. ড. হাসান মোহাম্মদ, বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার আলোকে করিডোর ট্রানজিট-ট্রানশিপমেন্ট, ইউনিভার্সিটি পাবলিশার্স, চট্টগ্রাম, জুলাই ২০০০, পৃ. ৭৪।



www.pathagar.com

করতে চেষ্টার কোনও কসুর করছেন না ভারতের কূটনৈতিক মহল।" [ কিন্তু, জানামতে তিস্তার পানি, ১০০ কোটি ডলার অর্থ সাহায্য কিছুই আলোর মুখ দেখেনি। উপরন্তু বাংলাদেশের জাতীয় কবি নয়; কিন্তু বিশ্বকবি খ্যাত রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বাংলাদেশের জনগণের অর্থ ব্যয় হয়েছে অফুরন্ত। আর ভারতকে করিডোর দেয়া হয়েছে বিনা মাশুলে। ভারতকে করিডোর দেয়ার আগে সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা বলেছিলেন, ট্রানজিটের আয় দিয়ে বাংলাদেশ সিঙ্গাপুরে পরিণত হবে। মানুষের রুটি-রুজির ব্যবস্থা হবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বিনা মাশুলে করিডোর দিয়ে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের রাস্তা-ঘাট ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বলা হচ্ছে, কুলিগিরি এবং নৌকা ও ট্রাক ভাড়া থেকে আয় করতে হবে। অর্থাৎ ভারতের ট্রাক ড্রাইভারদের জন্য রাস্তার পাশে চায়ের দোকান দিয়ে এ দেশের জনগণকে আয় করতে হবে। মাশুল নেয়া অসভ্যতা আর অকৃতজ্ঞতার শামিল। প্রকারান্তরে করিডোরের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব পদদলিত হয়েছে।]

০৩. জনাব পুষ্পল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের আর চোরাচালানের মতো গর্হিত কাজ হচ্ছে মর্মে উল্লেখ করে বাংলাদেশকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। ক্ষমতায় আসার পর শেখ হাসিনার বিভিন্ন কর্মসূচি ভারতের পক্ষেই লাভজনক হয়েছে মর্মে তিনি তার প্রতিবেদনে তুলে ধরেন। তার ভাষায়, "আলফা চেয়ারম্যান অরবিন্দ রাজখোয়াকে ঢাকার কাছ থেকে 'অপ্রত্যাশিত উপহার' হিসেবেই পেয়ে গিয়েছে নয়াদিল্লি। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, চোরাচালানের মতো গর্হিত কাজে। সুতরাং সন্ত্রাস দমনে বাংলাদেশ যদি কড়া পদক্ষেপ নেয়, লাভ হবে নয়াদিল্লিরই। অন্তত একটি বিশেষ এলাকা বরাবর সন্ত্রাসবাদী গতিবিধি বন্ধ করতে সফল হবে ভারতের কূটনৈতিক মহল। তা ছাড়া, অনেক অপরাধীকে প্রত্যর্পন করার প্রতিশ্রুতিও বাংলাদেশের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে। ক্ষমতায় আসার পর শেখ হাসিনার বিভিন্ন কর্মসূচি ভারতের পক্ষেই লাভজনক হয়েছে। যেমন, বাংলাদেশের মাটিতে গড়ে ওঠা বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীর ঘাঁটিকে ভেঙে দেওয়া। ভারতকে তাদের বিভিন্ন বন্দর ব্যবহার করার প্রতিশ্রুতি দিলেও, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের কার্যকর ভূমিকাই ভারতের কাছে বেশি কাম্য। সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সঙ্গে অনুপ্রবেশের বিষয়টিকে আমল দিলে ভাল করবে দু'পক্ষই। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর অনুপ্রবেশ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। নজরদারি এড়িয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে অনায়াসে এপার-ওপার করছে চোরাচালানকারী, সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠির সদস্যরা। সুতরাং এ বিষয়ে সুষ্ঠু



www.pathagar.com

নীতি থাকলে দু'দেশের সীমান্ত হবে শান্তিপূর্ণ এবং নিরাপদ। বাংলাদেশে ঘাঁটি গেড়ে ভারত বিরোধী কাজকর্ম করতে দেবেন না তিনি, হাসিনার এই ঘোষণা নয়াদিল্লির কাছে স্বাগত। শেখ হাসিনার সফর ঘিরে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনার জন্য কৃতিত্ব অনেকাংশেই মুজিব কন্যার। বাংলাদেশের সমর্থনের অভাবে নয়াদিল্লির কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু সেই আশঙ্কা কিছুটা হলেও দূর হয়েছে। হাসিনার কাছে ভারত চিরকালই একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাটিল তাঁর হাতে তুলে দিলেন শান্তি, নিরস্ত্রীকরণ এবং উন্নয়নের জন্য ইন্দিরা গাঁধী পুরস্কার [ ২০০৯ ]। ১৯৭৫ সালে একটি সামরিক অভ্যুত্থানে পরিবারের বহু সদস্যকে হারানোর পর দেশের মাটিতে পা রাখতেও অপারগ ছিলেন হাসিনা। সেইসময় তাঁকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেন ইন্দিরা গাঁধী। দিল্লিতে ছ'বছর কাটান তিনি। হাসিনা স্বীকার করেছেন, মা'র মতোই ভারতীয় ভূখণ্ড আশ্রয় দিয়েছিল তাঁদের। তাঁর এই বক্তব্যেই ধরা পড়ে এদেশের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা, অনুরাগ। হয়তো রাজনীতিতে আবেগের স্থান নেই। কিন্তু হাসিনার সঙ্গ ছাড়তে চায় না দিল্লি। তাঁকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে ভারতের কূটনৈতিক কার্যকলাপের সিংহভাগ। ভবিষ্যতে উপমহাদেশের রাজনীতিতে নয়াদিল্লির অবস্থানকে যা মজবুত করবে।"

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং চোরাচালানী বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে এর পুরো দায় জনাব পুস্পল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলাদেশের উপরেই দিয়েছেন। এখানে যা কিছু করার তা বাংলাদেশকেই যেন শুধু করতে হবে। বাংলাদেশেরই শুধু করার আছে। ভারতের কিছুই করার নেই এবং ভারত, সীমান্তে কোনো দুর্বৃত্তপনা করছে না। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হতে এসব বিষয়ে নীরবতা পালনের ফলে এসব বক্তব্য সরকারী পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য হয়েছে প্রতীয়মান হয়। তাতে ভারত সরকার বাংলাদেশ সীমান্তে যা করছে তার সবই যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয়। ফলে বাংলাদেশ সরকারের কাছে এসব দুর্বৃত্তপনা ও দস্যুতা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে বিবেচিত হয় না। ষোলো কোটি মানুষের 'মরণফাদ' ফারাক্কা-মিনি ফারাক্কার প্রতিক্রিয়ায় দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তীর্ণ সবুজ-শ্যামল অঞ্চল আধা-মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। বিশাল জলরাশি পদ্মার বুকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র বদলে তাদেরই বদান্যতায় [!!!] আজ শুষ্ক মওসুমে 'গরুর গাড়ি' চলে। সেচের অভাবে লাখ লাখ একর জমি অনাবাদী পড়ে থাকে। বন, মৎস্য, পশুসম্পদ ও পরিবেশ আজ ধ্বংসের মুখোমুখি। উজানে ভারত সরকারের তৈরি ফারাক্কা বাঁধের কারণে আটত্রিশ বছর ধরে পদ্মার পানি প্রবাহ ভয়াবহভাবে কমে যাওয়ায় বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের



www.pathagar.com

উপকূলীয় জিলাগুলো সমুদ্রের লোনাপানিতে সয়লাব হয়। লোনাপানির কারণে লাখ লাখ একর জমির ফসল বিনষ্ট হয়, মিঠাপানির মৎস্যসম্পদ ধ্বংস হয়। ফারাক্কার বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় সুন্দরবনের বনাঞ্চলের অনেক অংশ ইতোমধ্যে উজাড় হয়েছে। উত্তরাঞ্চলে নিয়মিত খরা এবং দক্ষিণের বনাঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য মারাত্মকভাবে বিনষ্ট হয়েছে। সীমান্তের ওপারে পদ্মার [গঙ্গার] ওপর ফারাক্কা এবং তার উজানে আরো শত শত ছোট-বড় বাঁধের কারণে বাংলাদেশের প্রায় পাঁচ কোটি মানুষের অস্তিত্ব আজ বিপন্নপ্রায়। সিলেট সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করা সাত অভিন্ন নদীতে বাঁধ, ড্যাম ও স্লুইস গেট নির্মাণ করে পানি আগ্রাসন চালাচ্ছে ভারত। ফলে ভারত থেকে আসা নদীগুলো বাংলাদেশে ঢুকে মরা খালে পরিণত হচ্ছে। সর্বশেষ সিলেটের জৈন্তাপুরের সারি নদীর উজানে মাইনথু নদীতে ড্যাম নির্মাণ করে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সিলেট অঞ্চলের অভিন্ন নদীতে ভারত একের পর এক বাঁধ নির্মাণ করলেও সরকার, ভারতের সব কিছুতেই নীরব। কারণ, জনাব পুষ্পলের ভাষায়, "ক্ষমতায় আসার পর শেখ হাসিনার বিভিন্ন কর্মসূচি ভারতের পক্ষেই লাভজনক হয়েছে। ...... হাসিনার কাছে ভারত চিরকালই একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।........ হাসিনার সঙ্গ ছাড়তে চায় না দিল্লি, তাঁকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে ভারতের কূটনৈতিক কার্যকলাপের সিংহভাগ। ভবিষ্যতে উপমহাদেশের রাজনীতিতে নয়াদিল্লির অবস্থানকে যা মজবুত করবে।"

১৯৭১-এর দুঃসময়কে পুঁজি করে ভারত কর্তৃক আদায় করা যে সাত দফা চুক্তিকে শেখ মুজিবুর রহমান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এখন বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে আধিপত্যের দাসখত সে চুক্তিকেই ভারত কৌশলে বাস্তবায়ন করিয়ে নিচ্ছে পুষ্পল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় "চিরকালই 'ভারতপন্থী' মুজিব কন্যা"-কে দিয়ে। এভাবে বন্ধুত্বের ঋণ শোধের মাধ্যমে দেউলিয়াত্ব অর্জনের অঘোষিত ভিশন নিয়ে বিকশিত হচ্ছে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক। যার শেষ পরিণতি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভারতে বিলীন হওয়া। ভারতীয় বুদ্ধিজীবী কে. সুব্রামোনিয়াম-এর ভাষায়, "This is a fact of geography, economics and technology." অবশ্য বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভারতে বিলীন হওয়া এবং ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর উক্ত উক্তিটির ভবিষ্যত ফ্যাক্ট কি হবে, তা সময়ই বলে দেবে।

**অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিকাশ ঃ**

ন'মাসের মুক্তিযুদ্ধের পর একটি দুর্বল অর্থনীতির ভৌত কাঠামো নিয়ে বাংলাদেশের প্রথম সরকারের যাত্রা শুরু হয়। স্বাধীনতার পূর্বেই যেহেতু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কথা আওয়ামী লীগ বলেছিলো [কেসস্টাডি-০১ "......আওয়ামী লীগ যদি সরকার গঠন করে তবে দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গ্রহণ করা হবে। শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং কল-



www.pathagar.com

কারখানার শেয়ার শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে..... ।"] তাই বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশ সরকারের কর্মকান্ড সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কেন্দ্রিকই ছিল। সমাজতান্ত্রিক পরিভাষায় পুঁজিবাদী দেশ/প্রতিষ্ঠান হতে কোনো ঋণ/সাহায্য গ্রহণ না করার মনোভাব বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরও দুর্বল করে তুলছিল। "এক পর্যায়ে পুঁজিবাদী দাতা দেশ/গোষ্ঠিকে তুষ্ট করার উদ্দেশ্যেই তাজউদ্দিন আহমাদকে মন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। ... কারণ, বাংলাদেশের জন্য যে পরিমাণ ঋণ/সাহায্যের প্রয়োজন ছিল তা যোগানোর মতো সম্পদ সমাজতান্ত্রিক দেশের ছিল না। .........১৯৭২-এর মার্চ মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে যাবার সময়ে বঙ্গবন্ধু সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন সম্ভাব্য সাহায্যপ্রাপ্তির এক দীর্ঘ তালিকা। কিন্তু শুধুমাত্র পাকিস্তানী আমলে মুসাবিদা করা পূর্ব-পাকিস্তানের জন্যে বরাদ্দ করা সাহায্য দিতে তারা সম্মত হয়। ......... অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, বাংলাদেশের প্রভূত পরিমাণ সাহায্য যোগানো সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো সম্পদ-সীমাবদ্ধ দেশের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাৎক্ষণিকভাবে কিছু করা গেলেও দীর্ঘ সময় ধরে এমনি সাহায্য অব্যাহত রাখা সম্ভব হতো না। ..... রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিচারে বলা যায়, সীমাবদ্ধ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যতটুকু সম্ভব ততটুকু ঋণ/সাহায্য সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে দেয়নি। কারণ আশানুরূপভাবে একটি নির্ভরশীল ও অনুগত মিত্রের ভূমিকায় বাংলাদেশকে দেখা যায়নি। ১৯৭২-এর গোড়ায় মস্কো প্রস্তাব করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে আদর্শিক সেতুবন্ধন প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু বঙ্গবন্ধু প্রস্তাবটি নাকচ করে দিয়েছিলেন। কাজেই এরপর থেকে আওয়ামী লীগের প্রতি মস্কোর দৃষ্টিভঙ্গি তুলনামূলকভাবে কঠোর হলো। উপরন্তু মস্কো বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিকেই বিগত কুড়ি বছরের ইতিহাসে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে। ......অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রও ঐকান্তিকতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশকে প্রয়োজন অনুসারে সাহায্য দিতে পারেনি। ১৯৭২-এর অক্টোবর মাসে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া এবং পূর্ব-জার্মানী সফরে আমন্ত্রিত হন। এই সফরের ফলে ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে সাহায্য পাওয়া যায়। তবে হাঙ্গেরী ও রোমানিয়ার ঋণদান শর্ত ছিল বেশ কঠিন; এবং ১৯৭৪ পর্যন্ত আলোচনা চালিয়ে যাবার পর তা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিলো। মোটের ওপর এটা বলা চলে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে সম্পর্কের অভিজ্ঞতা সুখকর হয়নি।...... ১৯৭৩-এর মধ্যে বাংলাদেশ এটা পরিস্কার বুঝতে পেরেছিল যে,



www.pathagar.com

সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ থেকে আশানুরূপ সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। বিকল্প উৎসের অনুসন্ধান অনিবার্য। কাজেই এ সময় থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহ, জাপান, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যে বাংলাদেশ তৎপর হতে শুরু করে।"[৪৪]

প্রখ্যাত সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে দেশের অর্থনীতির এই নাজুক পরিস্থিতি আরও করুণভাবে ফুটে ওঠে। সাক্ষাৎকারে ডেভিড ফ্রস্টের শেষ প্রশ্নটি ছিলো ঃ মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার, পৃথিবীর মানুষের জন্যে কি বাণী আমি আপনার কাছ থেকে বহন করে নিয়ে যেতে পারি? তার উত্তরে প্রাইম মিনিস্টার শেখ মুজিবুর রহমানের জবাব ছিল ঃ "আমার একমাত্র প্রার্থনা - বিশ্ব আমার দেশের মানুষের সাহায্যে অগ্রসর হয়ে আসুক। আমার হতভাগ্য স্বদেশবাসীর পাশে এসে বিশ্বের মানুষ দাঁড়াক। আমার দেশের মানুষ স্বাধীনতা লাভের জন্যে যেমন দুঃখ ভোগ করেছে, এমন আত্মত্যাগ পৃথিবীর খুব কম দেশের মানুষকেই করতে হয়েছে। মিস্টার ফ্রস্ট, আপনাকে আমি আমার একজন বন্ধু বলে গণ্য করি। আমি আপনাকে বলেছিলাম, আপনি আসুন। নিজের চোখে দেখুন। আপনি নিজের চোখে অনেক দৃশ্য দেখেছেন। আরো দেখুন। আপনি আমার এই বাণী বহন করুন -- সকলের জন্যেই আমার শুভেচ্ছা। আমি বিশ্বাস করি, আমার দেশের কোটি কোটি ক্ষুধার্ত মানুষের পাশে এসে বিশ্ব দাঁড়াবে। আপনি আমার দেশের বন্ধু। আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।"[৪৫]

হতভাগ্য স্বদেশবাসীর কোটি কোটি ক্ষুধার্ত মানুষের পাশে এসে বিশ্বকে দাঁড়াবার আহ্বানের পাশাপাশি তামাক ও পাইপসহ ভোগ্যপণ্য ও প্রসাধনী দ্রব্যের আমদানীর সিদ্ধান্তও দৃশ্যমান হয়েছিলো। বাংলাদেশের ১ম মন্ত্রীসভার মাননীয় বিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক সম্পদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা ও আণবিক শক্তি মন্ত্রী ড. মফিজ চৌধুরীর ভাষায়, "জয়পুরহাটে ১৩০০ ফুট মাটির গভীরে চুনাপাথর এবং জামালগঞ্জে ২০০০ ফুট মাটির গভীরে কয়লার স্তরের সন্ধান জানা ছিল। এর আগে থেকেই এ দুটির স্থান মাহাত্ম জনসাধারণ্যে সুবিদিত ছিল এবং কাকতালীয়ভাবে দুটি এলাকাই ছিল আমার নির্বাচনী এলাকায়। এইসব প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ আমার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বের মধ্যে ছিল। আমি বঙ্গবন্ধুকে এজন্য আশি কোটি টাকা বরাদ্দের দাবী জানিয়েছিলাম, বলেছিলাম, না হলে আমাকে ছুটি দিন। বলাবাহুল্য ইস্তফার কথা বলতে পারিনি। উত্তরে বঙ্গবন্ধু

৪৪. ডাঃ শাহাদাত হোসেন সম্পাদিত, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৯৩৫, ইফাবা, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০। পৃ. ৩৪০-৩৪৪।

৪৫. ডাঃ শাহাদাত হোসেন সম্পাদিত, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৯৩।



www.pathagar.com

অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ও বিচলিত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, ডাক্তার সাহেব, আপনি আশি কোটি টাকা চাচ্ছেন, কোথা থেকে পাবো, খাবার কেনার পয়সা নাই, অষুধ কেনার পয়সা নাই, কোথা থেকে ঐ টাকা জোগাড় করবো। বঙ্গবন্ধুকে সেদিন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত বোধ হয়েছিল। আমি কি তাঁর চোখে অশ্রুকণা দেখেছিলাম!

পরবর্তী পর্যায়ে বাখরাবাদ থেকে গ্যাস নিয়ে চট্টগ্রামে ইউরিয়া সার প্রস্তুত করার প্রস্তাব নেয়া হয়েছিল। আন্তর্জাতিক একটা সংস্থা থেকে এ ব্যাপারে সাহয্যের আশা করা হয়েছিল এই বলে যে, এ থেকে উৎপাদিত সার ভারত, ইন্দোনেশিয়া, বার্মা প্রভৃতি দেশে রপ্তানী করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের খাদ্য উৎপাদনেও এতে করে সহায়তা করা হবে। মাত্র ১২০ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছিল, কিন্তু ঐ টাকারও সাশ্রয় হয়নি।

এমত দুঃখের দিনে স্বাধীনতার বছরেই প্রথম আমদানী দ্রব্যের তালিকায় ভোগ্যপণ্য ও প্রসাধনী দ্রব্যের অন্তর্ভুক্তি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে কিভাবে করা হয়েছিল কে জানে? মন্ত্রণালয়টি তামাক ও পাইপ ঐ তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেন। জেনারেল ওসমানী এতে আপত্তি তোলেন, কিন্তু কাজ হয়নি। .........পাটের ব্যাপারে BJEC কেবলমাত্র রফতানী করবে এ পূর্ব সিদ্ধান্ত অটল রইলো। অঙ্গ-কর্পোরেশনগুলি যথা JMC, JTC প্রভৃতিকে রফতানী করার অধিকার দেয়ার জন্য যে প্রস্তাব এসেছিলো, তা নাকচ করা হলো। আলোচনাকালে, এ কথা জানা গেলো যে, গত বৎসর ২০০০০ [বিশ হাজার] টন পাট কেনায় আমদানীকারককে ২ পাউন্ড স্টার্লিং হারে রিবেট দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আমদানীকারকের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত দাম অপেক্ষা ২ পাউন্ড স্টার্লিং কম নেয়া হয়েছে। কী করে সম্ভব হলো জানিনা। কেবিনেট সিদ্ধান্ত এবং বিশেষ করে minimum export price কমিয়ে দেয়ার অধিকার কে কাকে দিলেন? অথবা কে নিজে হাতে নিলেন?"[৪৬] এ পরিস্থিতিকে মেজর জলিল মূল্যায়ন করেছিলেন এভাবে, "সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার তা'য়ে গড়ে ওঠা 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ [State Capitalism]' এবং বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির আচার-আচরণ এক ও প্রায় অভিন্ন রূপ ধারণ করেছে।"[৪৭]

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূলনীতির পুনরুদ্ধারকারী এবং সমাজতন্ত্রী ও কমরেডদের দ্বারা গঠিত মন্ত্রীসভার বর্তমান সরকারের অর্থনৈতিক বিকাশ সম্পর্কে দেশের প্রখ্যাত নাগরিকদের মতামতে যা প্রতিফলিত হয়েছে তা তুলে ধরা হলোঃ

---

৪৬. ড. মফিজ চৌধুরী [বাংলাদেশের ১ম মন্ত্রীসভার মাননীয় বিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক সম্পদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা ও আণবিক শক্তি মন্ত্রী এবং বাকশাল কেন্দ্রিয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য] , বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায়, প্রথম প্রকাশ ১৯৯১; ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ.-১০৯।

৪৭. মেজর [অবঃ] এম এ জলিল, কৈফিয়ত ও কিছু কথা, প্রাগুক্ত। পৃ-১৮।



www.pathagar.com

"সারা বিশ্বে সমাজতন্ত্রের অস্তিত্ব তো বটেই, কঙ্কাল পর্যন্ত প্রায় নিশ্চিহ্ন। কিন্তু বাংলাদেশের রোমান্টিকতায় আজও যারা ভুগছেন তারা প্রধানমন্ত্রীকে [শেখ হাসিনা] এমন একটি বলয় সৃষ্টি করে রেখেছেন যার চারদিকে দুর্গম প্রাচীর।"[৪৮]

"দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির সংকটের কথা চিন্তা করলে আতঙ্কিত না হয়ে পারা যায় না। শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে সরকার কমিশন গঠন করেছিল খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদের নেতৃত্বে। কিন্তু রিপোর্টটি প্রকাশ করা হলো না। বরং অর্থমন্ত্রী লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে বললেন– তাদের প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে নাম প্রকাশে তিনি অক্ষম। ...... হলমার্কের টাকা আত্মসাতের কাহিনী বিশ্ব ব্যাংকিং-ব্যবস্থা উদ্ভাবনের পর সবচেয়ে বড় জালিয়াতি। হলমার্ক গ্রুপের একটা পোশাকশিল্প সোনালী ব্যাংকের ঢাকার শেরাটন ব্রাঞ্চ থেকে জালিয়াতি কাগজের বিনিময়ে ক্রমান্বয়ে ৩ হাজার ২০০ কোটি টাকা ও বিভিন্ন ব্রাঞ্চ থেকে আরও ২ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। নিশ্চিতভাবে প্রমাণ আছে শেরাটন ব্রাঞ্চ থেকে জাল ডকুমেন্টের বিনিময়ে ৫০০ কোটি টাকা লোপাট হওয়ার সময় উপদেষ্টা পরিষদের একজন সদস্য স্বয়ং ওই ব্রাঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। এখন যারা দুর্নীতি করছেন, হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট করছেন তারা সরকারি ও বিরোধী দলের অনুরক্ত এবং আশীর্বাদপ্রাপ্ত। দুর্নীতির ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্যবসায়ীরা একটি অলিখিত চুক্তি করেছেন দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের টাকা ভাগাভাগির জন্য। শেয়ারবাজার ও হলমার্কের এই দুঃসাহসিকতার বিরুদ্ধে প্রশাসনও ব্যবস্থা নিতে অক্ষম হয়েছে।......অর্থ মন্ত্রণালয়ের অবস্থা লেজে-গোবরে।"[৪৯]

"বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনের সমাপ্তি না হলে, শীতলতা কাটিয়ে উষ্ণ স্বাভাবিক না হলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে কতটুকু বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, তা ভেবে অর্থনীতির বিশ্লেষক না হলেও দেশের বৃহৎ শিল্পায়নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত থাকার কারণে শিউরে উঠি। আমাদের রপ্তানির তিরাশি শতাংশ [৮৩%] আসে পোশাকশিল্প থেকে। আর সিংহভাগ রপ্তানি হয় আমেরিকায়। আমেরিকায় রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের স্থান দ্বিতীয়। আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ড্যান মোজেনা তাদের দেশে রপ্তানিতে প্রথম স্থানে বাংলাদেশকে দেখতে চান বলেছেন। এ জন্য তাকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছি। কিন্তু তার আরেকটি উক্তিতে আতঙ্কিত হয়েছি।

---

৪৮. নূরে আলম সিদ্দিকী বুকের রক্ত দিয়ে লিখে দিতে পারি দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সম্ভব নয়, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ঢাকা, মঙ্গলবার ১৪ অগাস্ট, ২০১২; পৃ. ০১। [জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কার একজন অন্যতম ছাত্র কর্ণধার ছিলেন। যাকে তৎকালীন সময়ে শেখ মুজিবুর রহমানের চার খলিফার এক খলিফা বলা হতো।]

৪৯. নূরে আলম সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত।



www.pathagar.com

তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা আমেরিকার শিল্পপতিদের মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করছে। উক্তিটি রূঢ় হলেও বাস্তব।' "[৫০]

"ফুটপাতে স্বল্পপুঁজি নিয়ে নানা পসরা সাজিয়ে যারা সামান্য লাভে পণ্য বিক্রি করেন তারা এখন চরম হতাশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তাদের ক্রেতা স্বল্প আয়ের সাধারণ মানুষ। এসব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর পণ্য বিক্রি কমেছে ব্যাপকভাবে। তারা জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষ চাল, ডাল, নুন, তেল কিনতেই যেখানে হিমশিম খাচ্ছে, সেখানে অন্য প্রয়োজনের দিকে নজর দেবে কিভাবে? অনেকেই ব্যবসায় ছেড়ে দিয়ে কায়িক শ্রমকে বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। একই চিত্র গ্রামে-গঞ্জেও। কৃষকের উৎপাদিত শস্য ও অন্যান্য পণ্যের দাম বাজারে চড়া হলেও তাদের বিক্রি করতে হয় কম দামে। অন্যদিকে সার ও সেচসহ উৎপাদন খরচ ব্যাপকভাবে বাড়ায় কৃষকেরা দিশেহারা। অনেকেই ঋণখেলাপি হয়ে পড়েছেন। প্রান্তিক চাষিদের দুর্দশা চরমে। গ্রামে শ্রমজীবি মানুষের চাহিদা ছিল। কিন্তু কৃষকের অবস্থা খারাপ হওয়ায় কৃষি শ্রমিকদের চাহিদা কমে গেছে। ফলে বিকল্প শ্রমের দিকে তাদের ঝুঁকতে হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা কৃষির সাথে যুক্ত থাকলেও গ্রামের বেশির ভাগ মানুষকেই নিত্যপণ্য কিনেই খেতে হয়। নিম্ন আয়ের মানুষতো বটেই, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষও মূল্যস্ফীতির চাপে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।"[৫১]

"আয়ের তুলনায় ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস শুরু হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণহীন উর্ধ্বগতিতে মানুষ পর্যুদস্ত হলেও সরকার কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। একইভাবে বিদ্যুতের দফায় দফায় মূল্যবৃদ্ধি ও ভৌতিক বিল প্রদান, খাদ্যসহ সর্বত্র ভেজালের দৌরাত্ম, গ্যাস-পানি সংকট, স্বাস্থ্যখাতে নৈরাজ্য এবং ওষুধের দাম ও চিকিৎসা খরচ বৃদ্ধি উদ্বেগজনক হয়ে উঠলেও কারও টনক নড়েনি। ........ শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারিতে লাখ লাখ বিনিয়োগকারী নিঃস্ব হলেও এ পর্যন্ত সরকার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। তাদের নাম প্রকাশ করার সাহসও পায়নি সরকার। তদন্ত রিপোর্টে দেওয়া পরামর্শগুলোও উপেক্ষিত হয়েছে। শেয়ারবাজার লুটেরাদের প্রতি সরকারের এমন পক্ষপাতিত্ব অন্যান্য ক্ষেত্রেও লুট, দুর্নীতি ও বিশৃংখলার মাত্রা বাড়িয়েছে।...... পদ্মা সেতুর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প নিয়েও লেজেগোবরে অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের পরামর্শ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে দুদক অর্থ মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে পর পর তিনটি চিঠি

---

৫০. নূরে আলম সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত।

৫১. সম্পাদকীয়, মূল্যস্ফীতির চাপ ঃ প্রতিক্রিয়া সবখানে, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ঢাকা, রোববার, ২৩ অক্টোবর ২০১১; পৃ. ০৬।



www.pathagar.com

পাঠালেও কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়ায় বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন স্থগিত করে। বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে দুর্নীতি হওয়ার কথা সরাসরি অস্বীকার করে সরকার বিশ্বব্যাংকের বিরুদ্ধে পাল্টা দুর্নীতির অভিযোগ তুললেও তাদের দেওয়া চিঠি প্রকাশের সাহস পায়নি। এ থেকে ঘটনার সঙ্গে শীর্ষ পর্যায়ের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের জড়িত থাকার সন্দেহ জোরালো হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন বাতিল ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থার একই ভূমিকা সরকারকে কতটা বিপাকে ফেলেছে সেটা এখন পরিষ্কার। বিকল্প উৎস হতে অথবা নিজস্ব অর্থায়নে সেতু নির্মাণের সাড়ম্বর ঘোষণা ও লোকদেখানো উদ্যোগ এক বিশৃংখল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এ নিয়ে চাঁদাবাজি ও চাঁদার টাকা ভাগাভাগি নিয়ে সংঘর্ষে প্রাণহানির ঘটনা এটাই প্রমাণ করে।"[৫২]

অর্থনৈতিক খাতে এতবড় দুর্ঘটনার পেছনে শুধু দুর্নীতিই যে এককভাবে দায়ী তা নয়; মন্ত্রীসভার সদস্যদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের অভাবও অন্যতম কারণ। যার প্রমাণ নীচে উলেখ করা হলো ঃ

"সংসদ উপনেতা বেগম সাজেদা চৌধুরী বলেছেন - 'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মতো চাঁদা তুলে পদ্মা সেতু করব।' বিষয়টি নাপিতের ছোট বাটি দিয়ে ভারত মহাসাগরের পুরো পানি উত্তোলনের মতো। অন্যদিকে অর্থমন্ত্রী মুহিত সাহেব বলেছেন - 'যারা চাঁদা তুলতে যাবে তাদের পেটাও।' "[৫৩]

তবে নিজস্ব অর্থায়নে এ বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দেশের নাগরিকদের যে মানের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন ছিল, যে মানের প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল এবং নিজস্ব অর্থায়নের সুস্পষ্ট পদ্ধতি ও খরচের বিষয়ে যে বিশ্বস্ততার বা জনগণের আস্থা অর্জনের প্রয়োজন ছিল; তার কোনোটাই বর্তমান সরকারের নেই। ফলে অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়ল। নিজের পোশাকহীনতাকে দূর করার ব্যবস্থা না করে অন্যের স্বল্প বসন নিয়ে মন্তব্য করা বা চর্চা করা শুধু অপ্রকৃস্থিত বিকারগ্রস্ত মানুষের পক্ষেই সম্ভব। নিজের দুর্নীতিকে দূর না করে বিশ্ব ব্যাংকের দুর্নীতি নিয়ে গালভরা মন্তব্য করে আত্মতৃপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশে এক বন্ধ্যা অর্থনীতির বিকাশে

---

৫২. মাহমুদুর রহমান মান্না, নাগরিক উদ্যোগ জরুরি, খোলা কলাম, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ঢাকা, মঙ্গলবার ১৪ আগষ্ট ২০১২; পৃ. ০৪।

৫৩. নূরে আলম সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত। http://www.bd-pratidin.com/?view=details&archiev=yes&arch_date=14-082012&type=single&pub_no=827&cat_id=1&menu_id=1&news_type_id=1&index=8



www.pathagar.com

নিরলসভাবে অবদান রেখে যাচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কংকাল বহনকারী এ সরকার।

**সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিকাশ ঃ**

ব্যাপক অর্থে দৈনন্দিন জীবনাচার হতে শুরু করে রাষ্ট্রীয় আচার সবটাই সংস্কৃতির আওতার মধ্যে। আর জীবনাচার বা রাষ্ট্রীয় আচার সবটার পেছনেই থাকে জীবনবোধ বা জীবন দর্শন বা মূল্যবোধ বা জীবন নিয়ে চেতনা। এই চেতনা নিয়েই সংস্কৃতির যত পরিসর। এদিক বিবেচনায় সংস্কৃতির জগতটা এতটা সুপরিসর যে তার পুরো আলোচনার জন্য ব্যাপক পরিসরের দাবি রাখে। প্রবন্ধের পরিসর সে তুলনায় সীমিত। তাই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কিভাবে বিকশিত হয়েছিলো বা হচ্ছে তার কিছু প্রতীকি আলোচনা এখানে করা হলো। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম যে চেতনার গর্ভে তা পাঠকের হয়তো মনে আছে। বলেছিলাম মানুষকে ঘৃণা করার জীবন দর্শন অন্ত্যজ দর্শন এবং নিরীশ্বরের গর্ভে। তাই এর সাংস্কৃতিক বিকাশে নাস্তিকতা এবং অন্ত্যজ দর্শনের প্রবল প্রভাবে প্রভাবান্বিত হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নাস্তিকতা কোনো যুক্তিগ্রাহ্য বিষয় হতে পারেনি কখনো। ফলে তাকে ভর করতে হয়েছে অন্ধত্ব আর গোয়ার্তুমির উপর। আর অন্ত্যজ দর্শন মানুষকে শুধু ঘৃণার পাঠই দিতে পারে ভালোবাসা ও মানবিকতা উপহার দিতে অক্ষম। কারণ যার যা নেই তা সে দিতে পারে না কখনো। পুরুষ যতই সুদর্শন হোক না কেন, সন্তান প্রসব করে না কখনো। তাই বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতা এদেশে সস্তা অশ্লীলতা [কতভাবে স্বল্প বসনা হওয়া যায়], অবৈধ অস্ত্র ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দের সংস্কৃতি, সামাজিক অবক্ষয়ের তথা 'জোর যার মুল্লুক তার' সংস্কৃতি, আস্তিকতার বিরুদ্ধে তথা ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণার, উগ্র অসহনশীলতা এবং অন্ধ বিরোধিতার সংস্কৃতিই শুধু উপহার দিয়েছে। বিগত ৪০ বছরের ইতিহাসে এছাড়া আর কোনো দৃষ্টান্ত নেই। আগামী শতবর্ষেও এছাড়া অন্য কোনো সংস্কৃতি উপহার দেয়া বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে সম্ভব নয়। বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার আরেক বিশেষ গুণ হলো 'নির্বোধ'-এর গুণ। বিষয়টিকে প্রমাণসিদ্ধ করতে দুটো বাস্তব আলোচনাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা হলো ঃ এক. এর বেশি মিলন অভিপ্রেত নয়। দু'পক্ষেরই আলাদা আলাদা বিকাশের ক্ষেত্র, তাতেই মঙ্গল ঃ সম্প্রতি এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, ২১১/২০৭, উপেন ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০৬০ থেকে মুদ্রিত; বইয়ের দেশ, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২, ৮ম বর্ষ ৩ সংখ্যায় "বঙ্গদেশের বৃহৎ ইতিবৃত্ত" নামে একটি বই [ল্যান্ড অফ টু রিভারস: আ হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল ফ্রম দ্য মহাভারত টু মুজিব - নীতিশ সেনগুপ্ত, পেঙ্গুইন বুক্স, নয়াদিল্লি-১৭।]-এর আলোচনা উপস্থাপন করেন চিত্তব্রত পালিত । আলোচনাটি নিম্নরূপ ঃ



www.pathagar.com

"ইতিমধ্যে এ-বিষয়ে দু'টি বিতর্কিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। একটি উইলেম ভ্যান শেন্ডেল-এর 'বর্ডারলেস বেঙ্গল' এবং অন্যটি গোলাম মুরশিদের 'বাংলার ইতিহাসের হাজার বছর'। প্রথমটিতে ভ্যান শেন্ডেল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিভক্ত বঙ্গদেশের অবিভক্ত রূপটি ফিরিয়ে আনতে উপদেশ দিয়েছেন। দ্বিতীয়টিতে মুরশিদ সমগ্র বাংলার ইতিহাসকেই মুসলিম মোড়কে ভরে দিতে চেয়েছেন। শেন্ডেলের কথা মানতে গেলে অবিভক্ত বাংলার রাষ্ট্রিক অবয়বটি স্মরণ করতে হয়। সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে স্বদেশবিরোধী, স্বাধীনতাবিরোধী ব্রিটিশের প্রসাদপুষ্ট বাংলার মুসলিম সমাজ প্রাধান্য পেত এবং সরকার চালাত। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মনীষীদের অবদান, উপর্যুপরি কৃষক সংগ্রাম, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা এবং বিপ্লবীদের বলিদান ব্যর্থ হয়ে যেত। কলকাতা হত আলিনগর। নাজিমুদ্দিন, সুরাবর্দির মতো লোকেরা সেখানে কর্তৃত্ব করত। তাই ১৯৩৭ থেকে '৪৭-এর শেষ অধ্যায়ে বেশির ভাগ হিন্দু নেতাই তার বিরোধিতা করেন। শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায়ের মতো দু'-একজন আত্মাহুতি দিয়ে সেই অভিবক্ত বাংলার প্রজা হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তা হয়নি। দেশভাগ হলে ওপার বাংলার অংশটি পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্গত হয়। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো নেতারা অতি কষ্টে পশ্চিমবঙ্গে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখেন। অবিভক্ত রাজনৈতিক বাংলা তাই একটি অলীক ধারণা। প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম নেতারা এবং বুদ্ধিজীবীরা ভাষাভিত্তিক যে-সোনার বাংলা চেয়েছিলেন, তা-ই পেয়েছেন। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে যে-সাংস্কৃতিক সমন্বয় দুই বাংলার মধ্যে ঘটেছে, আরও বাণিজ্যিক বিনিময় সেই সংহতিকে সুবেদী করে তুলেছে। এর বেশি মিলন অভিপ্রেত নয়। দু'পক্ষেরই আলাদা আলাদা বিকাশের ক্ষেত্র, তাতেই মঙ্গল। আবেগে রাজনৈতিক সীমানা তুলে দেয়া যায় না, ফলও ভাল হয় না।......... "

"গোলাম মুরশিদের মতে, আদিপর্বে বাংলা বাঙালি বঙ্গভূমি কিছুই ছিল না। সবই সুলতানি আমলে সংজ্ঞায়িত হয়। চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বাংলা নয়, কিরাত, চেল ও পৌন্ড্র, রাঢ়ীরা বাঙালি নয়, সে যুগে বঙ্গভূমির ভৌগলিক সংস্থান ছিল না। তাঁরা সকলেই 'বাঙালি' হলেন সুলতানি আমলে! এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধার করে বলতে হয়, 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো / সেই তো তোমার আলো!' সুলতানি আমলে হুসেন শাহ-এর মতো সুলতানেরা হয়তো সেই আলো উসকে দিয়ে থাকবেন। কিন্তু এই হুসেন শাহের আমলেই জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ লিখেছেন, কীভাবে দিবারাত্র আজানের কলধ্বনিতে হরিসংকীর্তন ডুবে যায়। এবং মহাপ্রভুকে সেই প্রভাব রুখতে বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তন করতে হয়। হিন্দু সমাজের অন্ত্যজ[৫৪]রা মুসলিম মন্ডল,

৫৪. অন্ত্যজ - যার নীচ কুলে জন্ম, নীচকুলজাত, নীচ; ঃ আধুনিক বাংলা অভিধান, মোসলেমউদ্দিন আহমদ, ইফাবা, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-২ এবং অন্ত্য - শূদ্র; চন্ডাল। অন্ত্যজ - নীচ বংশজাত; শূদ্রকুলজাত। অস্পৃশ্য; ঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত, সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী।



www.pathagar.com

হালদার, বিশ্বাসে পরিণত হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। আলোচ্য 'ল্যান্ড অফ টু রিভারস' গ্রন্থে মুরশিদের কোনো প্রতিবাদ পাওয়া যাবে না। কারণ লেখক বাংলার ইতিহাসের বিবরণ দিয়েছেন, ব্যাখ্যা করেননি। পরবর্তী পর্যায়ে ব্রিটিশ শাসনের সুষ্ঠু প্রশাসনের লেখক প্রশংসা করেছেন। রেনেসাঁসের উদ্বোধনের জন্য পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভূমিকার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, যোগাযোগব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা যে ব্রিটিশ শাসনেরই সুফল, সে কথা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী বাঙালিরা সাধারণত এইসব অলক্ষ্য অবদানের কথা মনে রাখি না। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে আমরা কিন্তু সে-পথ ধরেই হাটছি।

ব্রিটিশরা বিদায় নিলেও পাকিস্তানের নয়া-উপনিবেশবাদ ওপার বাংলাকে গ্রাস করে। অর্থনৈতিক শোষণ, উর্দুর চাপান, মিলিটারি ভারী বুটের আস্ফালন, নারী ধর্ষণ সবই চলতে থাকে। এ-সবই ইসলামি ঐক্যের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এক ভাষাভিত্তিক সংগ্রাম এই নয়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে চলতে থাকে। সেই সংগ্রামের অবিসংবাদী নেতা শেখ মুজিবর রহমান। ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা দিবস থেকে শুরু করে বহু রক্ত দিয়ে পবিত্র করা সোনার বাংলা গড়ে উঠেছে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির উপর আধিপত্য করার অছিলা জেগে ওঠে বারবার। গুঞ্জন ওঠে, রবীন্দ্রনাথের বিচরণক্ষেত্র ও সাহিত্যকর্ম ওপার বাংলাকে ঘিরে। বর্ধমানের চুরুলিয়ার কবি নজরুল ইসলামকে ঢাকায় সমাধিস্থ করে তাঁকে জাতীয় কবি হিসেবে সম্মানিত করা হয়। লালন কর হয়ে যান লালন শাহ ফকির। এখন মধুসূদনকে নিয়েও টানাটানি। একবার সৈয়দ মুজতবা আলী পরিহাস করে লিখেছিলেন, তোমাদের গানে কবিতায় সাহিত্যে এত খেজুর গাছের প্রাদুর্ভাব কেন? তোমরা তো আরব নও, তোমরা তো বাঙালি। বাংলায় খেজুর গাছ তো অপ্রতুল।

এই বিচিত্র মুসলিম মানসের কোনও হদিশ নীতিশ সেনগুপ্তের বইতে নেই। তিনি হয়তো ঠিকই করেছিলেন যে, তিনি তর্কপ্রিয় বাঙালি হবেন না, নিরুপদ্রব ইতিহাস লিখবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বই পড়ানো হবে। তবুও সব শেষে বলতেই হবে, দুই মলাটের মধ্যে বাংলার ইতিহাসের এরকম সাতকাহন আগে লেখা হয়নি। অন্তত তিনি মহাভারত থেকে মুজিব পর্যন্ত অখণ্ড বঙ্গদেশের ইতিহাসই লিখেছেন। কোনও দ্বিখণ্ডিত চেতনা তাঁকে ভর করেনি। নীহাররঞ্জন রায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার বিরচিত বঙ্গদেশের ইতিহাসের পর আবার একটি বঙ্গদেশের বৃহৎকথা রচিত হল। লেখককে সাধুবাদ জানাই।"[৫৫]

---

৫৫. বই আলোচনা ঃ ল্যান্ড অফ টু রিভারসঃ আ হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল ফ্রম দ্য মহাভারত টু মুজিব - নীতিশ সেনগুপ্ত, পেঙ্গুইন বুক্স, নয়াদিল্লি-১৭। বঙ্গদেশের বৃহৎ ইতিবৃত্ত, চিত্তব্রত পালিত, বইয়ের দেশ, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২, ৮ম বর্ষ ৩ সংখ্যা, এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত



www.pathagar.com

**দুই. ভারত-বাংলাদেশ এক ও অভিন্ন ঃ**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে গতকাল [২২ অকটোবর ২০১১] 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক' শীর্ষক দু'দিনব্যাপী সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, "ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক শুধু মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে নয়, অনেক প্রাচীনকাল থেকে ভালো সম্পর্ক বিদ্যমান। তিনি বলেন, ভারত-বাংলাদেশ ভৌগলিকভাবে এক ও অভিন্ন। উভয় দেশের কৃষ্টি-কালচারও এক। ভারত আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছে। এখনো আমাদের সহায়তা করছে। তাই ভারতের সাথে সম্পর্ক না করলে কার সাথে সম্পর্ক করব? এই সম্পর্ককে আরো দৃঢ় ও উন্নত করতে হবে বলে মন্তব্য করেন শিক্ষামন্ত্রী। ....... একই সম্মেলনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব মিজারুল কায়েস বলেন, আমরা অভিন্ন মূল্যবোধের ওপর দুইটি রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে আছি। এটি এক সময় স্বপ্ন মনে হলেও আজ দীর্ঘদিন পর তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এই স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এটা আজীবনের সম্পর্ক।"[৫৬]

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব মিজারুল কায়েস-এর বক্তব্য এবং চিত্তব্রত পালিত-এর বক্তব্য পর্যালোচনা করলে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার 'নির্বোধ' গুণের সাংস্কৃতিক উজ্জ্বলতা সহজেই দৃশ্যমান হয়। বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয় যদি পাশাপাশি পর্যালোচনা করা যায় ঃ

| বিষয় | মন্তব্য | | |
|---|---|---|---|
| | নুরুল ইসলাম নাহিদ | মিজারুল কায়েস | চিত্তব্রত পালিত |
| **সময়কাল** | ২০১১ | ২০১১ | ২০১২ |
| **ভৌগলিক ও রাজনৈতিক অভিন্নতা** | ভারত-বাংলাদেশ ভৌগলিকভাবে এক ও অভিন্ন। উভয় দেশের কৃষ্টি-কালচারও এক। | আমরা অভিন্ন মূল্যবোধের ওপর দুইটি রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে আছি। এটি এক সময় স্বপ্ন মনে হলেও আজ দীর্ঘদিন পর তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এই স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন | অবিভক্ত বাংলার রাষ্ট্রিক অবয়বটি স্মরণ করতে হয়। সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে স্বদেশবিরোধী, স্বাধীনতাবিরোধী ব্রিটিশের প্রসাদপুষ্ট বাংলার মুসলমান সমাজ প্রাধান্য পেত এবং সরকার চালাত। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মনীষীদের অবদান, উপর্যুপরি কৃষক সংগ্রাম, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা এবং বিপ্লবীদের বলিদান ব্যর্থ হয়ে যেত। |

---

বিশ্বাস কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, ২১১/২০৭, উপেন ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০৬০ থেকে মুদ্রিত।

৫৬. ঢাবিতে ভারত-বাংলা সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী, ভারত বাংলাদেশ এক ও অভিন্ন, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ঢাকা, রোববার, ২৩ অক্টোবর ২০১১।



www.pathagar.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। | কলকাতা হত আলিনগর। নাজিমুদ্দিন, সুরাবর্দির মতো লোকেরা সেখানে কর্তৃত্ব করত। তাই ১৯৩৭ থেকে '৪৭-এর শেষ অধ্যায়ে বেশির ভাগ হিন্দু নেতাই তার বিরোধিতা করেন। ....... দেশভাগ হলে ওপার বাংলার অংশটি পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্গত হয়। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো নেতারা অতি কষ্টে পশ্চিমবঙ্গে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখেন। অবিভক্ত রাজনৈতিক বাংলা তাই একটি অলীক ধারণা। প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম নেতারা এবং বুদ্ধিজীবীরা ভাষাভিত্তিক যে-সোনার বাংলা চেয়েছিলেন, তা-ই পেয়েছেন। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে যে-সাংস্কৃতিক সমন্বয় দুই বাংলার মধ্যে ঘটেছে, আরও বাণিজ্যিক বিনিময় সেই সংহতিকে সুবেদী করে তুলেছে। এর বেশি মিলন অভিপ্রেত নয়। দু'পক্ষেরই আলাদা আলাদা বিকাশের ক্ষেত্র, তাতেই মঙ্গল। আবেগে রাজনৈতিক সীমানা তুলে দেয়া যায় না, ফলও ভাল হয় না |
| **উভয়দেশের কৃষ্টি-কালচার** | উভয় দেশের কৃষ্টি-কালচারও এক। | আমরা অভিন্ন মূল্যবোধের ওপর দুইটি রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে আছি। | হুসেন শাহের আমলেই জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ লিখেছেন, কীভাবে দিবারাত্র আজানের কলধ্বনিতে হরিসংকীর্তন ডুবে যায়। এবং মহাপ্রভুকে সেই প্রভাব রুখতে বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তন করতে হয়। হিন্দু সমাজের অন্ত্যজ[৫৭]'রা মুসলিম মন্ডল, হালদার,বিশ্বাসে পরিণত হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। |
| **ভারত বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সম্পর্কের** | ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক শুধু মুক্তিযুদ্ধের সময় | এটা আজীবনের সম্পর্ক। | কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির উপর আধিপত্য করার অছিলা জেগে ওঠে বারবার। গুঞ্জন ওঠে, রবীন্দ্রনাথের বিচরণক্ষেত্র ও সাহিত্যকর্ম ওপার |

৫৭. অন্ত্যজ - যার নীচ কুলে জন্ম, নীচকুলজাত, নীচ; ঃ আধুনিক বাংলা অভিধান, মোসলেমউদ্দিন আহমদ, ইফাবা, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-২ এবং অন্ত্য - শূদ্র; চন্ডাল। অন্ত্যজ - নীচ বংশজাত; শূদ্রকুলজাত। অস্পৃশ্য; ঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত, সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী।



www.pathagar.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| ধরণ | থেকে নয়, অনেক প্রাচীনকাল থেকে ভালো সম্পর্ক বিদ্যমান। | | বাংলাকে ঘিরে। বর্ধমানের চুরুলিয়ার কবি নজরুল ইসলামকে ঢাকায় সমাধিস্থ করে তাঁকে জাতীয় কবি হিসেবে সম্মানিত করা হয়। লালন কর হয়ে যান লালন শাহ ফকির। এখন মধুসূদনকে নিয়েও টানাটানি। |

নির্বোধ-এর মতো এই আচরণের পেছনে অনুদঘাটিত কারণগুলো ঃ ০১. আচরণকারীদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেকে প্রকৃতই অন্ত্যজ বলে মনে করার কারণে তার ভেতরে সৃষ্ট হীনমন্যতাবোধ। ০২. ইসলামের সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা, মানবিকতা ও উদারতার বিষয়ে জ্ঞানের পরিবর্তে অজ্ঞতার লালন ও পরিচর্যা। ০৩. 'যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা'-এই বিদ্বেষমূলক প্রবণতা। ০৪. আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ লোপ পাওয়া। ০৫. রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে নির্বোধের ভূমিকায় অভিনয় করা। ০৬. নির্বোধের মত আচরণের মধ্যে সাহসিকতার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া। ইত্যাদি। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সাংস্কৃতিক বিকাশ এভাবে নির্বোধের মত আচরণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে। এর পরিণতি যে আধিপত্যবাদীদের দাসত্ব বরণ করা সে অনুভূতি উপলব্ধেও নির্বোধের পরিচয়ের স্বাক্ষর নিয়তই আমরা রেখে যাচ্ছি।

**ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিকাশ ঃ**

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৪০ বৎসর যাবত ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে প্রবণতাটি ব্যাপকভাবে বিকাশ লাভ করেছে; তা হলো শুধু ইসলাম ধর্মের এবং তার শিক্ষার অস্তিত্বের মূলোৎপাটন করা, নির্মূল করা। এ বিষয়ে সামাজিক পর্যায়ে উদ্যোগ গৃহীত হয়নি; হয়েছে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে। এ প্রবণতাটি বিকাশের পেছনে ধর্মের বিরুদ্ধে [মূলতঃ ইসলামের বিরুদ্ধে ] যে অপবাদটিকে জনসমক্ষে বার বার বিভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরা হয়, তা হলো 'ধর্ম অসহনশীলতার জন্ম দেয় বা ধর্ম ও অসহনশীলতা দুই অবিচ্ছেদ্য যমজ ইত্যাদি।' কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্ম ও রাষ্ট্র পৃথক হয়ে যাবার পর অসহনশীলতার মাত্রা ও ভয়াবহতা বেড়েছে শতগুণ। এটা ধর্মের গুণ নয় ধর্মনিরপেক্ষতার গুণ। এই অসহনশীলতা মূলতঃই ইসলামের বিরুদ্ধে । অসহনশীল এ আচরণ প্রমাণ করে যে ইসলামই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের একমাত্র শত্রু। যদিও খ্রীস্টান চার্চের পুরোহিতদের গোঁড়ামি আর নির্যাতন হতে ইউরোপেই প্রথম ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম, কিন্তু বাংলাদেশে প্রচলিত, প্রচারিত ও অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের আচরণ হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রীস্টান চার্চ বা কোনো ধর্মের পুরোহিতদের বিরুদ্ধে নয়, পুরোটাই ইসলামের বিরুদ্ধে । চীনের তিয়েনমান স্কয়ারের কথা হয়তো মনে আছে সবার। কম্যুনিস্ট সরকার কিভাবে হাজার হাজার হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ভিন্নমত প্রকাশের



www.pathagar.com

স্বাধীনতার কবর রচনা করেছিল। এভাবে কম্যুনিস্ট সোভিয়েট ইউনিয়নেরও রয়েছে উল্লেখযোগ্য অসংখ্য দৃষ্টান্ত। যেমন এদেশবাসীর আছে রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের দুঃসহ স্মৃতি। ভিন্নমতের প্রতি এতটা অসহনশীলতার দৃষ্টান্ত থাকার পরও ধর্মের উপর অসহনশীলতার অপবাদ চাপানো - এটাও ধর্মনিরপেক্ষতার এক অনন্য গুণ। গুণ বলছি এজন্য যে সহনশীলতারও একটি সীমা থাকা চাই। ইসলাম বরাবরই ধর্মনিরপেক্ষতাকে মিটিয়ে দিতে সক্ষমতা প্রমাণ করেছে। ফলে এই সক্ষমতায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সহনশীলতার সীমা অতিক্রম ঘটায় তাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের এইরূপ অসহনশীলতার প্রকাশ ঘটে। তবে ধর্মনিরপেক্ষতা তার নিজের বেলায় অসহনশীলতা প্রকাশের পক্ষে যে যুক্তি পেশ করে ইসলামের ক্ষেত্রে অসহনশীলতার সে যুক্তি কু-যুক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক হয়ে উঠেছিলো দুটো রাষ্ট্র; তুরস্ক এবং ইরান। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ক্ষেত্রে তাঁদের সরকার ছিল চরম স্বেচ্ছাচারী ও অসহনশীল এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার-আচরণে ছিলো চরম গোয়ার্তুমির উজ্জ্বল নিদর্শন। তুরস্কের কামাল পাশা ধর্মীয় নেতাদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক অবমাননাকর প্রপাগাণ্ডা দিয়েই শুরু করেছিলেন তার সরকারের উদ্বোধন। এখন যেমন ইসলামকে জীবনাদর্শ হিসেবে মেনে নেয়ার কারণে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী শিশুকেও বলা হয় স্বাধীনতাবিরোধী, যুদ্ধাপরাধী। নিঃসন্দেহে এ প্রপাগান্ডা অবমাননাকর এবং নেতিবাচক।

"কামাল আতাতুর্ক আরবীতে আজান নিষিদ্ধ করেছিলেন। দেশ থেকে আরবী ভাষার চর্চা উৎখাতে সম্ভাব্য সবকিছুই করেছিলেন। 'ফেজ' টুপির ব্যবহার বন্ধ করে সরকারীভাবে ইংলিশ হ্যাটের প্রচলন করেছিলেন। পশ্চিমী পোশাককে জাতীয় পোশাক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। তুরস্কের শাসনতন্ত্র হতে 'ইসলাম' শব্দটি পর্যন্ত নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। মসজিদে তালা ঝুলিয়েছিল। বিখ্যাত মসজিদ 'আয়া সোফিয়াকে' যাদুঘরে' এবং 'ফাতিহ মসজিদ'-কে গুদামে পরিণত করা হয়েছিল।..... রাজনৈতিক দলগুলোকে বেআইনি ঘোষণা করে চরম একনায়ক-শাসনের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কোনো ধরণের বিরোধিতাকেই কামাল আতাতুর্ক সহ্য করতেন না। যাঁদের সাহায্য নিয়ে তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তারাও ফাঁসি ও নির্বাসনের মতো শাস্তি হতে রেহাই পাননি। ...বিরোধী নেতাদের হত্যা-অনুষ্ঠান উপভোগ্য করে তোলার জন্য মোস্তফা কামাল আংকারার নিকটস্থ তাঁর খামার বাড়িতে প্রচারক দল পুষতেন। আর এ হত্যা অনুষ্ঠানে ডাকা হতো সকল কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের। ভোরে বাড়ি ফেরার সময় তারা দেখতো লাশগুলো শহরের চৌরাস্তায় ঝুলছে।"[৫৮]

---

৫৮. ড. খুরশীদ আহমদ-আবুল আসাদ অনূদিত, গোঁড়ামী অসহনশীলতা ও ইসলাম, ইফা প্রকাশনা-১৬১২, ইফাবা ঢাকা। পৃ. ৮-৯।



www.pathagar.com

শাহের ইরানের ভূমিকা তুরস্কের চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়। বোতল ভিন্ন কিন্তু একই বাস্তব প্রতিচ্ছবি। মিশরও তার ধর্মনিরপেক্ষ শাসকদের এ ধরণের 'সহনশীলতার' নমুনা দেখেছে। 'ইখওয়ানুল মুসলিমুন' ছিল সে বাস্তবতার জ্বলন্ত সাক্ষী।

বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করার পর বৃটিশ আমল হতে প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। পরিভাষার নামে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য থেকে মুসলিম ঐতিহ্য বহনকারী শব্দগুলোকে বিতাড়নের এবং পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক থেকে ইসলামী ভাবধারাকে নির্মূল করার প্রয়াস চালানো হয়েছিল। কবি নজরুল ইসলামের ইসলামী চেতনাসমৃদ্ধ কবিতাগুলোকে 'ডি-ইসলামাইজ' করার প্রচেষ্টাও নেয়া হয়েছিল। জাতীয় জীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র ছিল না, যেখান থেকে ইসলামকে নির্বাসিত করার সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ হল পরিবর্তন করে রাখা হলো সূর্যসেন হল [শেখ মুজিবুর রহমান হল বা শেখ রাসেল হল নাম রাখা যেত। মাস্টারদা সূর্যসেন ছিলেন একজন মুসলিম চেতনাবিরোধী উগ্র চরিত্রের মানুষ], ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম হতে কুরআনের আয়াত [রাব্বি যিদ্‌নি ঈলমা-হে আমার রব! (আমার) জ্ঞান বাড়িয়ে দাও!] তুলে দেয়া হয়েছে, সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেয়া, ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের নাম বদলে কবি নজরুল কলেজ নামকরণ করা হলো ঠিকই; কিন্তু কবি নজরুল ইসলাম থেকে 'ইসলাম' শব্দ বাদ দেয়া হলো [বিদ্বেষ ছাড়া, ইসলাম-মুসলিম-কুরআনের আয়াত বাদ দেয়ার আর অন্য কোনো কারণ ছিলনা], এমনকি পশু সম্পদ রক্ষার নাম করে কুরবানী বন্ধ করা এবং বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের অজুহাতে হজযাত্রী কমানোর সুপারিশ করা হলো। দাউদ হায়দার নামে ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী এক কবি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপমানসূচক ছন্দ দিয়ে কবিতা লিখলে জনগণের রুদ্র রোষ থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য সরকারী নিরাপত্তা দেয়া হলো। রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে ইসলামী জীবনাদর্শের অনুসারী জনগণকে সইতে হয়েছে দুঃসহ যাতনা। বিনা অপরাধে [ইসলামকে পছন্দ করাই একমাত্র অপরাধ] অসংখ্য নিরীহ মুসলিমকে ঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে, কত ঘর-বাড়ি, কত খানকা, কত মাদ্রাসা, কত আলিম, কত ইমাম, কত মুয়াজ্জিন এই ধর্মনিরপেক্ষতার অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছে তার ইতিহাস অজানাই রয়ে গেছে।

ধর্মনিরপেক্ষতার বর্তমান চিত্রও প্রায় একই, বাংলাদেশে শুধুমাত্র ইসলামের ধর্মীয় নেতৃবন্দকে নির্মূল করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে জেল-জুলুম, হামলা-মামলা, নির্যাতন, ইত্যাদির পাইকারী শিকারে পরিণত করা হয়েছে। আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাসকে সংবিধান হতে প্রত্যাহার করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে ইসলামী মূল্যবোধনির্ভর শিক্ষাকে সংকুচিত করা হয়েছে। ব্যাপকভাবে গুম, খুনের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে বিলুপ্ত করা হচ্ছে। সারাদেশে বিভিন্ন শিক্ষা



www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানে নব্য দাউদ হায়দারের আবির্ভাব ঘটে। যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অহেতুক অপ্রাসঙ্গিকভাবে শুধুমাত্র বিদ্বেষবশতঃ কটাক্ষ করেছেন। দেশের নামী-দামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে শুধুমাত্র 'বোরকা পরার কারণে উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে বের করে দেয়া হয়েছিল'।[৫৯]

ইসলামের উত্তরাধিকার আইন, পারিবারিক আইন সংশোধনের উপর্যুপরি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এভাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আল্লাহ, রাসূল এবং ইসলামের সামাজিক সকল বিধানকে নির্মূল করার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার বিকাশ ঘটে চলেছে। শাহের ইরান আজ ইসলামের করতলে। কামাল আতাতুর্কের তুরস্ক আজ ইসলামের করতলে। জামাল আব্দুন্ নাসেরের মিশর আজ ইসলামের করতলে। 'বাংলাদেশ ইসলামের করতলে' এ বাস্তবতার জন্য বাংলাদেশের মুসলিমদেরকেও ইসলামের পথে অবিচল হয়ে দাঁড়াতে হবে; ধৈর্য ধারণ করতেই হবে। জেনারেশন টু জেনারেশন এই অবিচলতা ও ধৈর্যকে ছড়িয়ে দিতে হবে। 'ইন্নাল্লাহা মায়াস্ ছোয়াবিরিন - নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্য ধারণকারীদের সাথে রয়েছেন'।[৬০] ইসলাম একটি জীবন্ত জীবনাদর্শ। মানবজাতির ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার সাথে এর নাড়ীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এই জীবনাদর্শের একজন অমর ও অপরাজেয় রচয়িতা আছেন। যিনি সকল ধরণের সীমাবদ্ধতার অক্ষমতা থেকে মুক্ত। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি খেয়ালী জীবনাদর্শ। এই জীবনাদর্শের সাথে মানবজাতির ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার কোনো সম্পর্কই নেই। খেয়ালী এই জীবনাদর্শের উৎপত্তি বা জন্মই হয়েছে সাম্প্রতিক ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এর রচয়িতারা মরণশীল এবং নানামুখী সীমাবদ্ধতার অক্ষমতায় আবদ্ধ ও বিজিত। জীবনাদর্শ হিসেবে আবর্জনাই এর শেষ পরিণতি।

**প্রশাসন ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিকাশ ঃ**

দেশের সরকার প্রধানই দেশের প্রশাসনিক প্রধান। রাজনীতি, প্রশাসন পরিচালনায় প্রয়োজনীয় জনমতের যোগানদার। আর প্রশাসন দেশকে এগিয়ে নেয়ার, রাজনীতির লক্ষ্যকে অর্জন করার একমাত্র বিমূর্ত [Abstract] অবলম্বন। পৃথিবীর কোথাও একটি গতিশীল প্রশাসন ছাড়া কস্মিনকালেও কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন হয়নি; কোনো দেশকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হয়নি। আর গতিশীল প্রশাসনের জন্য ১. ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-দল নির্বিশেষে সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধান, ২. নীতির প্রশ্নে আপোষহীন নিরপেক্ষতা, ৩. উঁচুমানের সমন্বয় ও ৪. পারস্পরিক আস্থার প্রয়োজন; এর যে কোনো একটির অভাবও প্রশাসনকে স্থবির করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। উল্লেখিত চারটি অত্যাবশ্যকীয় মানের [Standard] দৃষ্টিতে স্বাধীনতা পরবর্তী সরকারের প্রশাসন দেশের অর্থনৈতিক

৫৯. দৈনিক নয়া দিগন্ত, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ০১ মার্চ ২০১২; পৃ.-০১।
৬০. সূরা আল বাকারা; ০২ ঃ আয়াত - ১৫৩।



www.pathagar.com

ও রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছিল কিনা কিংবা প্রশাসন গতিশীল ছিল কিনা কিংবা তৎকালীন প্রশাসন পরিচালনার প্রকৃত চিত্র কি ছিল, কিভাবে, কোন্ নীতিতে একটি স্বাধীন দেশের প্রশাসন বিকশিত হচ্ছিল এবং এখন কিভাবে বিকশিত হচ্ছে তা উদঘাটনে, অনুসন্ধানে কিছু নিবিড় চিত্র নীচে প্রতীকিভাবে তুলে ধরা হলো। সংগত কারণেই প্রশাসনিক চিত্রগুলো নিয়ে কোনো মন্তব্য করা হলো না। তবে প্রশাসনিক বোদ্ধা পাঠক মাত্রই ধর্মনিরপেক্ষ প্রশাসনের ধরণ তা থেকে অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন বলে আশা করি।

**প্রশাসনিক বিকাশ**

**চিত্র - ১**

"স্বাধীনতার প্রথমলগ্ন থেকেই দেশে চরম নৈরাজ্য বিরাজ করতে থাকে মূলতঃ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার জন্য। আওয়ামী লীগ সরকারের রাষ্ট্র ও দলকে এক করে দেখা এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে দলীয় নেতাদের হস্তক্ষেপের ফলে প্রশাসনিক অবকাঠামো নিস্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। শেখ মুজিবের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে পার্টির আওতাভুক্ত করার ফলে সব জায়গায় আওয়ামী লীগের নেতারা এবং প্রভাবশালী দলীয় সমর্থকরা আমলাদের উপর খবরদারী করতে থাকেন; এ ধরণের পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা কাজ করতে অভ্যস্ত নন বলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা নিস্ক্রিয় ভূমিকাই পালন করতে থাকেন। তাদের কাজ করার স্পৃহা এবং উদ্যম দু'টোই লোপ পায়। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতি তার [PONO 9] অধ্যাদেশ জারী করেন। এ আদেশ বলে যে কোনো সরকারী চাকুরেকে সরকার বিনা কারণে বিনা নোটিশে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করার এখতিয়ার লাভ করে এবং সরকারি এ আদেশের বিরোধিতা করে আইনের সাহায্য নেবার অধিকারও হরণ করে নেয়। ফলে সরকারি চাকুরেদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। তারা তাদের চাকুরির নিশ্চয়তা হারান। এ অবস্থায় বেশিরভাগ সরকারি আমলা তাদের চাকুরি বজায় রাখার জন্য সর্বক্ষণ সচেষ্ট থাকতে বাধ্য হন। এতে করে আমলাতন্ত্র নিরপেক্ষভাবে তাদের দায়িত্ব পালনেও ব্যর্থ হয়। ফলে সমস্ত প্রশাসনে অরাজকতার সৃষ্টি হয়। বেড়ে যায় স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি এবং হঠকারিতা।"[৬১]

**চিত্র - ২**

"আমাদের কৃষিক্ষেত্রে সেচ কাজের জন্য শত শত ডিজেল পাম্প ব্যবহৃত হয়। যেহেতু পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য আমাদের দেশে নেই, আমদানী করতে হয়, সে কারণে ডিজেল

৬১. রাষ্ট্রদূত লেঃ কর্নেল [অবঃ] শরিফুল হক ডালিম বীর উত্তম, যা দেখেছি যা বুঝেছি যা করেছি, নবজাগরন প্রকাশনী, মগবাজার, ঢাকা। প্রকাশকাল - ২০০১। পৃ.-৩৫৭।



www.pathagar.com

খরচ বাঁচানোর জন্য একটা ধারণা আমাদের পেয়ে বসে। সেটি হলো, এই শত শত ডিজেল পাম্পকে বিদ্যুৎ চালিত করা যায় কিনা। 'প্রাকৃতিক সম্পদ' বিভাগে দেশে ডিজেল-সঙ্কট বা পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির অভাব তখন বেশ ভালভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে; ক্রুড পেট্রোলিয়ামের দাম বেড়ে যাবে, এরকম আভাস তখনিই পাওয়া গিয়েছিল। বিদ্যুৎ প্রকৌশলী আতিয়ার রহমানকে দায়িত্ব দেয়া হলো, বাংলাদেশের নদীগুলোর ধার দিয়ে বিদ্যুৎ লাইন বসাবার পরিকল্পনা করতে, যাতে সেচ পাম্পগুলো নদীর ধারে বসিয়ে ডিজেল ছাড়াই সেচকার্য করা যায়। উত্তর বঙ্গের কাজটা প্রথমে শুরু করা হয়। প্রায় তিন-চার মাস খেটে আতিয়ার রহমান একটি গ্রহণযোগ্য স্কীম তৈরি করেছিলেন; কিন্তু অচিরেই দেখা গেল, অর্থের অনটনে স্কীমটি চালু করা সম্ভব নয়। সম্ভবতঃ দক্ষ প্রকৌশলী বা সরকারী কর্মচারী এবম্বিধ কারণে অর্থাৎ কঠিন পরিশ্রমের ফল লাভ না করলে, ক্রমে নিরুৎসাহী হয়ে পড়েন। বাংলাদেশের প্রথম যুগে এ প্রকারের হতাশার অধিকাংশের মূলে ছিলেন তৎকালীন পরিকল্পনা কমিশন। এঁরা নিজেদের এতো দক্ষ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করতেন যে কমিশনের বাইরে কোন চিন্তা বা ধ্যান-ধারণাকে পাত্তাই দিতেন না। কোন মন্ত্রণালয়ের মৌলিক কোন প্রস্তাব রাখার অবকাশ ছিল না, রহস্য করে অনেকে পরিকল্পনা কমিশনের নাম দিয়েছিলেন, 'সুপার-মিনিষ্ট্রি'। আতিয়ার রহমানের স্কীমটি সম্ভবতঃ পরিকল্পনা কমিশনে এতোদিনে কীটদষ্ট হয়ে মুক্তি পেয়েছে।"[৬২]

**চিত্র - ৩**

"নিদির্ষ্ট সময়ে নতুন বঙ্গভবনে আমি ঢুকলাম বঙ্গবন্ধুর কক্ষে। ফাইলের গাদা নিয়ে সা'দত। আমি তাঁকে ইঙ্গিত করলাম ফাইলগুলো রেখে চলে যেতে। জাহাঙ্গীর সা'দত যাওয়া মাত্র আমি দৈনিক কাগজের ঐ পাতাটি বঙ্গবন্ধুর সামনে মেলে ধরলাম। বললাম, 'আপনি জানেন, আমরা বঙ্গোপসাগরে সাত-আটটি দেশকে আনার চেষ্টা করছি, তবু, এ সিদ্ধান্ত নিলেন কেন?'

বঙ্গবন্ধু বললেন - আমি জানি না সব। ডঃ নূরুল ইসলাম আর কামাল করেছে। আপনি কামালকে একটা ফোন করেন।

আমি বললাম - 'আমি আপনাকেই শুধু বলতে পারি। আর কাউকে না।'

সম্ভবতঃ আমি একটু উত্তেজিত হয়েছিলাম। বঙ্গবন্ধু ইতিমধ্যে চা, বিস্কুট আনবার আদেশ করেছেন। উষ্ণ চায়ের কাপে উত্থিত ধুম্রকুন্ডলীর মধ্যে যেন এক যাদুবলে উত্তেজনা প্রশমিত হলো। সাব্যস্ত হলো, বঙ্গোপসাগরে জরিপ ও এলাকা বন্টন বিষয়টি কেবিনেটে আলোচিত হবে।"[৬৩]

---

৬২. ড. মফিজ চৌধুরী, বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায়, প্রাগুক্ত, পৃ.-৭০।
৬৩. ড. মফিজ চৌধুরী, বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায়, প্রাগুক্ত, পৃ.-৭৪।



www.pathagar.com

**চিত্র - ৪**

“বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎ পাওয়া এবং দু’দণ্ড কথা বলা বেশ দূরূহ ছিল। দীর্ঘকাল পরে স্মৃতিচারণ করছি, তাই নাম-ধাম মনে করতে পারছি না, তবে অভিজ্ঞতা থেকে একটি ঘটনার বর্ণনা এরকম ঃ

মন্ত্রী হিসেবে জরুরী বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের যে সময় নেয়া হয়েছে, সেই সময় অনুসারেই উপস্থিত হয়েছি। প্রাইভেট সেক্রেটারী শশব্যস্ত হয়ে কাগজপত্র গুছিয়ে নিচ্ছেন প্রবেশ মুহূর্তে হাতে ধরিয়ে দেবেন বলে, কিন্তু হা হতোস্মি! নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হয়ে প্রায় পনের-বিশ মিনিটের বেশি হয়ে গেল, ডাক এলো না। ব্যাপার কি? ধরুন হয়তো বগুড়া জিলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কিংবা কোনো ছাত্রদল বা টঙ্গীর শ্রমিক নেতার আলাপ-পরামর্শ শেষ হয়নি। তাঁরা যখন বিশ মিনিট পরে বেরুলেন, প্রাইভেট সেক্রেটারী সহাস্যমুখে এগিয়ে আসছেন আমাকে কাগজপত্রগুলো দিতে, এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই কয়েকজন প্রবীণ ও নবীন মহিলা বিনা বাক্যব্যয়ে বঙ্গবন্ধুর ঘরে ঢুকে একের পর এক মালা পরাতে লাগলেন। বঙ্গবন্ধু হাসিমুখে প্রতিটি মালা গ্রহণ করছেন এবং কুশল জিজ্ঞাসা করছেন। আমরা বাইরে থেকে সব দেখতে পাচ্ছি, কারণ দরোজা ততক্ষণে হাট হয়ে গেছে। এরপর সুড়সুড় করে ছোট বাচ্চাদের দল বঙ্গবন্ধুর ঘরে ঢুকল। শুনলাম এরা স্থানীয় এক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীবৃন্দ। কিন্তু কেবিনেটমন্ত্রী ফাইল হাতে বসে আছেন, জামালগঞ্জে কয়লা তোলার ব্যাপারে একটা পলিসিগত সিদ্ধান্তের প্রয়োজন এবং আলোচনাটা জরুরী । আলোচনা যে হয়নি তা নয়, হলো তবে নির্ধারিত সময়ের পঁয়ত্রিশ মিনিট পর। সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনের কালে এ সকল ঘটনা যে অবাঞ্ছিত ও কাজে কর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে - একথা বলারও কেউ ছিল না। এসব কান্ডকারখানা তাঁর ও তাঁর সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে চলছিল। এসব মুখরোচক করে চারপাশে ছিটানো হচ্ছিল, এসব জেনেও আমার সতীর্থরা সতর্ক হননি, পরিণাম নিয়ে ভাবিত হননি।

মনে পড়ে বঙ্গবন্ধু একবার, এই বাড়ির কাছে, টঙ্গীতে শ্রমিক এলাকায় যাবেন বলে স্থির করেন। খবরের কাগজে বেরুলো কোনো এক একজন হোমরা চোমরা শ্রমিক নেতার ঘোষণা, এই উপলক্ষ্যে ঢাকা থেকে টঙ্গী পর্যন্ত তিরিশটি তোরণ তৈরি করা হবে। বাড়াবাড়ির সেখানেই শেষ না, পরের দিন কাগজে বেরুলো অপর এক শ্রমিক নেতার আস্ফালন, তাঁরা চল্লিশটি তোরণ করবেন। এদের হাত থেকে রেহাই ছিল না। চাটুকার, তোষামোদকারী, স্বার্থসন্ধানীর দল তাঁকে ঘিরে ফেলেছিল। উত্তুঙ্গ জনপ্রিয়তায় নন্দিত বঙ্গবন্ধুও যেন সীজারের মত অদৃষ্টের হাতে ক্রমশ সমর্পিত হতে চলেছিলেন।”[৬৪]

---

৬৪. ড. মফিজ চৌধুরী, বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায়, প্রাগুক্ত, পৃ.১০১-১০২।



www.pathagar.com

**চিত্র - ৫**

"আমি যখন মন্ত্রী হিসেবে ইরাকে যাই, তখন আমাকে কূটনৈতিক বিশেষ পাসপোর্টের পরিবর্তে একটি সাধারণ পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়েছিল, আর আমাকে সেটা নিয়েই ইরাক ভ্রমণ করতে হয়। এই ছিল তখনকার দিনের প্রশাসনিক দক্ষতার মান। মন্ত্রী হিসেবে আমাদেরও অদক্ষতা ছিল যথেষ্টই। এর আগে মন্ত্রণালয় চালানোর অভিজ্ঞতা কেবলমাত্র বঙ্গবন্ধু ও মনসুর আলীরই ছিল। তাছাড়া মন্ত্রিসভায় প্রতিটি ব্যক্তি ছিলেন ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্ট - অন্তত আমার অভিজ্ঞতা তাই। কেউ খুলে মনের কথা বলতেন না। সহযোগীকে সৌহার্দের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা দেয়া বিরল ঘটনা ছিল। এমন অবস্থা ছিল যে কেউ তাঁর মনের কথাটি সহকর্মী মন্ত্রীকে বলছেন না বা আলোচনাও করছেন না। মন্ত্রিসভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সুপারিশকৃত বিষয়গুলো অনেক সময়ই বিশদভাবে আলোচিত হতো বটে, কিন্তু তাতে সামগ্রিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ সম্ভব হতো না। বঙ্গবন্ধুর চারটি নীতি কোন মন্ত্রণালয়ের কোন প্রস্তাবে ত্বরান্বিত হচ্ছে- সেসব জানার প্রত্যক্ষ উপায় ছিল না। এই দায়িত্ব ছিল প্রধানত প্লানিং কমিশনের কিন্তু হায়! প্লানিং কমিশন তখন আর একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়েছিল - সে ছিল যেন আর এক সুপার ক্যাবিনেট। আমার মনে হয়েছে অধিকাংশ মন্ত্রী সকল সহকর্মীকে সমান বিশ্বাস করতেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে আদৌ বিশ্বাস নির্ভরতা ছিল না। এই কারণে এক মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব বা সুপারিশ অপর একটি মন্ত্রণালয় যথাযোগ্য গুরুত্ব, উৎসাহ বা সৌজন্য সহকারে পরীক্ষা করতেন না।"[৬৫]

**চিত্র - ৬**

"সমগ্র বিশ্বে শক্তি সংকট [এনার্জি ক্রাইসিস] শুরু হলে আমরা চেয়েছিলাম ডিজেল ব্যবহারকারী মন্ত্রণালয়গুলির পারস্পরিক সক্রিয় সহযোগিতা। যেমন - কৃষি মন্ত্রণালয় সেচ কাজের জন্য ব্যবহৃত ইঞ্জিনগুলো চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় ডিজেল সংগ্রহ করে নিজস্ব সংরক্ষণাগারে মওজুদ রাখবেন, রিফাইনারী থেকে এজন্য প্রয়োজনীয় ডিজেল সরাসরি বরাদ্দ দেয়া হবে। প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয় এরকম প্রস্তাব রাখলেও কৃষি মন্ত্রণালয় কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করেননি।

উত্তরবঙ্গে এক সময় কাপড় ও খাদ্যের [চাল ও গম] অভাব ঘটেছিল। আমি এলাকা সফর করে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করে ঘাটতি অঞ্চলে গম ও কাপড় বরাদ্দের প্রস্তাব করি। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কোনো উদ্যোগ নেননি।

হিলি থেকে বগুড়া পর্যন্ত রাস্তাটি অত্যন্ত খারাপ ছিল। ঐ সময় ভারতীয় সাহায্য-দ্রব্য ডিজেল, কেরোসিন, কাপড়, দিয়াশলাই, সাবান ইত্যাদি ঐ পথেই অর্থাৎ হিলি হয়ে

---

৬৫. ড. মফিজ চৌধুরী, বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায়, প্রাগুক্ত, পৃ.-১০৫-১০৬।



www.pathagar.com

বাংলাদেশে আসতো, ঐ রাস্তার উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ মন্ত্রীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করি এবং বারবার তাগিদ দিই, তিনি এসবে কর্ণপাত করেননি।

পাক-বাহিনী কর্তৃক লুণ্ঠিত এবং পরবর্তী পর্যায়ে ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত কতিপয় স্কুল-কলেজ মেরামতির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিক্ষামন্ত্রীকে পত্র দিয়েছি; কোনো প্রতিকার হয়নি।

কুসুমসারী গ্রাম অগ্নিদগ্ধ হওয়ায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী রেডিওগ্রাম করে জিলা প্রশাসকের মাধ্যমে ঐ গ্রামবাসীর সাহায্যে প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু সেই সাহায্য কোনো দিনই পৌছায়নি। এসব বিচ্ছিন্ন ব্যাপারে হতাশা তিল তিল করে বেড়ে পুঞ্জিভূত হতে থাকে।

অন্যদিকে সংসদ সদস্যরাও নিজ নিজ জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য মাত্রাধিক, বলতে গেলে ডজন ডজন, আঞ্চলিক উন্নয়নমূলক প্রস্তাব পেশ করে মন্ত্রীদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন। মনে পড়ে হাসান আলী তালুকদার এমপি ধুপচাচিয়া থানার উন্নয়নের জন্য এ রকমের ডজন খানেক প্রস্তাব রেখেছিলেন। দেশের আর্থিক প্রতিকূলতা ও প্রাপ্য সম্পদের কথা বিবেচনা করতে অনেকেই ব্যর্থ হয়েছিলেন সে সময়।"[৬৬]

**চিত্র - ৭**

"বঙ্গবন্ধু শেষ দিকে চিন্তাকুল ও অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। এই সময়ের একটি ঘটনা তুলে ধরছি ঃ কেবিনেট মিটিং-এ বঙ্গবন্ধু আসতেন সবার শেষে - নির্ধারিত সময়ের পাঁচ সাত মিনিট পরে। একদিন আমরা সবাই যথাস্থানে বসে আছি। বঙ্গবন্ধু ঢুকলেন, কাঁধের চাদরটি টেবিলের উপরে রেখে, ছড়ার সুরে বললেন, 'রইলো তোমার ঘরবাড়ি। শেখ মজিবর চললো বাড়ি।' একটা হাল্কা রসের সঞ্চার হলো কেবিনেট রুমে, অথচ একটা রহস্যের পূর্বাভাষও মনে হলো। একটু পরে তিনি বললেন, দেশে যে বিশৃঙ্খলা চলছে আর পারা যায় না। আমি আর পারব না। আপনারা যে পারেন, ভার নেন, চালান দ্যাশ। সমস্ত সভাকক্ষে একটা থমথমে ভাব। সিনিয়র মন্ত্রীগণ যথা- সৈয়দ নজরুল, তাজউদ্দিন, কামরুজ্জামান, মনসুর আলী - সবাই নীরব। একে অন্যের দিকে জিজ্ঞাসু নয়নে তাকাচ্ছেন। প্রথমে কে আলোচনা শুরু করেছিলেন মনে নেই, কারণ আমি মনে মনে একটা জবাব তৈরি করছিলাম, যখন আমার পালা আসল, আমি বললাম, স্যার, আপনি এভাবে হঠাৎ করে প্রধানমন্ত্রীত্বের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে পারেন না। আপনাকে আপনার ডেপুটি তৈরি করে নিতে হবে। তাঁর হাতে ভার দিয়ে তবে যেতে পারেন। ভারতে গান্ধী নেহেরু জুটি খুব ভালো কাজ করেছিলেন। আপনি আপনার নেহেরু বেছে নিন। এই সময় আমি সৈয়দ নজরুল ও তাজউদ্দিনের দিকে

---

৬৬. ড. মফিজ চৌধুরী, বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায়, প্রাগুক্ত, পৃ.-১০৮।



www.pathagar.com

হাত প্রসারিত করে যেন সম্ভাব্য নেহেরুদের দেখিয়ে দিলাম। সিনিয়র মন্ত্রীরা কেউ মুখ খুলছেন না। সবাই নীরব। আমার পরেই উঠলেন মনোরঞ্জন ধর। তখনকার আইন মন্ত্রী। তিনি আমার উল্লেখিত গান্ধী-নেহেরু জুটির সমর্থনে বেশ কয়েক মিনিট বক্তৃতা দিলেন। আমি যেন বুঝলাম, দাদা আমার কথার সমর্থন করেই ব্যাপারটাকে নস্যাৎ করে দিলেন। তারপর কথা বললেন, জেনারেল ওসমানী। তিনিও বঙ্গবন্ধুর প্রধানমন্ত্রীত্ব ছেড়ে দেয়ার বিপক্ষে নানা যুক্তি দেখিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্ব ছেড়ে দেয়ার কোন ফর্মাল প্রস্তাব এটি ছিল না। তাঁর ছড়া-কাটা ও তৎপরবর্তী কথার উপরে নির্ভর করেই এই সমস্ত কথাবার্তা হলো। ব্যাপারটা এখানেই থেমে থাকলো। আমরা কেবিনেটের নির্ধারিত এজেন্ডা আলোচনায় অগ্রসর হলাম। মিটিং-এর শেষে, ঘর থেকে বেরুচ্ছি, পাশে তাজউদ্দিন ভাইও চলেছেন। দেখি তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন। আমি বললাম, কি ভাই, হাসছেন কেন? কিছু ভুলটুল বললাম নাকি?

তাজউদ্দিন বললেন, ভাই আপনি বিশ্বাস করেন, উনি ছেড়ে দেবেন? অযথা তর্ক।

আমি বিস্ময়ে বিমূঢ়। পলিটিক্সের একটা ছবক পেলাম প্রাজ্ঞ মন্ত্রী তাজউদ্দিনের কাছ থেকে।

বঙ্গবন্ধু কিন্তু সত্যই চিন্তান্বিত ছিলেন। তিনি এই সময়ে কেবিনেট সভায় কোন কোন সময় বিশৃংখলা, অশান্তি, অভাব অভিযোগ সম্পর্কে দুঃখ করতেন। আমরা শুনতাম, আলোচনাও হতো।

যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায় এসেছিলাম, তার পরবর্তী ঘটনা দু'বছর কয়েক মাস পরে, তেমনি নাটকীয়। ঘটনাটা ঘটেছিল, যেদিন বাকশাল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, আওয়ামী লীগের সকল সংসদ সদস্যের সম্মিলিত সভায়, সেই দিন সভা শেষে, সন্ধ্যা বেলা ৭টা-৮টা নাগাদ প্রধানমন্ত্রীর অভিরুচি অনুযায়ী সৈয়দ নজরুল, তাজউদ্দিন থেকে শুরু করে সকল মন্ত্রী-উপমন্ত্রী পদত্যাগপত্র সই করেন। টাইপ করা কাগজগুলো আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। বঙ্গবন্ধু ৯ জন মন্ত্রী-উপমন্ত্রীর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেন। সেদিন রাতে ৭নং মিন্টু রোডের আমার সরকারী বাস ভবনে আমার নির্বাচনী এলাকার জনসাতেক চেয়ারম্যান অপরাপর আঞ্চলিক নেতৃস্থানীয় অতিথি ছিলেন।...... চেয়ারম্যাম বললেন, 'আমরা ত এখন যাব, চদরী সায়েব।' আমি বললাম, 'চলেন, আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে আমার নিজ গ্রামে।' তখন সকাল ছটা-সাড়ে ছটা; কাগজ আসেনি। আমার অতিথিরা গত রাতের ঘটনা জানেন না। দুপুর বেলা মাঝ রাস্তায় ফেরী-ইস্টিমারে খবরের কাগজ পাওয়া গেল। খবর ছাপা হয়েছে ঃ 'নয়জন মন্ত্রীর পদত্যাগ।'

"গতকাল [রবিবার] ৬ জন মন্ত্রী ও ৩ জন প্রতিমন্ত্রী পদত্যাগ পত্র পেশ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি তাঁহাদের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া



www.pathagar.com

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। পদত্যাগকারী মন্ত্রীগণ হইলেন - ডাক, তার ও টেলিফোন মন্ত্রী শেখ আবদুল আজিজ, পাট বিষয়ক মন্ত্রী জনাব শামসুল হক, ভূমি সংস্কার ও ভূমি প্রশাসন মন্ত্রী মোল্লা জালাল উদ্দিন, সমবায়, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী জনাব মতিয়র রহমান, জাহাজ চলাচল, আই ডবলু টি এ ও বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী এম এ জি ওসমানী এবং প্রাকৃতিক সম্পদ বিজ্ঞান কারিগরী গবেষণা ও আণবিকশক্তি বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ মফিজ চৌধুরী।"
ইত্তেফাক। সোমবার, ২৪ আষাঢ়, ১৩৮১। জুলাই ৮, ১৯৭৪"[৬৭]

**চিত্র - ৮**

"মন্ত্রিপরিষদেও **সমন্বয়ের অভাব**। প্রমাণ : সংসদ উপনেতা বেগম সাজেদা চৌধুরী বলেছেন - 'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মতো চাঁদা তুলে পদ্মা সেতু করব।' বিষয়টি নাপিতের ছোট বাটি দিয়ে ভারত মহাসাগরের পুরো পানি উত্তোলনের মতো। অন্যদিকে অর্থমন্ত্রী মুহিত সাহেব বলেছেন - ' যারা চাঁদা তুলতে যাবে তাদের পেটাও।' প্রধানমন্ত্রী দুটি উক্তিকে কীভাবে নিয়েছেন জানি না। প্রতিক্রিয়াও পায়নি। "[৬৮]

**রাজনৈতিক বিকাশ**

ডিসেম্বর ১৯৭২ থেকে জানুয়ারী ১৯৭৫ তিন বছরের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নীট রেজাল্ট বা চূড়ান্ত ফলাফল হলো 'বাকশাল।' এরই মধ্যে প্রেসিডেন্সিয়াল ও পার্লামেন্টারী পদ্ধতি উভয়টিই পরীক্ষা করা সম্পন্ন হয়েছে। দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির কোনো উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি। একটি অটোক্রেটিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় দেশের উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে 'বাকশাল' ছিল তৃতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা। এই তৃতীয় পর্বে ক্ষমতার নিরঙ্কুশ ব্যবহারের দৃশ্য ও অদৃশ্যমান প্রতিক্রিয়ায় পুরো রাষ্ট্রীয় কাঠামোটিই ভেঙে পড়লো ১৯৭৫-এ। স্বাধীনতাত্তোর সেই পরীক্ষা পর্ব শেষ হয়ে আবার ফিরে আসলো পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার। এখনও তা অব্যাহত আছে। পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকারের মাধ্যমেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে দেশে পুনরায় ১৯৭২ সালের সংবিধান সংশোধিত আকারে বহাল করা হয়েছে এবং "ধীরে চলো নীতি"-তে সরকার পুনরায় 'বাকশাল' পর্বে ফিরে যাবার রাজনীতিকে সযত্নে বিকশিত করছেন। আর এই ফিরে যেতে 'ছলে-বলে-কৌশলে' হলেও সরকারের আরো পাঁচ বছরের ম্যান্ডেট প্রয়োজন। এখন বাংলাদেশের রাজনীতি সেই লক্ষ্যেই আবর্তিত হচ্ছে। সেই লক্ষ্যকে অর্জন করতে রাজনীতিকে সেভাবেই বিকশিত করার নিরলস চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এ বিষয়ে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার কতটুকু সফল হবে তা সময়ই বলে দেবে।

---

৬৭. ড. মফিজ চৌধুরী, বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায়, প্রাগুক্ত, পৃ.১১০-১১১।
৬৮. নূরে আলম সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত।



www.pathagar.com

স্বাধীনতার পর প্রেসিডেন্সিয়াল ও পার্লামেন্টারী পদ্ধতির পরীক্ষায় অসফলতার প্রেক্ষিতে একটি অটোক্রেটিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় দেশের উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে 'বাকশাল' ছিল তৃতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে 'বাকশাল' একটি রাজনৈতিক বিস্ফোরণ। মানুষের মৌলিক অধিকার হরণের রাষ্ট্রীয় টুলস্। কারণ স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি মূল উপাদান ছিল গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা। 'বাকশাল' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের সেই গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হয়েছে নীরবেই। হরণ করা হয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধের গণতান্ত্রিক চেতনাকে। এ বিষয়ে কোনো কথা শুনতেও চাওয়া হয়নি; এমনকি সামান্যতম সহনশীলতাও বরদাশ্‌ত করা হয়নি। জাতীয় জীবনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ সে দিনের একটি নাতিদীর্ঘ বর্ণনা নীচে উল্লেখ করা হলো ঃ

"প্রেসিডেন্সিয়াল ও পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার দেশের কাংখিত উন্নয়নে ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে সরকার দলীয় সুবিধাবাদী গোষ্ঠি নিজেদের স্বার্থ ও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারপ্রধানকে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য প্ররোচনা দিতে থাকে। ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকেই শেখ মুজিব একদলীয় শাসন ব্যবস্থার পক্ষে প্রচারণা শুরু করেন। নভেম্বর ১৯৭৪-এ মস্কোপন্থী দলগুলো সরকারকে একদলীয় শাসন কায়েম করার জন্য আহ্বান জানায়। শেখ মুজিবের একান্ত বিশ্বস্ত তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মনসুর আলীকে সোভিয়েত ইউনিয়নের দূতাবাসে ডেকে একদলীয় সরকার কায়েমের পরামর্শ দেয়া হয়। এভাবে ঘরে-বাইরে কম্যুনিস্ট বলয় শেখ মুজিবুর রহমানকে প্ররোচিত করতে সফল হয়। ১৩ জানুয়ারী ১৯৭৫ সারাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। একই দিন বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স জারি করা হয় এবং সংবিধানের কতিপয় ধারা স্থগিত ঘোষণা করা হয়। সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৮ জানুয়ারী ১৯৭৫। আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় শেখ মুজিবুর রহমান নতুন সিস্টেম বাকশাল চালু করার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন। কিন্তু উপস্থিত সদস্যদের অনেকে এ সিদ্ধান্তের সাথে ঐক্যমত্য হতে অপারগতা প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী ২ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট ধরে বক্তৃতা করেন। এ বক্তৃতাকে সংসদ সদস্যদের বৃহৎ অংশ ঘনঘন করতালির মাধ্যমে সমর্থন জানান। এই বক্তৃতার পর অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করা হয়। পরদিন জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এবং জনাব শামছুল হকও বক্তৃতা করার অনুমতি চান। কিন্তু তাদের সে অনুমতি না দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'আর বক্তৃতা নয়। তোমরা আমারে চাও কি না সে কথাই শুনতে চাই।' সবাই তাঁর এ ধরণের বক্তব্যে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। কারণ কথা ছিল, সব সদস্যকেই এ প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখার সুযোগ দেয়া হবে। তিনি আবার বললেন,'বলো, আমারে চাও কিনা?'



www.pathagar.com

এরপর আর কোনো বক্তব্য দেয়ার আর অবকাশ রইল না। তথাপি বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানী তার বক্তৃতায় নির্ভয়ে বললেন, 'আমরা ইয়াহিয়া খানকে সরিয়ে মুজিব খানকে চাই না।' তারপর ২৫ জানুয়ারী ১৯৭৫। সংসদে কোনো বিতর্ক ছাড়াই পাশ করানো হয় সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী। সংশোধনীতে বলা হয়, 'রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সব মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীরা সংসদ সদস্য না হলে ভোট দিতে পারবেন না। প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী সংসদ সদস্য হবেন তেমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। মন্ত্রী পরিষদ রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারেন, তবে রাষ্ট্রপতি তা কার্যকর করলেন কি করলেন না সে সংক্রান্ত ব্যাপারে আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না।' সংশোধনীতে আরো বলা হয়, 'এই আইন প্রণয়নের পূর্বে যিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি রাষ্ট্রপতি পদে থাকবেন না এবং রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে। শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হবেন এবং রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করবেন। এই আইন প্রবর্তনের ফলে তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকবেন এমনিভাবে যেন তিনি এই আইনের দ্বারা সংশোধিত সংবিধানের অধিনেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে একজন রাষ্ট্রপতি ও একজন উপ-রাষ্ট্রপতি থাকবেন। রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে থাকবে। তিনি প্রত্যক্ষভাবে অথবা তার অধিনস্থ কর্মচারীর মাধ্যমে যে ক্ষমতা নির্ধারণ করবেন উপ-রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র সেই ক্ষমতাই প্রয়োগ করতে পারবেন। রাষ্ট্রপতিকে তার দায়িত্ব পালনে সাহায্য ও পরামর্শ দানের জন্য একটি মন্ত্রী পরিষদ থাকবে। রাষ্ট্রপতি তার বিবেচনায় সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে একজন প্রধানমন্ত্রী ও আবশ্যক মনে করলে অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী নিয়োগ করতে পারবেন। প্রত্যেক মন্ত্রী সংসদে বক্তৃতা করতে এবং কার্যাবলীতে অংশ নিতে পারবেন তবে তিনি যদি সংসদ সদস্য না হন তাহলে ভোট দান করতে পারবেন না। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন অথবা তার নির্দেশে উপ-রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী ঐ সভায় সভাপতিত্ব করতে পারবেন। মন্ত্রীগণ রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।' এছাড়া সংশোধিত সংবিধানে 'রাষ্ট্রপতিকে দেশে শুধু একটি মাত্র রাজনৈতিক দল গঠন করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যা জাতীয় দল নামে অভিহিত হবে। কোনো ব্যক্তি জাতীয় দল ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দল গঠন কিংবা ভিন্ন ধারার কোনো রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। কার্যভারকালে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কোনো ফৌজদারী কার্যধারা দায়ের করা বা চালু রাখা যাবে না এবং তার গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য কোনো আদালত হতে পরোয়ানা জারি করা যাবে না।' ঐ সংশোধনীর পক্ষে ২৯৪ জন সাংসদ ভোট দেন।



www.pathagar.com

একজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য এবং তিনজন বিরোধী সংসদ সদস্য ওয়াক আউট করেন। এরা হলেন যথাক্রমে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, জাসদের আব্দুল্লাহ সরকার, আব্দুস সাত্তার ও ময়নুদ্দিন আহমেদ। বিলটি উত্থাপন করা হলে আওয়ামী লীগের দলীয় চীফ হুইপ শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখার প্রেক্ষিতে কোনো প্রস্তাব উত্থাপনের সুযোগ না দেবার আহ্বান জানান। এ পর্যায়ে বাংলাদেশ জাতীয় লীগের জনাব আতাউর রহমান খান বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করে আলোচনার সুযোগ দানের জন্য স্পীকার জনাব মালেক উকিলকে অনুরোধ করেন। কিন্তু স্পীকার তা নাকচ করে দেন। পরে কণ্ঠভোটে চীফ হুইপের প্রস্তাব গৃহীত হয়। তারপর আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর সংসদে 'জরুরী ক্ষমতা বিল ১৯৭৫' পেশ করেন। চীফ হুইপ এক্ষেত্রেও মৌলিক অধিকার স্থগিতকরণ বিধি প্রয়োগ না করার আবেদন জানালে বিষয়টি কণ্ঠভোটে কোনো আলোচনা ছাড়াই আইনে পরিণত হয়ে যায়।"[৬৯]

এভাবে একদলীয় শাসনের কবলে বাংলাদেশ নিমজ্জিত হয়। একদিকে অর্থনৈতিক দুর্ভিক্ষের বিষাক্ত ছোবলে অগণিত মানুষের মৃত্যু হচ্ছে প্রতিদিন। আর অন্যদিকে জাতীয় দল গঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দুর্ভিক্ষকে বাংলাদেশের মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। একদিকে দেশের জাতীয় সম্পদ যেমন নিরংকুশভাবে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে 'আমার লোকদের পকেটে' অন্যদিকে দেশের সকল ক্ষমতা নিরংকুশভাবে কেন্দ্রীভূত হয়েছে এক ব্যক্তিকে ঘিরে। সম্পদ ও ক্ষমতার এই এককেন্দ্রীকরণের ফলে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ মূলতঃ এক দলের কাছে জিম্মী হয়ে পড়েছিল। আর এভাবেই স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার রাজনীতির গৌবোজ্জল [!] বিকাশ হচ্ছিল। এরপর এক অনিবার্য পতনের পর জিম্মী মানুষ মুক্তি পেয়েছিল।

আবার মানুষকে জিম্মী করার রাজনীতির পথচলা শুরু হয়েছে। যার প্রথম পর্যায়ে বিরোধীমতের নেতৃবৃন্দকে নানান অজুহাতে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয়েছে। হয় আপোষ না হয় মৃত্যু। পরবর্তী পর্যায়ে নেতৃত্বহীন জনগণকে জিম্মী করার সকল কলাকৌশল প্রয়োগে আবারও একদলের কাছে দেশের পনের কোটি মানুষকে লৌহকঠিন শাসনের আওতাভুক্ত করা হবে। সে রাজনীতির বিকাশ চলছে দেশে-বিদেশে, নোবেল-টিপাইমুখে, তিস্তায়-ট্রানজিটে, যুদ্ধাপরাধ আর মূল্যবোধের আইডেন্টিটি নিয়ে। এছাড়াও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির বর্তমান নীতি-নৈতিকতাহীন বিকাশের এক নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন স্বাধীনতার লড়াকু সৈনিক বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম । তাঁর ভাষায় ঃ

"ইদানীং এক মজার ব্যাপার দেখছি, বঙ্গবন্ধুর জীবিতকালে যারা তার কলিজা পুড়ে ছারখার করত তারা সব উচ্চ পদে আসীন। কার কথা বলব? শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী

৬৯. রাষ্ট্রদূত লেঃ কর্ণেল [অবঃ] শরিফুল হক ডালিম বীর উত্তম, যা দেখেছি যা বুঝেছি যা করেছি, প্রাগুক্ত। পৃ.-৩৫৮-৩৬১।



www.pathagar.com

১৯৭২-এর পরের সংবাদপত্রের পাতা উল্টালে দেখা যাবে কত শতবার বঙ্গবন্ধুর চামড়া দিয়ে ভদ্রমহিলা ঢুগঢুগি বাজিয়েছেন, জুতো বানিয়েছেন। মাদারীপুরের জাসদের নেতা জনাব শাহজাহান খান, গণবাহিনী হিসেবে দু'শর ওপর খুনের মামলার আসামি ছিলেন। তিনি আজ মহাজোটের মন্ত্রী।.....একবার আওয়ামী লীগের এক সভায় বেলকুচি গিয়ে লতিফ মির্জাকে নিয়ে এক মারাত্মক বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছিলাম। বেলকুচি আওয়ামী লীগের সভাপতির বাড়িতে রাতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। জেলার সাধারণ সম্পাদক লতিফ মির্জাও সাথে ছিলেন। গিয়ে শুনি গণবাহিনী করার সময় লতিফ মির্জা ওই আওয়ামী লীগ নেতার ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দু'জনকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করেছিলেন। আওয়ামী লীগের কী মারাত্মক মাহাত্ম্য! হত্যাকারীকেও দলে নিলে কর্মীরা মাথা নুইয়ে মেনে নেয়। ইয়াহিয়া-টিক্কা খান এখন বেঁচে থাকলে তাদেরও আওয়ামী লীগে নিলে মনে হয় কেউ আপত্তি করত না। আমি একবার রাজশাহী থেকে ফেরার পথে লতিফ মির্জার বাড়ি গিয়েছিলাম। রাস্তায় যখন জিজ্ঞেস করলাম, লতিফ মির্জার বাসা কোথায়? প্রায় সবাই বলল, কোন লতিফ মির্জা? ওই সেই জাসদের? বললাম, হ্যাঁ। লোকজন দেখিয়ে দিলো। এবার বুঝুন আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী তার পরিচয় জাসদের লতিফ মির্জা। গণবাহিনীর নেতা হিসেবে কত আওয়ামী লীগ কর্মীকে হত্যা করেছেন তার কোনো হিসাব-নিকাশ নেই। কিন্তু তিনি এখন আওয়ামী লীগ নেতা। নাগরপুরের খন্দকার বাতেন এখন আওয়ামী লীগের এমপি। কালিহাতীর গণবাহিনীর সবচেয়ে ঘাতক নেতা হরমুজ বিএসসি যে একদিনে ঝনঝনিয়া মাদ্রাসায় প্রকাশ্য দিবালোকে ১৩/১৪ জন আওয়ামী লীগ সমর্থককে গুলি করে হত্যা করেছিল। তাকেও আওয়ামী লীগ গ্রহণ করেছে।

সেদিন ড. কামাল হোসেন বলেছেন, এ আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ নয়। এই সোজা কথাটাই তো আমি এত বছর বলে বেড়িয়েছি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের আওয়ামী লীগ আর এ আওয়ামী লীগ এক নয়। খোন্দকার মোশতাকের মন্ত্রিসভায় অংশ নেয়ার কারণে কত ত্যাগী নেতার রাজনৈতিক জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু সে দিন যে এইচ টি ইমাম কেবিনেট সচিব হিসেবে মন্ত্রিসভার শপথের সব ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি আজ তার কন্যার সরকারের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি। কী মিল অমিল! যারা জাতির পিতাকে তিলে তিলে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে তারা প্রায় সবাই আজ পাদপ্রদীপের সামনে। অর্থমন্ত্রী, জিয়াউর রহমানের সময় চাকরী করেছেন, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের মন্ত্রী ছিলেন, এখন আবার মাথা ঝাঁকিয়ে মন্ত্রী। এ কে খোন্দকারের কথা তো আগেই বলেছি। ভদ্রলোক বিমান বাহিনীর প্রধান হিসেবে ব্যর্থ হয়ে এরশাদের মন্ত্রী হয়েছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারস ফোরাম নামে এক দোকান খুলে মহাজোট সরকারের নিধিরাম সরদার মন্ত্রী হয়েছেন।.....সত্যিই ইদানীং আওয়ামী



www.pathagar.com

নেতৃত্বের ভাবসাব দেখে, তাদের দমনপীড়নের মাত্রা দেখে মাঝেসাঝে মনে হয় ১৯৭৫-এর ১৫ অগাস্ট এক কাপড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে খুনিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম করে ১৬ বছর নির্বাসনে কাটিয়ে, ২৮ বছর গোশত মুখে না দিয়ে কি ভুল করেছি? পিতার মৃত্যুর পর দাঁত কেলিয়ে হি হি করে যারা হেসেছে তারাই তো দেখছি ভালো আছে। '৭৫-এর ১৫ আগষ্ট যাদের ফকির মিসকিনের মতো রেখে গিয়েছিলাম তারা অনেকেই এখন হাজার কোটির মালিক। নেতা, দল এমনকি রাজনীতিকেই তারা এখন খরিদ করতে পারে। কী তাজ্জব ব্যাপার! ........কোনো ন্যায়নীতি নেই, মূল্যবোধ নেই, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নেই। এ যেন হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রীর দেশে বাস করছি।

'৮২-'৮৩-র দিকে পাকিস্তান হাইকমিশনের এক দাওয়াতে ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম গিয়েছিলেন। সেখানে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ খুনিরা কেউ আমন্ত্রিত ছিল। শুধু সেই কারণে তাকে আওয়ামী লীগ থেকে বের করে দিয়েছিল। জনাব এ্যাডভোকেট সিরাজুল হক '৯০-এর গণ অভ্যুত্থানের পর স্বৈরাচার হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের মামলায় উকিল হয়েছিলেন বলে আওয়ামী লীগ ছাড়তে হয়েছিল। আর জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোটেরই এখন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ অন্যতম প্রধান শরিক। এসবই আল্লাহর লীলা।"[৭০]

**সামাজিক ক্ষেত্রে বিকাশ ঃ**

সামাজিক জীবনের দর্পন হলো সংবাদপত্র। সংবাদপত্রেই প্রতিফলিত হয় সমাজের বাস্তব চিত্র। সংবাদপত্রের মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে তার পারিপার্শ্বিক সমাজের ছবি; চিহ্নিত হয় সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি; উদঘাটিত হয় সমাজের দুর্নীতি; প্রতিফলিত হয় জাতীয় জনমত; ভূমিকা পালন করে সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকার সংশোধনে; সাহায্য করে নিঃস্ব-অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে; ভূমিকা পালন করে রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনমত গঠনে; উদ্বুদ্ধ করে দারিদ্র দূরীকরণে উদ্যোগ গ্রহণে; আইন-শৃংখলা, প্রশাসন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, জীবনের বা সমাজের এমন কোনো দিক নেই যা সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হয় না। সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে সংবাদপত্র হচ্ছে 'ফোর্থ স্টেট' বা চতুর্থ রাষ্ট্র। সমাজের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্রের বিকাশে, সংবাদপত্রের ন্যায়সংগত ভূমিকা পালনে ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভূমিকা কি ছিল তা তৎকালীন সময়ে গৃহীত পদক্ষেপ হতেই সুস্পষ্ট হবে। সংবাদপত্র যদি হলুদ সাংবাদিকতাকে পুঁজি করে সংবাদ পরিবেশন করে তবে আইনের আশ্রয় নিয়ে এর প্রতিকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা রয়েছে। তাই সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে শক্তির ভাষায় কথা

৭০. http://www.dailynayadiganta.com/details/64730



www.pathagar.com

বলা অগণতান্ত্রিক বলেই প্রতীয়মান হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার রাষ্ট্রীয় আদর্শের ছত্রছায়ায় একটি পরিচ্ছন্ন সমাজ বিনির্মাণে যথাযথ অবদান রাখতে সংবাদপত্রকে বাধাগ্রস্ত করা, সঠিক সংবাদ না প্রকাশে শক্তি প্রয়োগ করা এবং তার সমর্থনে আইন প্রনয়ণ করা, সাংবাদিকদের হত্যা করা, নির্যাতন করা, গুম করা, কোনোভাবেই গণতান্ত্রিক আচরণ বলা যায় না। এটা সুস্পষ্টভাবে জনমতকে শক্তি প্রয়োগে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখার নগ্ন প্রকাশ।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নতুন সমাজ গড়তে সংবাদপত্রের ভূমিকাও বৃদ্ধি পায়। সেই সাথে সমাজের প্রকৃত অবস্থা যাতে দেশের সাধারণ মানুষ এবং সচেতন মহল অবহিত হতে না পারে তাই পাল্লা দিয়ে সংবাদপত্রের উপর শক্তি প্রয়োগও বাড়তে থাকে। ১৯৬০ সালে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান প্রর্বতন করেছিলেন 'প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স' নামের কালাকানুন। এই কালাকানুন দিয়েই ১৯৭২ সালে তৎকালীন ধর্মনিরপেক্ষতার সরকার 'গণশক্তি', 'হক কথা', 'লাল পতাকা', 'মুখপত্র', 'বাংলার মুখ' 'স্পোকসম্যান'সহ ১০টি সংবাদপত্রের মুখবন্ধ করে দিলেন। এক বছর পর অর্থাৎ ১৯৭৩ সালে এই মুখবন্ধ হয়ে যাওয়া সংবাদপত্রের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ১০৮টিতে। 'দৈনিক গণকণ্ঠ' এবং 'দৈনিক দেশবাংলা'-র সম্পাদক ও সহকর্মীদের কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হলো। সত্য কথা বলা বা লেখার জন্য কারাবরণ মানে সমাজে মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেয়া এবং ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে স্বৈরাচারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া।

দেশের সাংবাদিক সংগঠনগুলো আইয়ুব খানের সে কালাকানুন প্রয়োগ করে সমাজের দর্পনগুলোকে একের পর এক বন্ধ করে দেয়ার প্রতিবাদে আন্দোলনের হুমকি দিলেন। ধর্মনিরপেক্ষ সরকার আইয়ুব খানের অর্ডিন্যান্সটি বাতিল করলেন। আর তাছাড়া আইয়ুব খানের অর্ডিন্যান্স দিয়ে বাংলাদেশ চালানো ঠিক কিনা তা একটি বিরাট নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্ন। তাই ১৯৭৩ সালের ২৮ আগষ্ট সঙ্গত কারণে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাক্ষরিত তার চেয়েও উন্নতমানের 'প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশন [ডিক্লারেশন ও রেজিষ্ট্রেশন] অর্ডিন্যান্স' নামে একটি অর্ডিন্যান্স জারী হল। নতুন অর্ডিন্যান্সটিতে আইয়ুব আমল, ব্রিটিশ আমলের সংবাদপত্র দলনের যত ধারা প্রবর্তিত হয়েছিল, তার সব কটি এই নতুন অর্ডিন্যান্সটিতে সন্নিবেশিত হল। ফলে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের সব দুয়ার বন্ধ হয়ে গেল। 'প্রেস ট্রাস্ট' ছিল আইয়ুব খান কর্তৃক সংবাদ নিয়ন্ত্রণের আরেক হাতিয়ার। ধর্মনিরপেক্ষ সরকার 'সংবাদপত্র ব্যবস্থাপনা বোর্ড' নামে সেই হাতিয়ার আপন করে নিল। এছাড়াও 'নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণাদেশ' এবং 'বিজ্ঞাপন নীতি' জারী করে নতুন নতুন হাতিয়ারের আঘাতে আঘাতে সংবাদপত্র জর্জরিত হয়ে উঠলো। নিউজপ্রিন্ট কোটা না পাওয়ায় এবং বাজার



www.pathagar.com

হতে নিউজপ্রিন্ট ক্রয়ে বাধা-নিষেধ আরোপ করায় বেশ কয়েকটি পত্রিকা বন্ধ করে দিতে হয়। সংবাদপত্রের রক্ত সঞ্চালন হলো বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন বরাদ্দের ক্ষেত্রেও পরানো হলো নিয়ন্ত্রণের বেড়ি। কোন্ পত্রিকার উপর সরকার কতটা সন্তুষ্ট বিজ্ঞাপন বরাদ্দের অবস্থা দেখে তা বলে দেয়া সম্ভব ছিল। সরকার বিরোধী সংবাদপত্রগুলোকে সরকারি বিজ্ঞাপন থেকে বঞ্চিত করা হলো। এরপর সংবাদপত্রের উপর 'জরুরী আইনের' আঘাত হানা হয় ১৯৭৪ সালে। এই আইনের বহু ধারা-উপধারা সন্নিবেশিত করে আরও কঠোরভাবে সংবাদপত্রের কন্ঠরোধ নিশ্চিত করা হলো। নির্দেশ জারী করা হলো[৭১] ঃ

০১. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কলামে কিছু ছাপানো যাবে না।
০২. দুর্নীতি সম্পর্কে কোনো সংস্থার বিরুদ্ধে কিছু ছাপানো যাবে না।
০৩. মিছিল-সভা [যদি সরকার সমর্থক না হয়] সম্পর্কে কিছু ছাপানো যাবে না।
০৪. দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে কোনো সংবাদ ছাপানো যাবে না।
০৫. অনাহারে মৃত্যু সম্পর্কে কোনো কিছু ছাপানো যাবে না।
০৬. থানা লুট, পিটিয়ে মারা সম্পর্কে কিছু ছাপানো যাবে না।
০৭. দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কিছু ছাপানো যাবে না।
০৮. বস্তি উচ্ছেদ নিয়ে কিছু ছাপানো যাবে না।
০৯. কোনো রিলিফ সংস্থার বিরুদ্ধে কোনো কিছু ছাপানো যাবে না।
১০. সীমান্তে পাচারের বিরুদ্ধে কোনো কিছু ছাপানো যাবে না।
১১. কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো মন্তব্য করা যাবে না।
১২. পুলিশ বা রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে কোনো কিছু ছাপানো যাবে না।
১৩. শ্রেণী বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এমন কোনো কিছু ছাপানো যাবে না।
১৪. সরকারের কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা যাবে না।
১৫. প্রতিরক্ষা সম্পর্কে কোনো কিছু ছাপানো যাবে না।

এসব নির্দেশ অমান্যের জন্য নির্ধারিত ছিল চরম দণ্ড। ১৯৭৪-এর মহাদুর্ভিক্ষের খবর ছাপানোয় ৬টি সংবাদপত্র স্থগিত এবং ২টি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এরপরও যখন সমাজের প্রকৃত চিত্র তথা ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের কর্মকাণ্ড এবং দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মানুষের অসহায়ত্ব এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার চিত্র চিত্রিত হতে লাগলো সংবাদপত্রে তখন সমাজের দপর্ন সংবাদপত্রের উপর আসলো কঠিন আঘাত। ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন জারী করা হলো 'সংবাদপত্র ডিক্লারেশন বাতিলকরণ অর্ডিন্যান্স এবং সরকারি মালিকানাধীন সংবাদপত্র ব্যবস্থাপনা অর্ডিন্যান্স।' এই অর্ডিন্যান্সের ক্ষমতাবলে ৪টি

৭১. দৈনিক বাংলা, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫।



www.pathagar.com

দৈনিক পত্রিকা রেখে [২টি বাংলা, ২টি ইংরেজি] দেশের ১২৬টি পত্রিকার সবগুলোর ডিক্লারেশন বাতিল করে দেয়া হলো।

প্রসঙ্গতঃ ১৯৭৩ সালে নির্বাচনের পর দৈনিক বাংলার সহকারী সম্পাদক নির্মল সেন [অনিকেত] 'আমি স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই' শীর্ষক একটি উপ-সম্পাদকীয়ের বক্তব্য তুলে ধরছি। লেখায় তিনি এক সপ্তাহের একটি ঠিকুজি তুলে ধরেন ১৩টি হত্যাকাণ্ডের। তিনি বলেন, 'এ খবর সব খবর নয়। সব খবর সংবাদপত্রে পৌঁছে না। সব খবর পৌঁছে না থানায়। দূর-দূরান্ত থেকে কে দেয় কার খবর? আর দিতে গেলে জীবনের যে ঝুঁকি আছে সে ঝুঁকি নিতেই বা কতজন রাজি? তারপর তিনি প্রশ্ন করেছেন ঃ ০১. ১৯৭২ সাল হতে আজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত কয়টি হত্যাকাণ্ডের কিনারা হয়েছে? ০২. কয়জন হত্যাকারী গ্রেফতার হয়েছে? ০৩. ক'টি গাড়ি হাইজ্যাক হয়েছে? সে হাইজ্যাকার কারা? কি তাদের পরিচয়? কি তাদের ঠিকানা? ০৪. কারা গ্রেফতার হয়েছে? ০৫. পুলিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে প্রায়ই অভিযোগ করা হয় যে, অভিযুক্তদের ধরা হলে ফোনের জন্য তাদের মুক্তি দিতে হয়। এ অভিযোগ কতটুকু সত্য? এই ফোন কারা করে থাকেন? খুঁজে দেখতে হবে এই হত্যাকারীরা কাদের প্রশ্রয়ে বেড়ে উঠেছে। নইলে দিনের পর দিন হত্যা, রাহাজানির খবর বের হয়; অথচ একটি অপরাধীরও শাস্তি হয় না। এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে কি করে?' ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের পক্ষে এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব হয়নি।

'আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম' প্রতিদিন ঢাকা শহর থেকেই ৩০-৪০টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন করছিল। ঢাকায় প্রতি ঘন্টায় ৩-৪ জন লোক মারা যেত অনাহারে। এর এক পর্যায়ে আঞ্জুমানের লাশ দাফনের কথা খবরের কাগজে প্রকাশ করা বন্ধ করে দেয়া হয় সরকারি আদেশে। অগাস্ট থেকে ডিসেম্বর মাস অব্দি প্রতিটি জিলা থেকে খবর আসতে থাকে যে, শত শত লোক অনাহারে মারা যাচ্ছে। ভাত নেই, কাপড় নেই, বাসস্থান নেই। রিলিফের কেলেঙ্কারীর খবর ছাপা হচ্ছিল খবরের কাগজে। কিন্তু অপরাধী ব্যক্তিদের একজনেরও বিচার হয়েছে এমন কথা শোনা যায়নি কখনো। কেন হয়নি সে খবরও সংবাদপত্রের পাতায় আসেনি। অসহায় মানুষের আর্তনাদ কম্পিত করেনি ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বাংলাদেশী প্রবক্তা সরকারের শাসককুলের হৃদয়। এভাবেই সামাজিক জীবনের বিকাশ হচ্ছিল আর মানুষ ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সুফল পাচ্ছিল প্রতিনিয়ত!

১৯৭৫ -এর অগাস্টে এর একটি ছন্দপতন হয়। তারপর ১৯৯৬-এ এর পুনরুত্থান ঘটে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের সূত্র ধরে। যে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের কবর রচনা করা হয়েছিল ১৯৭৪-এ। আইনের মাধ্যমে দাফন করা সংসদীয় পদ্ধতির হাত ধরে ১৯৭৫ হতে ১৯৯৬ পর্যন্ত ২১ বছর পর একবার এবং তারপর ২০০৮ সালে আরও



www.pathagar.com

একবার ফিরে আসলো সেই ধর্মনিরপেক্ষতার সুফল! এই সুফলের কিছু চিত্র তুলে ধরলাম ঃ

**চিত্র-০১**

**কাফনের কাপড় আতঙ্ক**[৭২] ঃ দুই বছরের ব্যবধানে যশোরের দুইজন প্রথিতযশা নির্ভীক সাহসী সাংবাদিককে দুর্বৃত্তরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। যশোরের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ, অব্যাহত সন্ত্রাস, খুন, গুম, ধর্ষণ, চোরাচালান সিন্ডিকেটসহ একাধিক বিষয়ে ধারাবাহিক লেখনীর কারণে ১৯৯৮ সালের ৩০ আগষ্ট গভীর রাতে একদল অজ্ঞাত দুর্বৃত্ত বোমা হামলা চালিয়ে 'রানার' পত্রিকার সম্পাদক আর. এম. সাইফুল আলম মুকুলকে হত্যা করে। দীর্ঘ দুই বছরেও এই হত্যা মামলার বিচার শুরু হয়নি। এই হত্যাকাণ্ডের রেশ কাটতে না কাটতেই গত ১৬ জুলাই রাতে শহরের হাসপাতাল মোড়ের জনাকীর্ণ এলাকায় অবস্থিত জনকণ্ঠের অফিসে কর্মরত অবস্থায় সাহসী সাংবাদিক শামছুর রহমানকে দুর্বৃত্তরা গুলী করে হত্যা করে।

**চিত্র-০২**

**আবার সাংবাদিক হয়রানি** [৭৩]:

একজন সাংবাদিক তার বিবেকের কাছে, পাঠক সমাজ তথা দেশ, রাষ্ট্র ও জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন। তার এই দায়বদ্ধতা নির্মোহ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের, জনহিতার্থে অনুদ্ঘাটিত অকপট সত্য প্রকাশের। তার দায়িত্ব কারো মনোরঞ্জন করা নয়। বরং দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সাংবাদিকতার নীতি-আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হয়ে সুচারুভাবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেক সাংবাদিককেই বহু রথী-মহারথীসহ পেশিশক্তিধর প্রভাবশালীদের বিরাগভাজন হতে হয়েছে, ক্ষেত্রবিশেষে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে, এমনকি প্রাণও দিতে হয়েছে।

আমাদের পটুয়াখালী প্রতিনিধি এমনি একটি ন্যাক্কারজনক ঘটনার কথা জানিয়েছেন। ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় এক সাংসদকে নিয়ে প্রকাশিত একটি সংবাদ তাদের মনঃপূত না হওয়ায় বাউফল ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক গত ১৫ জানুয়ারি দলবল নিয়ে দিনদুপুরে দৈনিক ইত্তেফাকের সাংবাদিকের বাসায় হামলা চালায়। তারা তার টেলিফোন সংযোগ কেটে দিয়ে ঘরের আসবাবপত্রসহ দামি ফ্যাক্স মেশিন ও ক্যামেরা

---

৭২. প্রতিবেদন, যশোরে সাংবাদিকদের মধ্যে কাফনের কাপড় আতঙ্ক, মানবজমিন, ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০০০।

৭৩. সম্পাদকীয়, প্রথম আলো, ১৬ জানুয়ারী ২০০১।



www.pathagar.com

ভাঙচুর করে, নগদ পাঁচ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। সঙ্গে অকথ্য গালাগালও চলতে থাকে। যথারীতি টহল পুলিশ ঘটনা দেখেও এগিয়ে আসেনি।

প্রকাশিত সংবাদ নিয়ে কারো আপত্তি থাকলে তিনি আদালতে যেতে পারেন। কিন্তু মনঃপূত হয়নি বলেই সরকার দলীয় ক্যাডারদের লাঠিচার্জ? তবে কি এখন থেকে তাদের পড়িয়ে, অনুমোদন করিয়ে নিয়ে সংবাদ পাঠাতে হবে?

আমরা বাউফল ছাত্রলীগ নেতাদের এহেন অপকর্মের তীব্র নিন্দা করছি। সেই সঙ্গে সর্বত্র সাংবাদিকদের নিরাপত্তার দাবি জানাচ্ছি।

**চিত্র-০৩**

**নির্বাচিত সরকারের অধীনে গণতন্ত্র কোথায়?** [৭৪]

ক. "যতই দিন যাচ্ছে ততই মানুষের জীবনের নিরাপত্তা উত্তরোত্তরভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। খুন-খারাবি একদিকে সরকারের পুলিশ ও র‍্যাব বাহিনীর দ্বারা হচ্ছে, অন্যদিকে দেশে বাস্তবত কোনো অপরাধের শাস্তির ব্যবস্থা না থাকায় বেসরকারি ক্রিমিনালদের অপরাধও ব্যাপক আকারে ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনির হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সকলের বেডরুম পাহারা দেওয়া সরকারের কাজ নয়! তার একথা বলার অর্থ জনগণকে নিরাপত্তা দিতে হলে সরকারকে তাদের শোবার ঘর, বসার ঘর ইত্যাদি পাহারা দিতে হবে! দেশে আগে কি তাই ছিল? তখন কি মানুষের জীবন অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি নিরাপদ ছিল না? কিন্তু জনগণকে সে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য সরকার প্রত্যেকের ঘর পাহারা দিত না। সমাজে এমন অবস্থা বজায় রাখতো যাতে অপরাধীরা অবাধে অপরাধ করতে পারত না। অপরাধ করতে তারা ভয় করত। এখন অবস্থা অন্যরকম। অপরাধের যেহেতু কোনো শাস্তির ব্যবস্থা নেই, সে কারণে তা অবাধ ও বেপরোয়া হয়েছে।"

**খ. সাংবাদিক সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ড : ৬ মাসেও ৪৮ঘন্টার আলটিমেটাম পূরণ হলো না।** [৭৫]

ছয় মাসেও পূরণ হলো না ৪৮ ঘন্টার আলটিমেটাম। দীর্ঘ এই সময় পার হলেও জানা গেল না সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনির খুনি কে বা কারা। কী কারণে নৃশংস এই খুনের ঘটনা ঘটল তাও থেকে গেল সবার অজানা। সাংবাদিক নেতারা বলছেন, খুনিদের গ্রেফতার যত বিলম্বিত হবে; ততই এই ঘটনাটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। ..... গত ১০ ফেব্রুয়ারি রাতে রাজধানীর পশ্চিম রাজাবাজারের বাসায় নৃশংসভাবে খুন হন মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক সাগর সরওয়ার এবং

---

৭৪. বদরুদ্দীন উমর, নির্বাচিত সরকারের অধীনে গণতন্ত্র কোথায়?, সমকালীন প্রসঙ্গ, সমকাল, ঢাকা, মঙ্গলবার, ১৭ জুলাই ২০১২; পৃ. ০৪

৭৫. দৈনিক নয়া দিগন্ত, রোববার, ঢাকা, ১২ অগাস্ট ২০১২; প্রথম পাতা।



www.pathagar.com

তার স্ত্রী এটিএন বাংলার সিনিয়র রিপোর্টার মেহেরুন রুনি। ১১ ফেব্রুয়ারি সকালে তাদের লাশ উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পর রাজাবাজারের ওই বাসায় যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, পুলিশের আইজি হাসান মাহমুদ খন্দকার এবং র‍্যাবের ডিজিসহ সরকার ও প্রশাসনের অনেক কর্তাব্যক্তি। সেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা দেন, ৪৮ ঘন্টার মধ্যে খুনিদের গ্রেফতারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। .......মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা প্রধান শাহ্ আলমগীর বলেন, 'মানুষ যখন ন্যায়বিচার বঞ্চিত হয় তখন গণমাধ্যমের কাছে আসে। কিন্তু গণমাধ্যমের দু'জন কর্মী নিজ ঘরে খুন হলেন অথচ এখন পর্যন্ত খুনিরা ধরা পড়ল না, কোনো বিচার হলো না - এ নিয়ে মানুষের হতাশা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে।'

**চিত্র-০৪**

**ঢাকা যেন লাশের নগরী** [৭৬]

"প্রকাশিত রিপোর্টে জানা যায়, বেওয়ারিশ লাশ দাফনকারী প্রতিষ্ঠানের মতে, গত পাঁচ বছরে [জুলাই ২০০৭ থেকে জুলাই ২০১২ পর্যন্ত] তারা ঢাকায় আট হাজারের মতো বেওয়ারিশ লাশ দাফন করেছে। বৎসরওয়ারী হিসাবটা এমন : ২০০৮ সালে ২০১৪টি; ২০০৯ সালে ১৯৮১টি; ২০১০ সালে ১২০৪টি; ২০১১ সালে ১১১৫টি এবং ২০১২ সালের প্রথম ছয় মাসে ৫৪৬টি। ..... প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী গত দেড় মাসে [১ জুলাই থেকে ৯ অগাস্ট পর্যন্ত] রাজধানীতে ১৮টি খুনের ঘটনা ঘটেছে। ... ঢাকা মহানগর পুলিশের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত বছর প্রতি মাসে ঢাকায় গড়ে ২১টি খুনের ঘটনা ঘটেছে। আর চলতি বছরের জুন পর্যন্ত গড়ে খুনের ঘটনা ২০টির মতো।

**চিত্র-০৫**

**মানবাধিকার কমিশনের জরিপ রিপোর্ট** [৭৭]

ক. "বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা ও পৌরসভার শাখা থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে কমিশনের ডকুমেন্টেশন বিভাগ জরিপ কার্য সম্পন্ন করে। জরিপ অনুযায়ী ২০১২ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত সারা দেশে মোট হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় মোট ২২৭২টি। এ ধরণের অব্যাহত হত্যাকাণ্ড অবশ্যই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি বলে বর্ণনা করা যায়। কমিশন ২০১২ সালের ৬ মাসের এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ড এবং শিশু

---

৭৬. কাজী সাঈদ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক নয় কি?, নয়া দিগন্ত, শনিবার, ঢাকা, ২৫ আগস্ট ২০১২; পৃ. ০৬।

৭৭. ৬ মাসে ৯২ রাজনৈতিক ব্যক্তি ৩ সাংবাদিকসহ মোট হত্যাকাণ্ড ঘটে ২২৭২টি, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, রোববার, ৮ জুলাই, ২০১২; পৃ. ০১।



www.pathagar.com

নির্যাতনের হার অধিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।....... মোট হত্যাকাণ্ডের শিকার ২২৭২ জনের মধ্যে সামাজিক সহিংসতার কারণে হত্যা ১৫৯১ জন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে ৬৬ জন, রাজনৈতিক ব্যক্তি ৯২ জন, ধর্ষণের পর হত্যা ৯২ জন, সাংবাদিক ৩ জন, গণপিটুনিতে ৬৯ জন, চিকিৎসা অবহেলায় মৃত্যু ৫৮ জন, যৌতুকের কারণে নিহত ১৩৪ জন, বি এস এফ -এর গুলিতে নিহত ৩৪ জন, আগুনে পুড়িয়ে হত্যা ২১ জন, গৃহপরিচারিকা হত্যা ১৭ জন, গুপ্ত হত্যা ৮৪ জন, ইভটিজিংয়ের কারণে হত্যা ১১ জন, বোমা হামলায় নিহত ৫ জন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য নিহত ০১ জন এবং এসিড নিক্ষেপে হত্যা ৪ জন। মোট ধর্ষণের শিকার ২৮৬ জনের মধ্যে নারী ধর্ষণ ৯৮ জন এবং শিশু ধর্ষণ ১৮৮ জন, এছাড়া সাংবাদিক নির্যাতন করা হয় ৪০ জন, বোমা হামলায় আহত ২০ জন এবং গৃহপরিচারিকা নির্যাতন ০৪ জন।"

**বিচার বহির্ভূত হত্যার কোনো মামলারই রুল নিষ্পত্তি হয়নি** [৭৮]

**খ.** গুম, গুপ্ত হত্যা, ক্রসফায়ারে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড নিয়ে গত ছয় বছরে কমপক্ষে ছয়টি রুল জারি করেছে হাইকোর্ট। একটি রুলও এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি।

**দুই ছিনতাইকারীর সাজা মাফ করলেন রাষ্ট্রপতি** [৭৯]

**গ.** পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমান দুই ছিনতাইকারীর সাজা মওকুফ করেছেন। সাধারণ ক্ষমার আওতায় গাজীপুরের কাশিমপুর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার পার্ট-২ থেকে তারা মুক্তি পেয়েছে। ওই কারাগারের জেলার সুভাষ চন্দ্র ঘোষ জানান, মঙ্গলবার বিকেল ৩টার দিকে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। মুক্তিপ্রাপ্তরা হল, কুমিল্লার হোমনার সাপমারা গ্রামের মো. খোকন মিয়ার ছেলে মো. শহিদুল ইসলাম [২৯] ও খুলনার দিঘলীয়ার চাঁদনীমহল গ্রামের ইসরাইল খানের ছেলে মো. আকরাম খান [২৬]।

**রাজধানীতে মেয়ের বাসার সামনে ছিনতাইকারীর ছুরিতে বাবা খুন** [৮০]

**ঘ.** মেয়ে ও নাতি নাতনির সামনে রাজধানীতে শাজাহান ভূঁইয়া নামের এক ব্যবসায়ীকে [৫৫] উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছে ছিনতাইকারীরা। গতকাল মিরপুর ৬ নম্বর সেকশনে মেয়ের বাসার সামনেই এ নৃশংস ঘটনা ঘটে।

অপরাধের যেহেতু কোনো শাস্তির ব্যবস্থা নেই, সে কারণে তা অবাধ ও বেপরোয়া হয়েছে। এভাবে অবাধ ও বেপরোয়া অপরাধের প্রতিকারহীনতায় সমাজের নানা স্তরে

---

৭৮. দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, রোববার, ৮ জুলাই, ২০১২; পৃ. ০১।
৭৯. সকালের খবর, বুধবার, ১৫ অগাস্ট, ২০১২; পৃ.-০১।
৮০. সকালের খবর, বুধবার, ১৫ অগাস্ট, ২০১২; পৃ.-০১।


www.pathagar.com

নানা রূপে সৃষ্ট হতাশা, মানুষের উদ্যমকে মেরে ফেলছে। সামাজিক জীবনের বিকাশে ধর্মনিরপেক্ষতা এভাবেই অবদান রেখে যাচ্ছে। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র সর্বত্রই আমাদের ব্যর্থতার মিছিলের নগ্ন পরিহাস। আমাদের শুধু দিনযাপনই আছে, কোথাও কোনো অর্জন নেই।

## বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পরিণতি

একটি রাজনৈতিক আদর্শ বা একটি রাজনৈতিক বিশ্বাস হিসেবে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পরিণতি কি হবে তা, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির যেমন বিষয় তেমনি তা আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক রাজনীতিরও বিষয়। তবে অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিষয়টিই প্রধান গুরুত্বের দাবীদার। আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক রাজনীতির প্রভাবটি আনুষঙ্গিকভাবে গুরুত্ব পেয়ে থাকে। পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশের অভ্যুদয় মূলতঃ ছয় দফা দাবীর রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারাবাহিক উত্তরাধিকার। ছয় দফার কোথাও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কথা ছিল না। নির্বাচন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত প্রচারপত্র কিংবা দলীয় প্রধানের রেডিও-টিভির ভাষণ - কোথাও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী ছিল না।[৮১] দেশ স্বাধীন হওয়ার পর 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' মূলতঃ এদেশের মানুষের ওপর আরোপিত একটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি। যা দেশের সাধারণ মানুষের চেতনার পরিপন্থি ছিল। এদেশের মানুষ 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ'-এর নামে অধর্ম বা ধর্মহীনতা কোনোটাই গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' ছিল দেশের কর্পোরেট স্তরের কিছু রাজনীতিবিদের এক ধরণের বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতা। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের চর্চা করে, এর ওপর সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে বক্তৃতা দিয়ে সময় কাটানো এবং দেশী-বিদেশী রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করাই এসব কর্পোরেট স্তরের গুণী লোকদের পবিত্র দায়িত্ব ছিল। দেশের সাধারণ মানুষের সাথে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' -এর কোনো সম্পর্ক পূর্বেও ছিল না, এখনও নেই।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইসলাম বর্জনের যুদ্ধ ছিল না। মেজর [অবঃ] এম এ জলিল-এর ভাষায়, "১৯৭১ সনে আমরা বাঙালী জনগণ পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক আকস্মিকভাবে চাপিয়ে দেয়া একটি অঘোষিত যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমাদের ন্যায্য অধিকার আদায় এবং রক্ষা করার জন্যই যুদ্ধ করেছি কেবল। এটা ছিল স্বাধীনতা আদায়ের যুদ্ধ,

---

৮১. ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রচার পত্র, ১ ডিসেম্বর ১৯৭০; শেখ মুজিবের রেডিও-টিভি ভাষণ ২৮ অকটোবর ১৯৭০।


www.pathagar.com

কোন ধর্মযুদ্ধ নয়।"[৮২] ছয় দফার মধ্যেও যেমন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আদর্শ হিসেবে ছিল না, তেমনি মুক্তিযুদ্ধেও ধর্মনিরপেক্ষতা কোনো চেতনা ছিল না। মুক্তিযুদ্ধ যেমন কোনো ধর্মযুদ্ধ ছিল না; তেমনি আবার কোনো অধর্ম বা ধর্মবর্জনের যুদ্ধও ছিল না। মুক্তিযুদ্ধ ছিল পুরোপুরিভাবেই নিরেট একটি 'স্বাধীনতা যুদ্ধ', অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের যুদ্ধ।

এস পি এম ত্রিপাঠি-র ভাষায়, 'বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সম্মিলিত লড়াইয়ের ফসল স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়।'[৮৩] আর স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশকেন্দ্রিক ভারতের ভূমিকার মূল্যায়ন একজন সেক্টর কমান্ডারের দৃষ্টিতে ছিল এমন, "আমি দেশ-মাতৃকার একজন মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতির কাছে আমি একজন যোদ্ধা হিসেবে পরিচিতি লাভ করি। দেশের জনগণকে শোষণ-জুলুমের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যেই আমি অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলাম। দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানী শাসক-শোষক গোষ্ঠিকে পরাভূত করতে আমরা সক্ষম হয়েছিলাম এ কথা সত্য। কিন্তু স্বাধীনতার ঊষালগ্নেই মিত্র বাহিনী কর্তৃক দেশের সম্পদ লুণ্ঠন এবং শাসক ........ ষড়যন্ত্রমূলক আচরণ প্রত্যক্ষ করে এ সত্যটি অনুধাবন করতে আমার মোটেও বেগ পেতে হয়নি যে, দেশ ও জাতি এক শোষকের হাত থেকে মুক্ত হলেও অপর একটি নতুন শোষক গোষ্ঠির অধীনস্থ হয়ে পড়েছে।"[৮৪]

স্বাধীনতার ঊষালগ্নেই মিত্র বাহিনী দেশের সম্পদ যেমন লুণ্ঠন করে নিয়েছে; তেমনি স্বাধীনতার পর এদেশের মানুষের চেতনাও লুণ্ঠন করে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতার তথা বন্ধুত্বের ছদ্মাবরণে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এদেশের মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। যা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কারণ 'কর্পোরেট নীতিমালা' দ্বারা পরিচালিত নানা জাতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা ভারতে নির্বাচনে সরকার পরিবর্তন হলেও ভারত সরকারের কর্পোরেট নীতিমালায় তেমন কোন পরিবর্তন হয় না। 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ভারতের জাতীয় আদর্শ বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে ভারতের শাসনকার্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ফ্যাক্টর হচ্ছে হিন্দু দর্শন ভিত্তিক জাতীয়তা। যা কার্যতঃ মূর্তিপূজা ভিত্তিক অন্ত্যজ জীবনদর্শনের প্রতিফলন মাত্র। মূর্তিপূজাভিত্তিক এবং রক্ত ও বংশভিত্তিক বংশ পরম্পরায় মানুষকে ঘৃণা করার অন্ত্যজ জীবনদর্শন গ্রহণের জন্যে তো এদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েনি। যেখানে ইসলামের জীবনদর্শন হলো আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়; অর্থাৎ তিনি

---

৮২. মেজর [অবঃ] এম এ জলিল, কৈফিয়ত ও কিছু কথা, প্রকাশক- এফ রহমান, সাভার, ঢাকা। পৃ-২০।

৮৩. বিশেষ সাক্ষাৎকার, এস পি এম ত্রিপাঠি, দৈনিক প্রথম আলো, রোববার, ২৬ ডিসেম্বর ২০১০, পৃ-১২।

৮৪. মেজর [অবঃ] এম এ জলিল, কৈফিয়ত ও কিছু কথা, প্রকাশক- এফ রহমান, সাভার, ঢাকা। পৃ-১।


www.pathagar.com

অতুলনীয়; সৃষ্টি জগৎ পুরোটাই আল্লাহর। আসমান-জমিনে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর। সেখানে একজন ঈমানদারের পক্ষে মূর্তি পূজার দর্শন বা মানুষকে ঘৃণার অন্ত্যজ দর্শন বা ধর্মহীনতার দর্শন গ্রহণ কি করে সম্ভব কিংবা আদৌ কি যৌক্তিক? অযৌক্তিক হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনে 'আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাসকে' প্রত্যাহার করা হলেও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম'-কে বহাল রাখা হয়েছে। যদিও 'আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস' নেই এমন ইসলামের অস্তিত্ব পৃথিবীর কোথাও নেই। কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধানে রয়েছে 'সোনার পাথরবাটি'র মত সেই রাষ্ট্রীয় মূলনীতি - 'আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাসবিহীন রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম।' আর আছে ধর্মনিরপেক্ষতা তথা ধর্মহীনতা। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষতার তথা ধর্মহীনতার ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা থাকার ফলে বাংলাদেশের কর্পোরেট স্তরে ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা, বচন, বুলি তুলনামূলকভাবে বেড়েছে।

এমত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পরিণতির বিষয়টি বিশ্লেষণ ও আলোচনার দাবি রাখে। কেউ যদি প্রশ্ন করে যে আগাছার পরিণতি কি? তাহলে এর দুটো উত্তর হতে পারে। ০১. ফসলের স্বার্থে আগাছা পরিষ্কার করা। ফসলের স্বাভাবিক বিকাশকে অব্যাহত রাখতে নিয়মিতই আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। ০২. আগাছাকে ফেলে রাখা; ফলে আগাছার প্রবৃদ্ধি ঘটবে এবং ফসলের ঘাটতি হবে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে কার্যতঃ কোনো নৈতিকতার মানদণ্ড নেই। প্রভাবশালী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির নৈতিকতাই এখানে নৈতিকতার মানদণ্ড। ফলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে 'জোর যার মুলুক তার'-ই নৈতিকতা। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মানব হৃদয়ের জমিনে আগাছার মত। মানুষের মত এত মহৎ হৃদয়েও এই আগাছাকে ফেলে রাখলে তাতে 'জোর যার মুলুক তার' নৈতিকতাই পয়দা হবে। ইসলামের মানবিকতার ফসল ফলবে না। ইসলামের নৈতিকতার মানদণ্ড আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক নির্ধারিত। প্রভাবশালী কিংবা প্রতিপত্তিশালীদের এই মানদণ্ডকে উপেক্ষা করার কোনো অবকাশ নেই। সোনার বাংলার জন্য সোনার মানুষ পেতে হলে ইসলামের মানবিক নৈতিকতার চাষবাসই করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতার আগাছাকে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

ফসলের জমিন আর মানুষের হৃদয় জমিন এক নয়। মানুষের হৃদয় জমিনের আগাছা 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' দূর করতে হলে মানুষের প্রভু, মানুষের মালিক, মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দেখানো পথকেই অবলম্বন করতে হবে। তিনিই একমাত্র জানেন হৃদয় জমিনে চাষবাসের কলাকৌশল। আগাছা নির্মূলের পদ্ধতি।

আল্লাহতায়ালা বলেন, "ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর ভালো দ্বারা; ফলে তোমার সঙ্গে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। এই


www.pathagar.com

গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই, যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা মহাভাগ্যবান।"[৮৫] আল্লাহতায়ালা আরো বলেন, "বল, মন্দ ও ভালো এক নয়; যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। সুতরাং হে বোধশক্তিসম্পন্নেরা! আল্লাহকে ভয় কর - যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"[৮৬]

'ধর্মনিরপেক্ষতা' আগাছা বাংলাদেশে যে পরিমাণ শিকড় গেড়েছে; যে পরিমাণ বিস্তার করেছে জাল,তার অপনোদনে মহাভাগ্যবান মানুষদের সংখ্যা, ধৈর্যশীল মানুষদের সংখ্যাও সে পরিমাণ বাড়াতে হবে যা বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন। কারণ, "আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে।..."[৮৭] আর এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করার দুর্লভ গুণের হাতিয়ার । যা শত্রুকে ধ্বংস করবে না পরিণত করবে অন্তরঙ্গ বন্ধুতে; হৃদয় জমিনের 'অন্ত্যজ দর্শন'এর, ধর্মনিরপেক্ষতার, 'জোর যার মুলুক তার' নৈতিকতার আগাছা নির্মূল করে ফসল ফলাবে মানবিক নৈতিকতার, মানবিকতার। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, বংশ নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য হৃদয়ে জায়গা হবে ভালোবাসার। সেই দুর্লভ গুণের অধিকারী মানুষের সংখ্যার উপর যেহেতু বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন নির্ভর করছে তাই ধর্মনিরপেক্ষতার পরিণতিও সেই গুণের অধিকারী মানুষের সংখ্যার উপরই নির্ভর করবে।

এই গুণের অধিকারী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির কিংবা নিজেকে সে গুণের অধিকারী মানুষদের একজনে পরিণত করার সকল তৎপরতাই পরিগণিত হবে সৎকর্ম হিসেবে। আর আল্লাহ এইসব গুণের অধিকারী ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দানের। যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দিয়েছিলেন পূর্ববর্তীদের। আল্লাহতায়ালা বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্য নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদাত করবে, আমার কোনো শরীক করবে না।"[৮৮]

সে প্রতিনিধিত্ব কি ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য এক চূড়ান্ত নিয়তি হবে না? আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যেমন সত্য তার এই কথা "কুল্লু নাফসিন যা-য়িকাতুল মাওত - নিশ্চয় প্রাণ মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।"[৮৯]

---

৮৫. সূরা হা-মীম আস্-সাজ্‌দা; ৪১ ঃ আয়াত ৩৪-৩৫।

৮৬. সূরা আল মায়িদা; ০৫ ঃ আয়াত ১০০।

৮৭. সূরা আর রা'দ; ১৩ ঃ আয়াত ১১।

৮৮. সূরা আন্ নূর; ২৪ ঃ আয়াত ৫৫।

৮৯. সূরা আলে-ইমরান; ০৩ ঃ আয়াত ১৮৫।


www.pathagar.com

বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যেহেতু আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক রাজনীতিরও বিষয়, তাই এ নিয়েও ইসলামী শক্তি সমূহের ইসলামসম্মত কৌশল নির্ধারণ করতে হবে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার সেই কাঙ্খিত পরিণতির লক্ষ্যে।

সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত ভারতের সামরিক-বেসামরিক টেকনোক্রেট, বুদ্ধিজীবি, ব্যবসায়ী, সাংস্কৃতিক আইকন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ বিভিন্ন নাগরিক বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থেকে ভারতের 'কর্পোরেট গভর্নসকে' শক্তিশালী করে যাচ্ছে। ভেতরে-বাইরে ভারতের নাগরিক ও সরকারের এই অভিন্ন ঐক্যতান ভারতকে এ অঞ্চলে কার্যতঃ বহু আগেই আঞ্চলিক সুপার পাওয়ার-এ পরিণত করেছে। হালে একমাত্র পরাশক্তি আমেরিকার ও তাঁর একমাত্র-একান্ত সুহৃদ ইসরাইলের সাথে সামরিক-বেসামরিক উচ্চ পর্যায়ের লেনদেন ভারতকে 'বৈশ্বিক সুপার পাওয়ার' হওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানকে, ভারত তার জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি গণ্য করেই চলছিল। ১৯৭১-এ পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠির অবিমৃশ্যকারিতার পর ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান তার নিজস্ব সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়ে দু'টুকরো হয়েছে। ভারত এতে নেপথ্যে সক্রিয় ভূমিকা রাখলেও ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক ভারতকে আক্রমণ করার পূর্ব পর্যন্ত ভারত সরাসরি পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। নিখিল পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী দল আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করতে আহ্বান না জানিয়ে বরং ২৫ মার্চের রাতে বাংলাদেশের মানুষের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে বাংলাদেশের মানুষদেরকে ভারতের আশ্রয়ে যেতে বাধ্য করেছে। ২৬ শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। যা ভারতের জন্য তার নিজস্ব নিরাপত্তার হুমকি ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানকে টুকরো করার কাজে ভূমিকা রাখার এক ঐতিহাসিক সুযোগ এনে দেয়। অন্যদিকে আর্ন্তজাতিক শরনার্থী আইন ও মানবাধিকার আইন ভারতকে বাংলাদেশের শরনার্থীদেরকে সহমর্মিতা দেখাতে বাধ্য করে। এই সহমর্মিতাই এখন বাংলাদেশের সাথে ভারতের সকল পর্যায়ের সম্পর্কের নিয়ামক হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতার উষালগ্নেই মিত্র বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের সম্পদ লুণ্ঠনের মাধ্যমে ভারত সে সহমর্মিতার প্রতিদান নিয়ে গেছে; এবং এখনও সেই সহমর্মিতার কথা স্মরণ করিয়ে পানি প্রত্যাহার করে বাংলাদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করছে; ট্রানজিট নিয়ে বাংলাদেশকে করিডোরে পরিণত করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে থোড়াই কেয়ার করছে।

দেশের ইসলামী শক্তিসমূহ ভারতের এই রাজনৈতিক অবস্থানকে মূল্যায়ন করে রাজনৈতিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিপরীতে অবস্থান নেওয়ার প্রেক্ষিতে বর্তমানে দেশের ইসলামী শক্তিসমূহের বাংলাদেশকে নেতৃত্বদানের গ্রহণযোগ্যতাকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী শক্তি 'স্বাধীনতা বিরোধিতার' প্রশ্নে দুর্বল করে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের হুমকিকে


www.pathagar.com

জনগণের দৃষ্টির অন্তরালেই রেখে দিচ্ছে। ইসলামী শক্তিকে নির্মূলের জন্য সকল জাতীয় ও পরাশক্তির এজেন্ডাকে কাজে লাগানো হচ্ছে। রাজনৈতিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিপরীতে অবস্থান করাকে 'যুদ্ধাপরাধ' বিবেচনায় ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করণসহ বিশেষ বিশেষ অপছন্দের রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার পায়তারা ভারতের বাংলাদেশ বিরোধী প্রপাগান্ডার পরিপূরক। যারা মূলত বাংলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তার মূলভিত্তি ইসলামকে সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদা থেকে নির্বাসনে পাঠাতে চায়। আর তাই ভারতের সামরিক-বেসামরিক নীতি নির্ধারক, গবেষক, নিরাপত্তা বিশ্লেষক সাংবাদিক, রাজনীতিক, ধর্মীয় নেতা-নেত্রী থেকে শুরু করে সবার মাঝেই বাংলাদেশ বিরোধী একটা প্রচারণার ঐকতান রয়েছে। ভারত উৎসারিত বাংলাদেশ বিরোধী এই বুদ্ধিবৃত্তিক ও মিডিয়া সন্ত্রাসের মূলে রয়েছে ভারতের 'নেহেরু' ডকট্রিন, যা এ অঞ্চলে কোন স্বাধীন সার্বভৌম জাতি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। একারণে ভারতের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতিতে সার্বভৌম সমতার রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয় না। আস্থাশীল সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক গড়ে তুলতেও ভারত সব সময়ই অনীহ।

এমনি এক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মানুষদের করণীয় কী? দেশের ইসলামী শক্তিসমূহের করণীয় কী? প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় অবস্থানের বিপরীতে ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশের কোনো বিকল্প নেই। ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজনৈতিক কারণেই যে, দেশের ইসলামী শক্তিসমূহ মুক্তিযুদ্ধের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছিলেন- এ নিয়ে ভুল বুঝাবুঝির অবসান করে বাংলাদেশকে ঐক্যবদ্ধ করাই ভারতীয় অবস্থানের বিপরীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌম সত্তা হিসেবে সম্মান অর্জনের একমাত্র উপায়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশকে ঐক্যবদ্ধ করাই এখন দেশের ইসলামী শক্তিসমূহের মৌলিক করণীয় কাজ। সে ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশই, বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার উপযুক্ত রাজনৈতিক পরিণতি নির্ধারণ করে দেবে।

ইসলামী শক্তিগুলো কি আল্লাহতায়ালার একথা স্মরণ করবে, "ওয়াতাসিমু বি হাবলিল্লাহি জামি'আও ওয়ালা তাফার্‌রাকু - তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা।... "[৯০]

### উপসংহার

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর আদর্শ চর্চা এবং রাজনৈতিক প্রবণতা, উদ্যোগ ও সংস্কৃতির প্রকৃতি বিশ্লেষণে দলগুলোর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন কেন্দ্রিক তৎপরতার চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি বর্তমান বৈশ্বিক রাজনীতির অংশ

---

৯০. সূরা আলে-ইমরান; ০৩ ঃ আয়াত ১০৩।


www.pathagar.com

হিসেবে এবং নিজেদের উচ্ছৃংখল জীবনের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কাংখিত ভূমিকা রাখতে পারছে বলেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কথা রাষ্ট্রীয় কর্পোরেট লেভেলে এত আদৃত। রাজনৈতিক দলকেন্দ্রিক ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের সেই বুলি-র ব্যবসায়ীরা বাদ দিলে বাংলাদেশে আর যা থাকে তা হলো ইসলামী জীবনাদর্শ ভিত্তিক সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি।

চলমান রাজনীতিকে ইসলামী জীবনাদর্শের আলোকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো শক্তি, ইসলামী জীবনাদর্শের চর্চাকারী সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিগুলোর এখনও কাংখিত পর্যায় অর্জিত হয়নি। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবল উচ্ছৃংখলতা ও শঠতার বিকল্প হিসেবে ইসলামী জীবনাদর্শের চর্চাকারী দলগুলো ইসলামী জীবনাদর্শকে এতটা জনপ্রিয় করে তুলতে সক্ষম হয়নি যে তা একটি প্রবল সামাজিক শক্তি হিসেবে সমীহ অর্জন করেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের পরিণতি বিবেচনায় ইসলামী জীবনাদর্শ চর্চাকারী দলগুলোকে ইসলামী জীবনাদর্শকে প্রবল সামাজিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার কোনো বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে ইসলামী জীবনাদর্শ চর্চাকারী দলগুলোর ঐক্যবদ্ধতা একটি মৌলিক ও প্রাথমিক প্রয়োজন। এমনকি রাজনৈতিক ভূমিকা বিবর্জিত ইসলামী সামাজিক শক্তির সাথেও ঐক্যবদ্ধতার প্রয়োজনকে উপেক্ষা করার অবকাশ নেই। সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনায়, ইসলামী জীবনাদর্শ চর্চাকারী সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিগুলো "কারো সাথে শত্রুতা নয়, সবার সাথে বন্ধুত্ব" - এ পররাষ্ট্রনীতির আলোকে বৈশ্বিক রাজনীতির আঞ্চলিক প্রভাবকে গুরুত্ব দিয়ে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের বিষয় বিবেচনা করতে পারেন। যা সামাজিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে অপ্রয়োজনীয় ও গুরুত্বহীন করে তুলবে। আর এভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির পরিবর্তে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ইসলামের মানবিক নীতি সামাজিকভাবে আদৃত হবে ঃ

**০১. আখিরাত কেন্দ্রিক দাওয়াত ঃ**

ধর্মনিরপেক্ষতা আদর্শের স্থলে ইসলামী জীবনাদর্শ প্রতিস্থাপন করতে মানুষের চিন্তা-চেতনা আখিরাতমুখী হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। আখিরাতমুখী জীবন গড়ার চেতনা ব্যাহত করে দ্বীন কায়েম সম্ভব নয়; কারণ দ্বীন কায়েমের চেতনা, আখিরাতমুখী চেতনার অংশ। আখিরাতে সফলতার আকাঙ্খী মানুষেরা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মতো যেন কার্যতঃ একথার প্রমাণ না দেয় যে, "আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং আমরা পুনরুত্থিতও হবনা [সূরা আন্'আম; ০৬ ঃ ২৯]।"

**০২. পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ হিসেবে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলন ঃ**

রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমাজসেবা ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের ক'টি মৌলিক দিক। দ্বীন কায়েমের সকল তৎপরতা বুঝাতে কিংবা ইসলামী জীবনাদর্শের চর্চা


www.pathagar.com

বলতে শুধু রাজনৈতিক বিবেচনা কিংবা রাজনীতি কেন্দ্রিক জ্ঞান বুঝালে তা প্রান্তিকতার দোষে দুষ্ট হবে। তাই ইসলামী জীবনাদর্শ চর্চাকারী দলগুলোকে রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমাজসেবার দিক-নির্দেশনামূলক জ্ঞানের প্রশিক্ষণে এদেশের সচেতনভাবে আখিরাতমুখী মানুষগুলোকে গড়ে তুলতে হবে। এভাবে প্রশিক্ষিত মানুষগুলোর পক্ষেই কেবল বাস্তব জীবনে ইসলামসম্মতভাবে কথা ও কাজে মিল রাখা সম্ভব হবে। আমানত ঠিক রাখা সম্ভব হবে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিভ্রান্তিকর ও অন্ত ঃসারশূণ্য জীবনাদর্শের বিপরীতে ইসলামের অর্থনীতি তথা সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমাজসেবার সর্বজনীন ও মানবিক রূপের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে সক্ষম হবে। যা ইসলামের জীবনাদর্শের সামাজিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করবে। সামাজিক শক্তির ইতিবাচক বিকাশ ঘটাবে। আল্লাহ্ বলছেন, "মানুষকে তোমার রবের দিকে আহ্বান কর হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে বির্তক কর উত্তম পন্থায় [সূরা আন্ নাহল; ১৬ ঃ ১২৫]।" যার জ্ঞান নেই তার হিকমাত প্রয়োগের ক্ষমতা নেই। যার জ্ঞান নেই সে সদুপদেশ দিতেও সক্ষম নয়। যার জ্ঞান নেই সে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করতেও সক্ষম নয়। তবে বিতর্কের নামে ঝগড়া করতে সক্ষম হয়। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য্যের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয় না।

**০৩. মহাভাগ্যবান মানুষ তৈরি ঃ**

যে গুণের মানুষকে আল্লাহতায়ালা নিজে মহাভাগ্যবান বলে ঘোষণা করেছেন সে গুণের মানুষ তৈরি করা। যারা মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করতে সক্ষম। যার ফলে শত্রু হয়ে উঠবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। আল্লাহ বলেন, "ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সঙ্গে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই, যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা মহাভাগ্যবান [সূরা হামীম-আস-সাজদা; ৪১ ঃ ৩৪-৩৫]।" এ ধরণের মহাভাগ্যবান মানুষ তৈরির কোনো সুনির্দিষ্ট কাঠামো বলে দেয়া নেই। ইসলামী জীবনাদর্শের চর্চাকারী দলগুলোকে পরামর্শের আলোকে এই কাঠামো ঠিক করে নিতে হবে। তবে এই মহাভাগ্যবান মানুষদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া ইসলামের মানবিক নীতির সামাজিক ভিত্তি তৈরি হবে না। ইসলামী সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিগুলো মহাভাগ্যবান মানুষ তৈরির এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনে উদ্যোগী না হলে, ভিন সংস্কৃতির পুশইন কৃত ধর্মনিরপেক্ষ নীতির উচ্ছৃংখলতা ও কপটতা, বাংলাদেশ থেকে দূর করা সম্ভব হবে না। আল্লাহতায়ালা বলেন, "আল্লাহ অবশ্যই কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। [সূরা আর রাদ; ১৩ ঃ ১১]।"


www.pathagar.com

**০৪. দারিদ্র বিমোচন ও সমাজ সেবায় অংশগ্রহণ ঃ**

ইসলামী আদর্শ চর্চাকারী দলসমূহের সমাজসেবা ও দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের চিত্র কার্যতঃ অনুল্লেখযোগ্য। তবে যাকাত, ফিতরা, কুরবানীর চামড়া সংগ্রহ, মাসজিদ, মাদ্রাসার জন্য সংগ্রহ ইসলামী আদর্শ চর্চাকারী দলসমূহের কাছে এসবই একমাত্র সমাজসেবা হিসেবে বিবেচিত। অথচ দেশে সীমাহীন দারিদ্র যে মানুষকে কুফরীর দিকে ঠেলে দিচ্ছে, জীবন সংগ্রামে বার বার পরাজয় যে তাকে ঈমান হারা করে দিচ্ছে, সে মৌলিক বাধা দারিদ্র দূরীকরণে কোনো উল্লেখযোগ্য তৎপরতা নেই; অন্যান্য প্রচলিত ধারার রাজনৈতিক দলের মতো কিছু রাজনৈতিক কর্মসূচী ছাড়া। অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী রাজনৈতিক দলগুলো জনসাধারণের সম্পদ আত্মসাৎ করে 'গরু মেরে জুতা দান'-রূপ কর্মসূচী এতটা চতুরতার সাথে পালন করছে যে, সাধারণ মানুষ বুঝতেই সক্ষম হচ্ছে না যে জুতাদানটা গরু মেরেই করা হয়েছে। আর দানশীল মানুষ বলতে সে সব আত্মসাৎকারী মানুষকেই তারা চিনেছে। ফলে ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির বিভ্রান্তি থেকে জনসাধারণ বের হতে পারছে না। এ থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে হলে ইসলামী জীবনাদর্শ চর্চাকারী দলগুলোকে দারিদ্র বিমোচনে সম্মিলিত কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

আল্লাহ বলছেন, "পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোনো পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহ প্রেমে আত্মীয় স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাসমুক্তির [বন্দী মুক্তির] জন্য অর্থদান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থ সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রামে সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী। [সূরা আল বাকারা; ০২ ঃ ১৭৭]।"

**০৫. রাজনৈতিক ও সামাজিক ইস্যুগুলোকে ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ ঃ**

বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে ভাষা আন্দোলন ও '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ দুটো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। এই দুটো ইস্যুকে নিম্নের আয়াত দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন ঃ

ক. "তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ; তিনিই তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে। [সূরা আর রাহমান; ৫৫ ঃ ৩-৪]।" অর্থাৎ সব রঙের মানুষ যেমন তাঁর সৃষ্টি; তেমনি সব ভাষাও তাঁরই সৃষ্টি।


www.pathagar.com

খ. "মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মিমাংসা করে দেবে; আর তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করো যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে - যদি তারা ফিরে আসে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালোবাসেন। মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই; সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। [সূরা আল হুজুরাত; ৪৯ ঃ ০৯-১০]।"

গ. "হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; [সূরা আন্ নিসা; ০৪ ঃ ১৩৫]।"

ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির নিছক খেয়াল-খুশীর বিপরীতে ইসলামী জীবনাদর্শ চর্চাকারী দলগুলোকে আসমানী নির্দেশনার আলোকেই পথ ও পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে। যদিও তা ঝুকিপূর্ণ হয়।

**০৬. নারীর অধিকার বাস্তবায়ন ঃ**

নারীর মোহরানা, নারীর উত্তরাধিকার ইত্যাদি যাবতীয় অধিকার সম্পর্কে ইসলামে সুস্পষ্ট বিধান থাকা সত্বেও ইসলামী জীবনাদর্শ চর্চাকারীদের অনেকেই এ বিষয়ে সচেতন বা অচেতন উদাসীনতার পরিচয় দিয়ে থাকেন এবং আপন আপন কন্যা, বোন, স্ত্রী এবং মা-কে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। অজ্ঞ ও মূর্খ থাকার কারণেও যদি এ বঞ্চনা হয়ে থাকে তবে তাও আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন হবে। যে কুরআন "ইকরা বা পড়" দিয়ে অবতীর্ণ হলো সে কুরআনের অনুসারীরা অজ্ঞ ও মূর্খ থাকাটা বেমানান।

নির্ভরশীলদের অধিকার আদায় আল্লাহতায়ালার দয়ার উপযুক্ততা অর্জনের উপায় এবং ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ সামাজিকভাবে প্রত্যাখ্যানের এক শক্তিশালী হাতিয়ার। তাই নারীর যাবতীয় অধিকার উৎসাহ উদ্দীপনার সাথেই আদায় করতে হবে।

**০৭. দুটো শর্ত পূরণ করার কর্মসূচী ঃ**

আল্লাহতায়ালা ওয়াদা করেছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে যা


www.pathagar.com

তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্য নিরাপত্তা দান করবেন। [সূরা আন্ নূর; ২৪ ঃ ৫৫]।"

আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির অবসানে আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী দৃঢ় ঈমানদার হওয়া এবং জীবনের সকল কর্মক্ষেত্রে সৎকর্মশীল থাকার মতো জ্ঞান অর্জন ও প্রতিশ্রুতিশীল [Committed] মানুষ তৈরির শর্ত পূরণ করার দিকেই ইসলামী জীবনাদর্শ চর্চাকারী দলগুলোর গভীর মনোনিবেশ থাকা প্রয়োজন। তাহলেই ভয়ভীতির পরিবর্তে নিরাপত্তা অর্জিত হবে, অর্জিত হবে প্রতিনিধিত্ব করার মর্যাদা।

---

**লেখক পরিচিতি** : জনাব শেখ মোহাম্মাদ শোয়েব নাজির বিশিষ্ট লেখক, প্রাবন্ধিক এবং ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ফিন্যান্স), দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ লিঃ), গাজীপুর।

**লেখা পরিচিতি** : প্রবন্ধটি ৬ অকটোবর, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত হয়।



www.pathagar.com

# ভারতে সংখ্যালঘু দাঙ্গা ঃ একটি বিশ্লেষণ

মোঃ নূরুল আমিন

ভারত এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। এর আয়তন ৩২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫৯০ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ১২০ কোটি। এই দেশটির আয়তন বাংলাদেশের তুলনায় প্রায় সোয়া ২২ গুণ এবং পাকিস্তানের তুলনায় প্রায় ৩ গুণ বড়। প্রায় ৮০০ বছর মুসলিম শাসনের পর ১৯০ বছর ব্রিটিশ শাসনাধীনে থেকে অনেক আন্দোলন ও রক্তপাতের মুখে ১৯৪৭ সালের অগাস্ট মাসে ভারতীয় উপমহাদেশ স্বাধীন হয় এবং ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে তৎকালীন পাকিস্তান ও ভারতীয় ইউনিয়নের জন্ম হয়। এর ২৪ বছর পর ১৯৭১ সালে ৯ মাস মেয়াদী একটি সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। তবে তা সত্ত্বেও উগ্রবাদী একটি হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে দেশটি বিশ্বব্যাপী একটি পরিচিতি লাভ করেছে। এই দেশের সরকার এবং সমাজ রাজনীতির যারা কর্ণধার তাদের অধিকাংশেরই দৃষ্টিভঙ্গী সাম্প্রদায়িক। এখানে বর্ণভেদ প্রথা প্রকট। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দৃষ্টিকোণ থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের স্থান শীর্ষে। আশির দশকের পাঞ্জাবের শিখ এবং আসামের নেলী রায়ট, ৯০' এর দশকে বাবরী মসজিদ উৎখাত, মুম্বাই রায়ট, এবং ২০০২ ও ২০০৪ সালের গুজরাট রায়ট সাম্প্রদায়িক ভারতের সংখ্যালঘু নির্যাতনের সাক্ষ্য বহন করে। সম্প্রতি আসামের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেশটিকে বিশ্ব গণ মাধ্যমের শিরোনামে পরিণত করেছে।



www.pathagar.com

এই প্রবন্ধে ভারতের ধর্মীয় দাঙ্গার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে দাঙ্গাসমূহের বিস্তারিত বিবরণে না গিয়ে এর উল্লেখযোগ্য কারণ অনুসন্ধানের উপর মনোনিবেশ করা হয়েছে বেশি। আসামের সাম্প্রতিক মুসলিম বিরোধী দাঙ্গাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে তার পটভূমি এবং কারণগুলো বিশ্লেষণেরও কিছু চেষ্টা করা হয়েছে এবং এটা করতে গিয়ে হিন্দু ধর্ম ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কিছুটা প্যাথোলজিক্যাল টেষ্টের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। আবার মুসলিমরা যেহেতু ভারতে সব চেয়ে বড় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সেহেতু তাদের উপর নির্যাতনকে অপেক্ষারত বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে; অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হিন্দু নির্যাতনের সংক্ষিপ্ত কিছু বর্ণনাও প্রবন্ধে এসেছে।

এতে পত্র-পত্রিকার কিছু প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং উপসংহারে সংখ্যালঘু মুসলিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কিছু সুপারিশ সন্নিবেশেরও চেষ্টা করা হয়েছে।

## অমুসলিম সংখ্যালঘুদের অবস্থা

ভারত বহু ধর্মাবলম্বী অধিবাসীর একটি দেশ। সামগ্রিকভাবে হিন্দুরা এখানে সংখ্যাগুরু। সংখ্যালঘু হিসেবে মুসলিমদের স্থান এখানে দ্বিতীয়। এরপর আসে খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, ইহুদী, পার্সি এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অবস্থা।

জিন্দাবেস্তার অনুসারী পার্সি ধর্মাবলম্বী এবং ইহুদীরা হাজার হাজার বছর ধরে হিন্দুদের সাথে বসবাস করে আসছে। তাদের সাথে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের কোন বিরোধ বা সংঘর্ষের ঐতিহাসিক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে বৌদ্ধদের উপর হিন্দু নির্যাতনের বহু তথ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়। এই তথ্য অনুযায়ী অনার্য দ্রাবিড়রা প্রাচীন ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতায় ছিলেন। আর্য হিন্দুদের ভারত অভিযানের ফলে এখানে বৌদ্ধ শক্তির পতন ঘটে এবং প্রাচীন ভারতের বিজিত বৌদ্ধদের উপর বিজয়ী আর্য হিন্দুদের নির্যাতনের দালিলিক রেকর্ড ও তথ্যাবলী এবং ভূ-তাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ এটাই প্রমাণ করে যে আর্য হিন্দুরা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। তারা ভারতবর্ষব্যাপী নির্মিত বৌদ্ধস্তুপ ও বিহার ধ্বংস করেছে। ভিক্ষুদের হত্যা করার জন্যে তাদের মাথার মূল্য জনপ্রতি ১০০ স্বর্ণমুদ্রা ঘোষণা করেছিল। সাঙ্গ বংশের রাজা পুষ্যমিত্রের আমলে বৌদ্ধদের উপর হিন্দুদের নির্যাতন মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং এই বংশের অন্যান্য রাজাদের আমলে নির্যাতনের ভয়ে দ্রাবিড়-অনার্য বৌদ্ধরা জনপদ ছেড়ে পাহাড়-জঙ্গলে পালিয়ে যায় এবং তাদের অনেকে দলে দলে চীনসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও পাড়ি দেয়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ' কাব্য আর্য-অনার্য যুদ্ধেরই প্রতীকি বিবরণ। এখানে মধুসূদন পরিস্কারভাবে দেখিয়েছেন অযোধ্যা রাজ আর্য হিন্দুদের প্রতীক। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার ভাই লক্ষণ বহিরাগত আধিপত্যবাদী শক্তির প্রতিভূ।


www.pathagar.com

পক্ষান্তরে লংকারাজ রাবন এই অঞ্চলেরই বাসিন্দা, দেশপ্রেমের প্রতীক। আর্য হিন্দুরা অনার্যদের মানুষ হিসেবে গণ্য করত না। তারা তাদের রাক্ষস এবং বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারের শামিল মনে করত। মধুসূদন দত্তের এই তথ্য সম্পর্কে হিন্দু পন্ডিতদের কেউ দ্বিমত পোষণ করার কথা শুনা যায়নি। তবে অযোধ্যায় রামজন্মভূমি ও তার স্থানে বাবরি মসজিদ নির্মাণ নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে শিবনারায়ণের ন্যায় ধর্ম বিশেষজ্ঞদেরও কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে দেখা গেছে। তারা স্বীকার করেছেন যে, আর্য হিন্দুরা পারস্যের দিক থেকে ভারতে এসেছে এবং রামচন্দ্র হিন্দুদেরই একজন অবতার এবং তিনি একজন আর্য ছিলেন। হিন্দু ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল খ্রীস্টের জন্মের প্রায় সাত হাজার বছর পূর্বে। এ প্রেক্ষিতে অযোধ্যায় তার জন্মস্থান হওয়ার দাবীর পেছনে ঐতিহাসিক সনদ পাওয়া যায়নি। এই অবস্থায় বাবরি মসজিদকে নিয়ে তারা যে বাড়াবাড়ি করেছে তা সংখ্যালঘু মুসলিমদের উপর পরিকল্পিত নির্যাতনেরই একটি অংশ ছিল।

খ্রীস্টানদের সঙ্গে ভারতীয় হিন্দুদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের রেকর্ড খুব বেশি ভাল না হলেও একেবারে মন্দ নয়। একসময়ে মুসলিমদের প্রতিপক্ষ হিসেবে তারা খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারকদের এদেশে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেছে। বাংলা ভাষাকে হিন্দুরূপ দেয়ার জন্যে খ্রীস্টান পাদ্রী উইলিয়াম কেরী তাদেরই অনুপ্রেরণায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেছিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মতো বরেণ্য ব্যক্তিরাও খ্রীস্টান শক্তিকে ভারতের ভাগ্য বিধাতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ব্রিটিশ সম্রাটকে উদ্দেশ্য করে লেখা তার কবিতা ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে এখনো তার প্রমাণ বহন করছে। কিন্তু স্বাধীনতাউত্তর ভারতে এই অবস্থার কিছু পরিবর্তনও ঘটেছে। উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের অত্যাচারে অতিষ্ট নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা মিশনারী খ্রীস্টানদের সেবা তৎপরতায় আকৃষ্ট হয়ে যখন দলে দলে ধর্মান্তরিত হতে শুরু করে তখন খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হিন্দু নির্যাতন শুরু হয় এবং ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯০ সাল থেকে শুধু উড়িষ্যাতেই ১৩৭ টিরও বেশি হিন্দু-খ্রীস্টান দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। এই দাঙ্গার পিছনে সরকারের অনুপ্রেরণাও ছিল। খ্রীস্টান গীর্জাসমূহের ফেডারেশন কর্তৃক পরিবেশিত তথ্যানুযায়ী ১৯৬৪ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সারা ভারতে ৩৮টি, ১৯৯৭ সালে ২৪টি, ১৯৯৮ সালে ৯০টি, ১৯৯৯ সালে ১১৬টি এবং ২০০০ সালে ৫৭টি খ্রীস্টান বিরোধী দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব দাঙ্গায় খ্রীস্টানদের হত্যা, শারীরিক নির্যাতন, বাড়ীঘর ধ্বংস করা ছাড়াও তাদের পুনরায় ধর্মান্তরিতকরণ এবং খ্রীস্টানদের গোরস্থান দখল প্রভৃতি ছিল মূখ্য ঘটনা। ২০০০ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, জব্বলপুর, কিয়নঝর, উড়িষ্যা বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ এবং মুম্বাই অঞ্চলে আরও প্রায় দুশতাধিক খ্রীস্টান বিরোধী দাঙ্গা হয়েছে। এসব দাঙ্গায় বিজেপি রাজরাংসহ হিন্দুত্ববাদী দলসমূহ অংশ গ্রহণ করেছে। মার্কিন স্টেট


www.pathagar.com

ডিপার্টমেন্টের রিপোর্টে ২০১১ সালে ৯০টি খ্রীস্টান বিরোধী দাঙ্গার তথ্য দিয়ে তার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে।

শিখ বিরোধী তৎপরতায়ও ভারতের হিন্দুত্ববাদী দল ও নেতৃত্ব পিছিয়ে নেই। স্বাধীনতাউত্তর ভারতে বিগত ছয় দশকেও বেশি সময় ধরেই পাঞ্জাবের শিখরা সংখ্যাগুরু হিন্দু আধিপত্য ও নির্যাতনের অভিযোগ করে আসছে। ১৯৭৫ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি নির্বাচনে কারচুপি ও অসদুপায়ের জন্য আদালতে অভিযুক্ত হন। তাকে ৬ বছরের জন্য সরকারী পদের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। বিরোধী দলগুলো তার পদত্যাগ দাবী করেন। এর জবাবে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে হাজার হাজার বিরোধী রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের জেলে প্রেরণ করেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করেন এবং নির্বাচন স্থগিত করেন। এছাড়াও যে সাংবিধানিক আইন লংঘন করার দায়ে আদালত তাকে শাস্তি প্রদান করেন সেই আইনও তিনি বদলে দেন। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের ফ্যাসীবাদী আচরণের বিরুদ্ধে শিখরা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং স্বায়ত্তশাসিত খালিস্থানের দাবীতে হাজার হাজার শিখ রাস্তায় নেমে পড়েন। ইন্দিরা গান্ধী ৪০ হাজার শিখ নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করে বিনা বিচারে আটক করে রাখেন।

পরবর্তী নির্বাচনসমূহে ইন্দিরা গান্ধী আকালী দলকে প্রতিহত করার জন্য রক্ষণশীল ধর্মীয় নেতা ভিন্দ্রানওয়ালেকে রাজনৈতিক সমর্থন প্রদান করেন। ভিন্দ্রানওয়ালে প্রথম অবস্থায় তার টোপ গিললেও পরবর্তীকালে অমৃতসরের দরবার সাহিব ভিত্তিক রাজনীতিতে মনোনিবেশ করেন। তার আন্দোলনে পাঞ্জাবের প্রশাসন যন্ত্র অচল হয়ে পড়ে এবং ১৯৮৪ সালের জুন মাসে ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে ভারতীয় সেনাবাহিনী ট্যাংক ও সাজোয়া বাহিনী নিয়ে শিখদের পবিত্র মন্দির দরবার সাহিব আক্রমণ করে। তারা স্বর্ণ মন্দির গুড়িয়ে দেয় এবং শত শত শিখকে হত্যা করে। এর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ১৯৮৪ সালের ৩১ অকটোবর ইন্দিরা গান্ধীর দু'জন দেহরক্ষী (শিখ) তাকে হত্যা করে। ইন্দিরা হত্যার পর পুলিশের সহযোগিতায় কংগ্রেস কর্মীরা দিল্লী ও পাঞ্জাবসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শিখবিরোধী দাঙ্গা ঘটায়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের রিপোর্ট অনুযায়ী এই দাঙ্গায় হিন্দুরা ১৭ হাজার শিখকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে। ৫০ হাজার শিখ পরিবার তাদের সহায় সম্পদ হরিয়ে কপর্দক শূন্য হয়েছে। এটা ছিল শিখদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সবচেয়ে বড় দাঙ্গা।

## সংখ্যালঘু মুসলিমদের অবস্থা

ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। সে দেশের সরকারী হিসাবে বরাবরই এই সংখ্যাকে খাটো করে দেখানো হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব অনুযায়ী মুসলিমদের সংখ্যা তাদের মোট জনসংখ্যার ১০ থেকে ১২ শতাংশের মধ্যে। তবে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক কলম ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে রাজ্য


www.pathagar.com

সরকারগুলো কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যের একটি বিবরণী প্রকাশ করে দেখিয়েছে যে, সমগ্রভারতে মুসলিম জনসংখ্যা হচ্ছে মোট জনসংখ্যার ৩৪ শতাংশ। তবে দিল্লী, জম্মু কাশ্মীর কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, কর্ণাটক এবং আসামের মুসলিম জনসংখ্যা এই গড় হারের বেশী। ৪০ শতাংশের বেশী। আসামের ২৩টি জেলার মধ্যে ১১টি জেলাতেই মুসলিমরা সংখ্যা গরিষ্ঠ। এই জেলাগুলো হচ্ছে ধুবরী, গোয়ালপাড়া, বঙ্গাইগাঁও, বারপেট্টা, মরিগাও, নওগাও, করিমগঞ্জ , হাইলাকান্দি, কাছাড়, দারাং এবং কামরূপ। এর। মধ্যে ধুবরীতে মুসলিমদের সংখ্যা হচ্ছে ৭০.৪৫%, গোয়ালপাড়ায় ৫৮%, বারপেটায় ৫৭%, হাইলাকান্দিতে ৫৫%, করিমগঞ্জে ৫৯%। এই তথ্য Census of India (Religion) 1991-এর সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী সারা ভারতে মুসলিমদের সংখ্যা বছরে ৩.৭% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং হিন্দুদের সংখ্যা বাড়ছে ১.৬৭% হারে। মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের এই প্রবণতা ভারত সরকারকে ভাবিয়ে তুলছে। বিশেষ করে তারা আসামের ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন। তাদের এই উদ্বেগের কারণ মুখ্যতঃ দুটি। **এক.** আসাম ও সন্নিহিত রাজ্যসমূহে স্বাধীনতা আন্দোলন, যা ভারত সরকারের দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্নতাবাদ হিসেবে বিবেচিত। এই বিচ্ছিন্নতাবাদ রোধের জন্য তারা দু'টি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের নির্মূল করতে চাচ্ছে, পাশাপাশি ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে লক্ষ লক্ষ লোককে এনে ভারত সরকার আসামে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। Omeo Kumar Das Institute of social change and Deployment পরিচালিত এক সমীক্ষা অনুযায়ী ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সে দেশের সরকার ১৫৭৬৭৩৮ জন ভারতীয়কে আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিজমা বন্দোবস্ত দিয়েছে। এরা এবং এদের বংশধরদের সংখ্যা এখন ৩০ লক্ষ অতিক্রম করেছে। ফলে আসামের মূল বাসিন্দারা সংখ্যালঘুতে পরিণত হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। **দ্বিতীয়** যে উদ্বেগ সেটা হচ্ছে মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের সাথে গাট ছড়া বেধে আসামকে নিয়ে বৃহৎবাংলা গঠনের আশংকা। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের অবস্থা বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয়।

দৈনিক সংগ্রাম গত ২৮ জুলাই (২০১২) ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে গর্ব করলেও ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সেখানে নিরাপত্তা পায়নি। মাত্র বড় কয়েকটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতেই মারা গেছে ২৫৬৪৫। "অধিকাংশ সময়ই ক্ষমতায় কংগ্রেস" শিরোনামে প্রকাশিত এক সংবাদ নিবন্ধে ভারতের ৩৩টি রাজ্যে সংঘটিত ৬২টি বড় আকারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংক্ষিপ্ত বিবরণী তুলে ধরেছে। এই বিবরণী অনুযায়ী ১৯৪৭ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ৫৭ বছরের এই বড় বড় দাঙ্গাগুলো বন্ধে ভারতের কোন সরকারই কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি। রাজনৈতিক দলগুলো একে অপরের উপর দোষারোপ করেছে। বারিজ


www.pathagar.com

লাল গুপ্ত নামক একজন ভারতীয় গবেষক কর্তৃক ২০০৯ সালে সম্পাদিত একটি সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে প্রণীত সংবাদ নিবন্ধে বলা হয়েছে যে দাঙ্গা নিয়ে আলোচনা উঠলেই গুজরাট বা নরেন্দ্র মৌদির নাম উঠে আসে। কিন্তু এর বাইরেও কত দাঙ্গা হয়েছে তা আলোচনার বাইরে থেকে যায়। সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী ৬২টি বড় বড় দাঙ্গার সবগুলোতেই দাঙ্গাকারী হিন্দুদের টার্গেট ছিল মূলতঃ মুসলিমরা, একটিতে শিখরা থাকলেও কার্যতঃ তা মুসলিম বিরোধী দাঙ্গায় রূপান্তরিত এবং এসব দাঙ্গা কালে কেন্দ্রীয় সরকার সহ ৩৩টি রাজ্যে (প্রদেশ) কংগ্রেস, ১০টিতে জনতা পার্টি এবং ৭টিতে বিজেপি ক্ষমতাসীন ছিল। ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী ২০০১ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ঐ দেশে ৬৫৪১টি মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা হয়েছে এতে ২২৩৪ ব্যক্তি মারা গেছেন। সহায় সম্পত্তির ক্ষয় ক্ষতি বিশাল।

জওহর লাল নেহেরু ইউনিভার্সিটির রিসার্স স্কলার বি. রাজেশ্বরী সম্প্রতি Communal Riots in India : A chronology (1947-2003) শিরোনামে একটি গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করেছেন। তার রিপোর্টে তিনি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িকতার অনন্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার ভাষায় Communal riots have become a distinct feature of communalism in India. তিনি বলেছেন যে উনবিংশ শতাব্দির শেষ কোয়ার্টারের আগে ভারতে তেমন কোনো দাঙ্গা হয়নি। এটা শুরু হয় মুসলিমলীগ কর্তৃক দেশ ভাগের দাবী বিশেষ করে ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাসে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়ার পর থেকে। শ্রীমতি রাজেশ্বরী বছরওয়ারী হিসাব করে দেখিয়েছেন যে ১৯৪৭ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ৬০,১১২টি রায়ট সংঘটিত হয়েছে এবং এতে ২,২০,১৮৪ জন লোক প্রাণ হারিয়েছেন এবং আহত হয়েছেন ১০ লক্ষাধিক ব্যক্তি। এদের বেশীর ভাগই মুসলিম। সহায় সম্পদের ক্ষতি তিনি নির্ণয় করেননি। এসব রায়টে তিনি শিবসেনা, কর সেবক, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বিজেপি, বাজরাং দল এবং কংগ্রেসের সরাসরি সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি সহিংসতাসমূহের কিছু কারণও বিশ্লেষণ করেছেন এবং পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে উগ্র হিন্দুত্ব ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়ানোর ফলেই ধর্মীয় সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তার ভাষায় "During the time of Partition, it was the clash of political interest of the elites of two different communities which resulted in communal riots. But from the 1960s till the 1980s the local political and economic factors played a very important role in instigating riots. The emergence of Hindutva politics in the last two decades has been a cause of communal riots in this phase where the local factors have also played a


www.pathagar.com

role in instigating riots. তিনি আরো বলেছেন communal violence has entered a new phase with the Christians and members of other minority religions being made the Victims of planned attacks. Communal riots in the decade have been both urban and rural features but the extent of damage is always greater in the thriving centers of trade and commence. Tribal population in different areas are being forced to get involved in the attacks on muslims by bringing them within the Hindutvaa framework. They are paid for it in terms of money or one or two bottles of indigenous wine. Apart from economic reasons the call for Hindu unity which is primarily a means to achieve political advantage is the main source for communal violence in this decade."

অস্ট্রেলিয়ার Adelaide University'র Politics Department এর অধ্যাপক পিটার মায়ার ২০১০ সালের জুলাই মাসে (৫-৮ জুলাই) আদেলাইডে অনুষ্ঠিত এশিয়ান স্টাডিজ এসোসিয়েশনের ১৮শ দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে 'Are there political patterns in communal violence in India' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি ভারতের প্রধান প্রধান দাঙ্গাসমূহের বিস্তারিত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে ভারতে বেশীর ভাগ রায়টই নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট। নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্য রায়ট হচ্ছে ভয়ভীতি প্রদর্শনের একটি হাতিয়ার। উদাহরণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন, কংগ্রেস এবং জনসংঘ জব্বলপুরের মুসলিম ভোটারদের প্রজা সোসালিস্ট পার্টি (পিএসপি) থেকে আলাদা করার জন্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা বাধিয়েছিল। এই দু'টি দলের বিশ্বাস অনুযায়ী মুসলিমরা পিএসপিকে ভোট না দিলে তারা জয়লাভ করতে পারে না। কংগ্রেস মুসলিমদের একটা শিক্ষা দিতে চেয়েছে। যখনি মুসলিমরা তাদের কাছে সাহায্যের জন্য গিয়েছে তখনি কংগ্রেসের তরফ থেকে বলা হয়েছে, তোমরা পিএসপির কাছে যাও, তারা তোমাদের রক্ষা করবে (মায়ার, ১৯৭০, পৃঃ ৩৪০)। আয়ান কপল্যান্ডও একই মত পোষণ করেছেন। তার মন্তব্য হচ্ছে "Riots are not isolated events; they are embedded in and mirror to some extent the socio-political life of their times....what drives groups to get involved in a communal riot? In modern times, it almost always has to do with the bussines of winning elections" (Copland 2010, PP 139-141)


www.pathagar.com

**আসামের সাম্প্রতিক দাঙ্গা**

ভারতের আসাম রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় গত দু'মাস ধরে কখনো থেমে থেমে আবার কখনো অব্যাহতভাবে মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই দাঙ্গায় এ যাবত প্রায় ১২শ' নিহত এবং পাঁচ সহস্রাধিক লোক আহত হয়েছে। প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ লোক গৃহহারা হয়ে বিভিন্ন ক্যাম্পে মানবেতর জীবন যাপন করছে। আবার অনেকে এলাকা ছেড়ে প্রাণ ভয়ে বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিচ্ছে। সন্ত্রাসীরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সমূহের মাধ্যমেও বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে এবং ভয়ভীতি ত্রাসের সৃষ্টি করে আসাম বহির্ভূত অঞ্চলে তাদের কর্মস্থল সমূহেও নিরাপত্তার সমস্যা সৃষ্টি করছে। দেশটির সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহে অস্বস্তিকর এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

বলা বাহুল্য আসামে দীর্ঘকাল ধরে বোড়োদের সাথে আসামীদের দাঙ্গা হাঙ্গামা চলে আসছিল এবং আসামীরা বাঙ্গালী খেদাও আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল। এই প্রথম বোড়োরা মুসলিমদের উপর বড়ো ধরনের আক্রমণ চালিয়ে একটি সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। কেউ কেউ বলছেন যে উলফাদের নির্মূলে ভারত সরকারকে বাংলাদেশ সরকার সর্বাধিক সহায়তা প্রদানের ফলে এই নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তারা এখন বলছে মুসলিমরা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী এবং তাদের বাংলাদেশেই ফেরৎ যেতে হবে।

আমার দৃষ্টিতে আসামে আদিবাসী-অভিবাসী তথা স্থানীয় অস্থানীয় বাসিন্দা প্রশ্নে যা কিছু ঘটছে তা অনভিপ্রেত। আসামের বাসিন্দারা একটি মিশ্র নরগোষ্ঠির অংশ এবং স্মরণাতীত কাল থেকে মানবজাতির অভিপ্রয়ান সড়কের (migration rout) উপর অবস্থিত হওয়ায় আসাম কার্যতঃ মানব গোষ্ঠির প্রদর্শ-শালায় (Museum of races) পরিণত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আসাম বিশেষ কোন ও নৃগোষ্ঠির আদি নিবাস নয়, কখনো ছিল না। নৈহাটির ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র কলেজের অধ্যাপক অনিন্দিত ঘোষাল যথার্থই বলেছেন- "Assam represents a unique fusion of different racial and linguistic elements. Interestingly as a result of the long term migratory flow into Assam, it is linguistically and ethnically the most diversified state in India."

আসামের প্রাচীন নাম কামরূপ; এর রাজধানী ছিল প্রাগজ্যোতিষপুরা। ভারতের অপরাপর এলাকার সাথে এর যোগাযোগের মাধ্যম ছিল সংকীর্ণ ১৮ কিলোমিটারের একটি করিডোর। ১৮২৬ সালে বৃটিশরা অহমিয়া শাসনের অবসান ঘটিয়ে আসামকে তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেয়। তখন থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত বাংলার অংশ হিসেবে আসামের শাসন কার্য পরিচালিত হয়েছে। তবে কামরূপ নোয়াগাও এবং ধারং এলাকা তারা সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতো। বৃটিশ শাসনের এই আমলে আসামে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা যেমন বসতি স্থাপন করেছে (Internal


www.pathagar.com

migration) তেমনি বাইরের থেকে প্রচুর লোকজন এসেও সেখানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছে। বৃটিশরা আসামে চা চাষের প্রবর্তন করেন এবং এই শিল্পের শ্রমিক চাহিদা পূরণের জন্য তারা অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজন নিয়ে আসেন। প্রাথমিক অবস্থায় আসামের সন্নিহিত অঞ্চল পূর্ব বাংলা, পরে উত্তর প্রদেশ মধ্য প্রদেশ, তামিল নাড়ু, বিহার, উড়িষ্যা, ছোট নাগপুর ও নেপাল থেকেও হাজার হাজার লোক এসে সেখানে বসতি স্থাপন করে। নতুন কর্মসংস্থানের এই সুযোগ ছিল তাদের জন্য আকর্ষণীয়।

## বাংলা-আসাম সম্পর্ক

এখানে বাংলা-আসাম সম্পর্কের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এজন্য উপনিবেশিক আসামকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। এর একটি হচ্ছে ১৮২৬ থেকে ১৯০৫ এবং আরেকটি ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যকার আসাম।

আগেই বলেছি ১৮২৬ থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত বাংলার অংশ হিসেবে আসাম শাসিত হয়েছে। এই সময়ে সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কোম্পানীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল সমূহকে প্রাধান্য দিয়ে আসামকে পুনর্গঠন করতে গিয়ে তৎকালীন ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর সরকার ভাষা সমস্যার মুখে পড়েন। বৃটিশ স্বার্থে আসামের বদ্ধ সমাজ প্রবাসী শ্রমিক, নতুন প্রযুক্তি ও কলা কৌশল এবং ধ্যান ধারণার জন্য উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে তৎকালীন বাংলা সরকার ফার্সির পরিবর্তে বাংলাকে আসামের আইন আদালতের ভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন। এতে অসমীয় ভাষা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অফিস আদালত, স্কুল পাঠশালায় বাংলা ভাষা শেখানোর জন্য তৎকালীন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বৃটিশরা হাজার হাজার লোককে আসামে নিয়ে যায়। ১৮৭৩ সালে স্বতন্ত্র একটি ভাষা হিসেবে আসামী ভাষা স্বীকৃতি পায় এবং ১৯০৩ সাল পর্যন্ত বাংলা ও আসামী ভাষা সমান্তরাল ভাবে সেখানে ব্যবহৃত হতো।

১৯০৫ সালে আসামকে পূর্ব বাংলার সাথে একীভুত করে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হয় এবং তার রাজধানী শিলং এর পরিবর্তে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। এই সময়ে পূর্ব বাংলার নিম্নাঞ্চল বিশেষ করে ময়মনসিং, পাবনা, বগুড়া, রংপুর প্রভৃতি এলাকা থেকে হাজার হাজার লোক আসামে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। তারা ঝোপ জংগল পরিস্কার করে আসামকে আবাদযোগ্য করে তোলে এবং আসামের কৃষি ব্যবস্থায় অপরিহার্য হয়ে উঠে। এই সময়ে আসাম প্রশাসনের তরফ থেকে বাংগালীদের বসতি স্থাপনকে উৎসাহিত করা হতো। হিন্দুদের বিরোধিতার মুখে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয় এবং পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে গঠিত নতুন প্রদেশ ভেঙ্গে দেয়া হয়। কিন্তু এর পরও বহু বছর পর্যন্ত আসামে বাংগালী অভিবাসন প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। যেহেতু আসাম বাংলা সহ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলও বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেহেতু এ ধরনের অভিবাসনের উপর কোথাও কোনও বিধি নিষেধ ছিল না। তবে অতিরিক্ত পতিত জমি


www.pathagar.com

থাকার কারণে আসামে অভিবাসন হার মাত্রাতিরিক্ত ভাবে বৃদ্ধি পায় এবং তা রোধ করার জন্য ১৯২০ সালে বৃটিশ সরকার লাইন প্রথা চালু করেন। এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে তৎকালীন কৃষক নেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৯২৮ সালে আসামে হিজরত করেন এবং লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তিনি এই পদ্ধতি বিলোপ করে সমস্যার সমাধান হিসেবে Unified Bangassam গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। স্যার মুহাম্মদ সাদুল্লাহ্ আসামের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে পূর্ব বাংলা থেকে সরকারীভাবে আসামে বাংলা ভাষাভাষী লোক নেয়া হয়। এর পেছনে আসামকে পাকিস্তানভুক্ত করার একটা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য থাকলেও কার্যতর তা হয়নি।

১৯৩১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী আসামের মোট জনসংখ্যা ছিল ৭২০৮৯৭৩ জন। এর মধ্যে বাঙ্গালী মুসলিমার সংখ্যা ছিল ৩৯৬০৬১২ জন, অসমীয় ছিল ১৯৯২৮৪৬ জন। এদের বেশীর ভাগই ছিল হিন্দু। অবশিষ্ট ১২৫৫৫১৫ জন ছিল উপজাতি। এরা ছিল প্রকৃতিবাদী, কোনো ধর্মে বিশ্বাস করতো না। দেশ ভাগের সময় মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে আসামের পাকিস্তানভুক্ত হবার কথা ছিল এবং কংগ্রেসের তরফ থেকে কার্যতঃ স্বীকার করে নেয়া হয়েছি যে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত যে সমস্ত লোক আসামে বসতি স্থাপন করেছে তাদের বৈধতা দিয়ে ঐ বছরের জনসংখ্যাকে Cut off Point ধরে তার পাকিস্তান বা ভারতভুক্তির বিষয়টিকে মীমাংসা করতে হবে। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত এই অবস্থানে টিকে থাকেনি। তারা লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে প্রভাবিত করে শুধু মাত্র সিলেটে গণভোটের আয়োজন করে (৩ জুন ১৯৪৭)। এই গণভোটে সিলেটবাসীরা পাকিস্তানের পক্ষে রায় দেয়। তবে হিন্দু নেতাদের দাবীর মুখে, কারুর কারুর মতে, বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সুন্দরী নারীর বিনিময়ে সীমানা কমিশনের বৃটিশ কর্মকর্তারা আসাম থেকে ত্রিপুরা যাবার করিডোরের জন্য করিমগঞ্জ মহকুমার অংশ বিশেষ অবৈধভাবে ভারতকে দিয়ে দেয়।

স্বাধীনতা উত্তর আসামের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ভারতের এই রাজ্যটির ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার স্থানীয় বাসিন্দারা সেখানে পূর্ববাংলার বাংলাভাষাভাষী দেশান্তরীদের বসতি স্থাপনের ব্যাপারে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। এর ফলে বাঙ্গালী এবং আসামীদের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতিগত সংঘাতের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা বহিরাগতদের জমিক্রয়, পতিতভূমি, চারণভূমি ও জংগলে চাষাবাদকে বাকা চোখে দেখতে শুরু করে। পক্ষান্তরে সুরমা উপত্যকার অবস্থা ছিল ভিন্ন। এখানে শুরু থেকেই বাংগালীদের প্রাধান্য ছিল। সিলেট আলাদা হয়ে যাবার পর কাছাড় আসামী বাংগালীদের ঐক্যের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়। ১৯৬১ সালে আসামে বাংগালী হিন্দু শরণার্থীদের সংখ্যা ৬ লক্ষে উন্নীত হয়; ১৯৫১ সালে এই সংখ্যা ছিল ২.৬ (দুই দশমিক ছয়) লক্ষ। আসামের মধ্যবিত্ত হিন্দুরা এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। নতুন বাংগালীদের আগমন পুরাতন বাংগালীদের অবস্থানকে আরো দৃঢ় করবে এবং এর ফলে


www.pathagar.com

আসামী ভাষা ও সংস্কৃতি সংকটের মুখে পড়বে এটাই ছিল তাদের ভয়ের কারণ। অবশ্য এর আগে ১৯৪৮ সালে সতীন্দ্র মোহন দাসের নেতৃত্বে কাছাড়, করিমগঞ্জ, লুসাই হিলস এবং ত্রিপুরার ন্যায় বাংগালী অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে স্বতন্ত্র একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী ও উঠেছিল।

আসামে বাংলা ও অসমীয় ভাষা নিয়ে বহু দাঙ্গা হয়েছে। সরকারী ভাষা কি হবে তা নিয়ে বিতর্কও হয়েছে। এই দ্বন্দ্ব সংঘাত ও বিতর্কের এক পর্যায়ে অসম জাতীয় মহাসভা আসামের তৎকালীন গভর্ণর শ্রী প্রকাশের নিকট একটি স্মারক লিপি পেশ করে। এতে প্রশ্ন তোলা হয় অসমীয়দের মাতৃভূমি হিসেবে আসামের টিকে থাকার কি অধিকার নেই? সম্ভবতঃ অসমীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই দাবীর প্রেক্ষিতে ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে Immigration Expulsion from Assam Act নামক একটি আইন ভারতীয় পার্লামেন্টে পাশ করা হয়। এর পাশাপাশি আসাম সাহিত্য সভাও এই সময় থেকে বাংলাভাষা বিরোধী তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করে। ১৯৫১ সালের ১৬ জুলাই তারা আসাম ব্যাপী রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করে। অভিবাসী বহিষ্কার আইন এবং বাঙ্গালী বিরোধী এসব আন্দোলনও দাঙ্গায় তৎকালীন ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল ইন্দন যোগায়। এর ফলে পুরুষানুক্রমে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী মুসলিম ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য হয় এবং এর প্রতিফলন ঘটে ১৯৫১ সালের আদম শুমারীতে। এই শুমারী অনুযায়ী আসামী হিন্দুদের সংখ্যা ১৯৩১ সালের ১৯৯৩৮৪৬ জন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৯৬৫১১৯ জনে এসে দাড়ায়। পক্ষান্তরে মুসলিমদের সংখ্যা ৩৯৬০৭১২ জনের তুলনায় হ্রাস পেয়ে ১৭ লক্ষে এসে পৌঁছায়। উপজাতীয়দের সংখ্যা সামান্য কমে ১২৫৫৫১৫ জন থেকে ১২৩৮০০০ এ এসে দাড়ায়। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় আসামে মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা ও তৎপরতা কখনো থেমে থাকেনি।

ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আমলে ১৯৮৩ সালে আসামে সম্ভবতঃ সবচেয়ে বড় আকারের মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা হয়। নেলী হত্যাযজ্ঞ (Nellie Massacre) নামে পরিচিত এই দাঙ্গায় কয়েক ঘন্টার মধ্যে দেশীয় অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হিন্দুরা ৫০০০ লোককে হত্যা করে। তাদের নির্মমতা থেকে দুধের শিশুও রেহাই পায়নি। এই দাঙ্গার নেতৃত্বে ছিল All Assam Students Union. ১৯৮৩ সালের নির্বাচনের পর এই সংগঠনটির সাথে ভারত সরকার চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করেন এবং এর ফলে বাংলাভাষী অভিবাসীদের বিরুদ্ধে তাদের শক্তি আরো বেড়ে যায়। এর পর আসামে স্বাধীনতা আন্দোলনও জোরদার হয় এবং উলফা (United Liberation Front of Assam) নামে একটি সংগঠন এর নেতৃত্বে চলে আসে। আসামের বাংলা ভাষাভাষী বাসিন্দারাও বসে নেই। তারা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে Assam United Democratic Front সহ বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেরাই নিজেদের পায়ে দাড়াতে উদ্বুদ্ধ হয়। তারা ভোট ব্যাংক হিসাবে কাজ করতে


www.pathagar.com

অস্বীকৃতি জানায়। সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনও গড়ে উঠে। এর ফলাফলও চমৎকার। ২০১১ সালে Assam United Democratic Front ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রবীন বিরোধী দলে পরিণত হয়। তাদের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা আসামের আঞ্চলিক দল সমূহ এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপি কর্তৃক প্রাপ্ত আসনের প্রায় তিনগুন বেশি। এই অবস্থা শুধু ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের জন্য নয়, হিন্দুত্ববাদীদের জন্যও দুঃসংবাদ বহন করে।

আগেই বলেছি আসামের স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে ভারত বিব্রতকর অবস্থায় আছে। এর মধ্যে আসামের বিভিন্ন জেলায় মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি, মাসজিদ মাদ্রাসার আধিক্য তাদের আরো ভারসাম্যহীন করে তুলেছে। ভারতীয় গোয়েন্দা তথ্যানুযায়ী আসামে বর্তমানে ১৮টি মুসলিম 'মৌলবাদী' সংগঠন কাজ করছে।

এগুলোর মধ্যে- Muslim United Liberation Tigers of Assam (MULTA), Order of Battle (ORBAT), Harkatul Mujahedeen (HUM), Muslim United Front of Assam (MUFA), Muslim Liberation Army (MLA) Muslim Volunteer Force (MUF), Independent Liberation Army of Assam (ILAA) Liberation Islamic Tiger Force (LITF) Islamic Security Force of India (ISFI) Muslim Liberation Tigers of Assam (MLTA) United Social Reform Army (USRA), Islamic Sebak Sangha (ISS), United Reformation Protest of Assam (URPA), Students Islamic Organization (SIO), Students Islamic Movement of India (SIMI), Jamaate Islami Hind, Assam Unit. Peoples United Liberation Front প্রভৃতি হচ্ছে প্রধান।

ভারত সরকার এবং ভারতের হিন্দুত্ববাদী দল সমূহের একটা ধারণা, বিএনপি জামায়াতসহ বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী দলগুলো আসামের মুসলিম সংগঠনসমূহের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করছে। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আসামকে ভারত থেকে আলাদা করে ফেলতে পারে। বাংলাদেশ থেকে ট্রানজিট-করিডোর সুবিধা নিয়ে আসামসহ উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের বিদ্রোহ দমনের লক্ষ্যে সৈন্য-সামন্ত ও অস্ত্র পরিবহণ এখন তাদের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে শিখন্ডি সরকার প্রতিষ্ঠা করে বিএনপি-জামায়াতসহ দেশপ্রেমিক দল ও নেতৃবৃন্দকে নির্মূলের যে অভিযান বর্তমানে বাংলাদেশে পরিচালিত হচ্ছে তা এ কাজে তাদের সহায়তা করবে বলে তাদের ধারণা। আসামের সর্বশেষ দাঙ্গাও এই অভিন্ন লক্ষ্যে পরিচালিত।

### ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্যাথলজিকেল টেস্ট

ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায় যে এর চরিত্র


www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রকমের এবং কোন না কোন ভাবে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগকে অস্বীকার করে সারা উপমহাদেশে হিন্দু আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটি প্রয়াসের অংশ। এ প্রেক্ষিতে ভারতে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার কারণ নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করতে গেলে হিন্দু ধর্ম ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কিছুটা প্যাথলজিক্যাল টেস্ট প্রয়োজন। ভারতের কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে ধর্ম হিসেবে হিন্দুত্ব প্রকৃত পক্ষে সন্ত্রাস-দাঙ্গায় বিশ্বাস করে না। তারা মনে করেন সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে হিন্দুত্ব কোন ধর্মই নয়। বরং অনেকগুলো ধর্মের একটি সংসদ বা মহাসভা (Parliament of religions) এবং এ পার্লামেন্টই হচ্ছে ভারতীয় জাতিসত্ত্বার অংশ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীলংকার তামিলরা, যাদের পূর্বপুরুষরা ভারতের তামিলনারডু রাজ্য থেকে সেদেশে বসতি স্থাপন করেছে, বৌদ্ধ অধ্যুষিত শ্রীলংকার জন্য একটি নিরাপত্তা হুমকি। জম্মু ও কাশ্মীর ইনস্টিটিউটের পরিচালক বলরাজ পুরীর মতে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের পরিচয় একটি জাতি হিসেবে নয় বরং একটি সভ্যতা হিসেবে।

তার মতে সংযুক্ত দক্ষিণ এশিয়ার অভিন্ন সকল সভ্যতার ঐতিহ্য মিলিয়ে ভারতীয় সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। এই অর্থে ভারত বর্ষের প্রধান ধর্ম হিন্দুত্ব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এক ও অভিন্ন। ত্রিমুখী স্যামুয়েল শাহ এর মতে হিন্দু শব্দটি এসেছে আরবী সিন্ধু শব্দটি থেকে। আরবরা সিন্ধু নদের পূর্বাংশে বসবাসকারী অধিবাসীদের এই নামেই অভিহিত করতেন। হিন্দুত্ব সম্পর্কে তার ধারণা আরো ব্যাপক। তার ভাষায় ঃ

"Whenever local faiths acquired a common level of Hinduism, it has been an evolutionary religion with large diversity in beliefs, practices, gods and goddesses in which there is room for every form of belief and practice that is possible for human imagination to conceive."

এই ধারণায় বিশ্বাসী ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতবর্ষ ও তার বাইরের প্রতিটি নতুন ধর্ম বিশ্বাস হিন্দু ধর্মের বিবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রভাব রেখেছে এবং এ ক্ষেত্রে যে মিথস্ক্রিয়া হয়েছে তাতে হিন্দুত্ববাদ নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেছেন যে, হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস, ধর্ম গ্রন্থ, আচার আচরণ ও সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল। (ঐতিহাসিকদের মতে বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্ম থেকে প্রাচীন। এ প্রেক্ষিতে এ সম্পর্কে লেখকের ভিন্ন মত রয়েছে।) কিন্তু এ ধর্মগুলোর কোনটিই তাদের স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে পারেনি। অপরাপর ধর্ম বিশ্বাসসমুহের কোনটিও তাদের আত্মীকরণ চরিত্র বজায় রেখে স্বতন্ত্র সামাজিক পরিচয় রক্ষা করতে পারেনি। অবশ্য শিখরা এখানে কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী ধর্মীয় আচার ও নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। ভারতীয় মন মানসিকতায় খৃস্ট ধর্মের প্রভাব ও লক্ষ্যণীয়। স্টিফেন নেইলের মতে,


www.pathagar.com

"Hinduism is ready even to absorb Christ into itself..... it reveres Him as one of the greatest teachers of the world; there are many Hindus who sincerely regard themselves as His followers and yet reject His claim to be savour of mankind. Though Christ, the original teacher, is to be reversal, the church is a western importation and a part of the exploitation of India by the West."

উপরোক্ত ধ্যান ধারণায় বিশ্বাসীদের মতে ভারতের ধর্মীয় সংস্কৃতিতে ৫৭ খৃস্টাব্দ থেকে যীশু খৃস্টের বাণী কিছুটা আসন গাড়তে সমর্থ হলেও আনুপাতিক হারে খৃস্টান সম্প্রদায় কখনো ভারত বর্ষে তাদের অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারেনি। এক্ষেত্রে এই দিক থেকে ভারত বর্ষে ইসলামের আবির্ভাব এক অনন্য সাফল্যের পরিচায়ক। প্রখ্যাত সমাজবিদ Murray T. Titus এর মতে,

"No doubt Islam with its clear, definite and simple creed which stood in contrast to indigenous vagaries of the imagination and separation about god, appealed to many Hindus as a satisfying solution of vexed problem of theology, to others its social democracy granted a welcome release from the bondage of caste."

ইসলামের সাম্য মৈত্রি, সামাজিক সুবিচার, নিরাকার আল্লাহর আরাধনা, বৈষম্যহীন সমাজ কাঠামো, সংযমী জীবন ও অন্যায়-অশ্লীল কর্মকাণ্ড বিরোধী অবস্থান কুলীন ব্রাহ্মন্যবাদের অত্যাচার ও বর্ণভেদে জর্জরিত ভারতবাসীদের কাছে প্রকৃত অর্থে মুক্তির সনদ বলে গণ্য হয়। তবে উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা শুরু থেকে এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। আদর্শিক লড়াই-এ ইসলামের মুকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে তারা ধর্মান্তরিত মুসলিমদের আকিদা বিশ্বাসকে প্রভাবিত করার কৌশল গ্রহণ করে। এই কৌশল মুকাবিলার প্রস্তুতি প্রাথমিক যুগের ইসলাম প্রচারকদের খুব একটা ছিল বলে মনে হয় না। এর ফলাফল ছিল স্বাভাবিক। দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করলেও সামগ্রিক অর্থে হিন্দুদের আচার আচরণ ও সংস্কার সংস্কৃতি ইসলামের উপর যত প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে ইসলাম হিন্দু ধর্মের উপর তত প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। Murray T. Titus এর ভাষায়-

"There seems to be little doubt that Hinduism has wrought a far greater change in Islam than Islam has wrought in Hinduism"


www.pathagar.com

ইসলাম ও তার অনুসারীদের গুণগত বৈশিষ্ট্যের দিক বিচার করতে গেলে দেখা যায় যে অপরাপর দেশীয় ও বিদেশী ধর্ম এবং ধর্মাবলম্বীদের সাথে তাদের একটা বিরাট পার্থক্য সব সময় ছিল এবং এখনো আছে। অপরাপর ধর্মগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হিন্দুত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে গেলেও ইসলাম বিলীন হয়নি। বৌদ্ধ ও খৃস্টান ধর্ম দেব দেবী ও মূর্তি উপাসনার বিরোধী ছিল কিন্তু ভারতে এসে এই ধর্মগুলোয় মূর্তি পূজার প্রচলন হয়। আবার এদের অনেক অনুসারী আছেন যারা পরিচয়ে বৌদ্ধ খৃস্টান হলেও আচার বিশ্বাসে হিন্দু দেব দেবীর অর্চনা করেন। ইসলামের বেলায় তা হয়নি। এর অনুসারীরা যেমন তাদের ধর্মীয় পরিচয় অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছে তেমনি ইসলামে মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ হওয়ায় হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলিমরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে হিন্দু দেব দেবীও অবতারের আসনে বসায়নি। বলারাজ পুরি যথার্থই বলেছেন,

"Qualitative diffference between Islam and other indigenous as well as foreign religions was that its followers could retain their communal identity in tact. Its prophet (sm) could not be accommodated in the patheon of Hindu gods, goddesses and avatars as one more idol because idol worship is prohibited in Islam. Arabic names of Muslims were another identity factor."

এটা অনস্বীকার্য যে অবিভক্ত ভারতে ইসলামের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি পেলেও এই অঞ্চলে হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও মূল্যবোধের মধ্যে কদাচিৎ সংঘর্ষ-সংঘাত ঘটেছে। এই অঞ্চলের হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা মুসলিমদের চরিত্র মাধুর্য দেখেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। যারা তখন ইসলাম প্রচার করেছেন তাদের মধ্যে যেমন খ্যাতনামা দা'য়ী ছিলেন তেমনি ছিলেন বণিক, পরিব্রাজক এবং সুফী সাধকও। ভারত বর্ষে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার আগে বা পরে কখনো ইসলাম প্রচারক কিংবা মুসলিম সেনাবাহিনী ভারতীয়দের ভয়ভীতি প্রদর্শন কিংবা কপালে অস্ত্র ঠেকিয়ে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেনি। Murray T. Titus তার Islam in India and Pakistan শীর্ষক গ্রন্থে বিষয়টি আরো পরিষ্কার করেছেন। তিনি বলেছেন,

"There seems to be ample reason for believing that a large proportion of the present Muslim population of India (undevided) can be regarded as the result of peaceful penetration than be associated with the harsher methods of Muslim Conquerors."

দক্ষিণ এশিয়া বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশই হচ্ছে সম্ভবতঃ বিশ্বের এক মাত্র অঞ্চল যেখানে বিশাল ভূ-খণ্ডব্যাপী পরিব্যাপ্ত একটি অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠিকে


www.pathagar.com

মুসলিমরা প্রায় আটশ বছর শাসন করেছে। এই শাসন প্রক্রিয়ায় উভয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সৃষ্টিশীল বহু মিথস্ক্রিয়া হয়েছে। মুসলিম শাসকরা তাদের শাসন কার্যে হিন্দু পন্ডিত বুদ্ধিজীবীদেরও কাজে লাগিয়েছে। অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মুসলিম শাসনামলে ভারতবর্ষ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে বিপুলভাবে উপকৃত হয়েছে যা সভ্যতা বিনির্মাণে দেশটিকে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। অংকশাস্ত্র, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যাসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যেখানে মুসলিমরা অনন্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেনি। অবশ্য এটাও সত্য যে, মোঘল আমলে কোন কোন সময়ে মুসলিম শাসক ও মোঘল সম্রাটদের সাথে মারাঠা দস্যু এবং হিন্দু রাজন্যবর্গের কারুর কারুর সাথে সংঘর্ষ হয়েছে। ঐ সংঘর্ষ ছিল রাজায় রাজায়। কিন্তু তা সাধারণ মানুষ পর্যন্ত গড়ায়নি। এই ৮০০ বছরের মধ্যে ঐতিহাসিকরা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ তথা হিন্দু-মুসলিম রায়টের উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা রেকর্ড করতে পারেনি। উভয় ধর্মের অনুসারীরা পাশাপাশি গ্রাম বা পাড়ায় বসবাস করেছে, নিজ নিজ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলেছে। কিন্তু পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়নি, কিংবা কেউ কাউকে বহিরাগত বা আদিবাসী হিসেবে অভিহিত করেননি। আবার শাসকশ্রেণী হিসেবে মুসলিমরা ছিল সংযমী, সহনশীল এবং ন্যায় পরায়ন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সকল প্রকার উপকরণ, অর্থ-সম্পদ, অস্ত্র ও প্রশিক্ষিত জনবল এবং সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম শাসক শ্রেণী কিংবা এই ধর্মের অনুসারী সমাজপতিরা কখনো তাদের প্রতিবেশী হিন্দুদের নির্মূল কিংবা তাদের সম্পত্তি ভোগ দখলের লক্ষ্যে ধ্বংসাত্মক কোনও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেনি। তারা হিন্দুদের ধর্ম পালনে সহায়তা করেছে, তাদের ধর্মগ্রন্থ স্থানীয় ভাষায় অনুবাদে অর্থ সাহায্য দিয়েছে এবং পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। বস্তুত মুসলিমরা যদি প্রতিহিংসা পরায়ণ পরধর্মের প্রতি অসহনশীল কিংবা উগ্র সাম্প্রদায়িক মতবাদে বিশ্বাসী হতেন তাহলে ভারতবর্ষে ৮০০ বছরের মুসলিম শাসনামলে কোন অমুসলিম জীবিত থাকতে পারতো না। তাদের শাসনামলে ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল শাসননীতির অন্যতম অংশ। ফলে শাসন ক্ষমতা গ্রহণের সময় তারা যেমন এই দেশে সংখ্যালঘু ছিল তেমনি শাসনক্ষমতা হারানোর সময়েও সামগ্রিকভাবে তারা সংখ্যালঘুই ছিল যদিও অঞ্চলভিত্তিতে কোন কোন প্রদেশ বা রাজ্যে মুসলিমরা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সংখ্যাগুরুতে পরিণত হয়েছিল। মুসলিম শাসকদের কাছ থেকে শাসন ক্ষমতা বৃটিশদের হাতে চলে যাবার পর অবস্থার পট পরিবর্তন ঘটে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উপমহাদেশের হিন্দু এবং মুসলিমরা যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও প্রতিবেশিসুলভ সৌহার্দ্য নিয়ে বসবাস করে আসছিলেন তাতে কিছু কিছু ছেদ পড়তে শুরু করে। এর কারণ ছিল সুস্পষ্ট, বৃটিশদের Divide and Rule-নীতির পরিণতি। বলাবাহুল্য ভারতের ব্রিটিশ শাসন ছিল প্রথম বিদেশী শাসন যা বিদেশের মাটি থেকে পরিচালনা করা হতো। মুসলিমরা এই দেশ শাসন করেছে


www.pathagar.com

এদেশের মাটি থেকেই, বহিরাগত হয়ে নয়। তাদের জন্ম যেমন এদেশে হয়েছে, মৃত্যুর পরেও তাদের কবর এদেশের মাটিতেই হয়েছে। পক্ষান্তরে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা ছিল ভিন্ন। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এই দেশ শাসন করেছে এবং তাদের হেড কোয়ার্টার ছিল ইংল্যান্ডে। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সিপাহী বিপ্লবের পর ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা ব্রিটেনের রানী তার নিজ হাতে নিয়ে নেন। তার রাজধানীও ছিল লন্ডন তথা ইংল্যান্ডে। ব্রিটিশ প্রতিনিধির মাধ্যমে তিনি দেশ শাসন করেছেন। ব্রিটিশ শাসকরা যেমন এদেশে জন্ম নেননি, তেমনি তাদের কবরও তারা এদেশে রেখে যায়নি। স্বাভাবিকভাবে মুসলিমদের কাছ থেকে শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার কারণে ব্রিটিশরা মুসলিমদের অস্তিত্বকে নিরাপদ মনে করতো না। একইভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের উপরও তারা পরিপূর্ণ আস্থা রাখতে পারতো না। এই অবস্থায় তারা হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায় ও জাতি সত্তার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কৌশলকেই প্রাধান্য দিতে শুরু করে। তারা হিন্দু দর্শন, হিন্দু পুরান, হিন্দু ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং অতীত গৌরবের প্রকৃত ও কাল্পনিক গাথাসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করে ভারত বিজেতা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টির কৌশলে মেতে উঠে। তারা হিন্দু পুরানের নায়ক নায়িকাদের দেব-দেবীর আসনে বসায় এবং বেদের বিপরীতে রামায়ণ ও মহাভারতকে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে উপস্থাপনে ব্রাহ্মণদের উৎসাহিত করে। এই প্রক্রিয়ায় রাম ও কৃষ্ণকে দেবতা ও ভগবানের অবতার হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই পর্যায়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞাও বদলে দেয়া হয়। এবং বলরাজ পুরীর ভাষায় 'Hinduism became a religionaized version of Indian nationalism of which the deity which had maximum emotive appeal was Bharat Mata.'

অর্থাৎ হিন্দুত্ব ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধর্মীয় প্রতিরূপে পরিণত হয়। এই জাতীয়তাবাদের যে দেবতা বা ঈশ্বর সবচেয়ে বেশি আবেগ উচ্ছ্বাসের কেন্দ্রে পরিণত হয় তা হচ্ছে ভারত মাতা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকাংশ ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের নিয়ে জাতীয়তাবাদী হিন্দু নেতৃত্ব গড়ে উঠে। বঙ্কীম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, বিবেকানন্দ, তিলক, মদন মোহন মালভিয়া এবং স্বয়ং মোহন লাল করমচান্দ গান্ধী- এদের সকলেই এক দিকে হিন্দু ধর্মের গোড়া অনুসারী অন্য দিকে জাতীয়তাবাদী ছিলেন। জওহর লাল নেহেরু কিছুটা ব্যতিক্রম হলেও প্রকৃত অর্থে তার অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন গান্ধী- বস্তুতঃ তাকে গান্ধীর বেহালা (Fiddle) বলা হতো। গান্ধী অবশ্য সহনশীল হিন্দুদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলে অনেকের ধারণা। অন্যদিকে উগ্রপন্থী হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা উনবিংশ শতাব্দির ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করতেন যার মূল কথাও ভিত্তি চিল এক ধর্ম ও এক ভাষা। কুখ্যাত নাস্তিক বীর সাভারকরের নেতৃত্বাধীন এই জাতীয়তাবাদ ছিল হিন্দু সম্প্রদায়কেন্দ্রিক। হিন্দু


www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদীদের একটি অংশ বৃটিশ শাসনকে আশির্বাদ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আরেকটি অংশ সশস্ত্র পন্থায় তাদের উৎখাতে বিশ্বাসী ছিল।

পক্ষান্তরে মুসলিমদের প্রতিক্রিয়া ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। প্রথমতঃ মুসলিম আলিম উলামাদের বৃহত্তর অংশ বৃটিশ শাসনকে গ্রহণ করতে পারেনি। তারা শাসকের মর্যাদা থেকে শাসিতের মর্যাদায় নেমে আসায় নতুন পরিস্থিতি যেমন তাদের জন্য অসহনীয় ছিল তেমনি খৃস্ট ও পাশ্চাত্য সভ্যতা, শিক্ষা দীক্ষা, আচার আচরণ প্রভৃতিসহ তাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি ছিল বিষতুল্য।

ভারতের দেওবন্দী আলিমরা এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে এবং ইংরেজী শিক্ষা ও আচার আচরণকে হারাম বলে ঘোষণা করেছে। এই আলিমদেরই একট ক্ষুদ্র অংশ-মাওলানা আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে গান্ধীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অনুসারীতেও পরিণত হয়েছিল। তারা কংগ্রেসপন্থী একটি ওলামা সংগঠনও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর পাশাপাশি গান্ধী-নেহেরুসহ কট্টর হিন্দুত্ব ভিত্তিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বাইরে থেকে এবং বিদ্যমান অবস্থার সংগে খাপ খাইয়ে মুসলিমদের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা এবং তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে আধুনিক শিক্ষিত এবং আলিমদের এক বিরাট গ্রুপ ও তৎপর ছিলেন। এদের সকলকে এক পাল্লায় মাপা না গেলেও তারা প্রত্যেকেই স্বকীর্তিতে মহীয়ান ছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ আমীর আলী, চেরাগ আলী, আগা খান, ড. মোহাম্মদ ইকবাল, এ কে ফজলুল হক, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, নবাব সলিমুল্লাহ প্রমূখ এর অন্যতম ছিলেন। এরা যে স্রোতধারা সৃষ্টি করেছিলেন তার বাইরে যেসব আলিম উলামা ইসলামী রেঁনেসা ও পুনর্জাগরণের আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার মধ্যে মাওলানা সৈয়দ আবুল আলা মওদূদী ছিলেন একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এই আন্দোলসমূহের বিস্তারিত বিবরণ এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। তবে এখানে একটা কথা বলা দরকার যে মুসলিম শাসন-উত্তর বৃটিশ ভারতে হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মাবলম্বীরাই পারস্পরিক সদ্ভাব নিয়ে বসবাস করার চেষ্টা করেছে যদিও বৃটিশদের বিভেদ নীতি এক্ষেত্রে কোন কোন সময়ে বাধার সৃষ্টি করেছে। এই বিভেদের বীজ বুনা হয়েছিল বৃটিশ শাসনের শেষের দিকে। তার আগ পর্যন্ত শিক্ষা দীক্ষা, সুযোগ সুবিধা, চাকুরী বাকুরী প্রভৃতি ক্ষেত্রে হিন্দুরা প্রাধান্য পেয়েছে; মুসলিমরা বঞ্চনার শিকার হয়েছে। মুসলিমদের এই বঞ্চনায় হিন্দুরা অনেক ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করেছে।

আগেই বলেছি ভারতের উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের দৃষ্টিতে হিন্দুত্ব এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। তারা মনে করেন ভারত বর্ষের সকল নাগরিকই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অংশ এবং এই অর্থে সকলেই হিন্দু। যারা নিজেদের হিন্দু মনে করে না তারা ভারতীয় হতে পারে না। এই দৃষ্টিতে উগ্র জাতীয়তাবাদ সর্বদা উগ্র হিন্দুত্বের পথকে মসৃণ করে দেয়। ১৯৪৭ সালে অর্জিত


www.pathagar.com

স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত বীর সাভারকারের নেতৃত্বাধীন হিন্দু মহাসভা এবং আর এসএস এই ধারণা বিশ্বাসের অনুসারী ছিল। তখন এই উভয় সংস্থার শক্তি সামর্থ ছিল প্রান্তিক। এর কারণ তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের প্রধান টার্গেট ছিল বৃটিশ বিতাড়ন তথা বৃটিশ বিরোধিতা, মুসলিম বিরোধিতা নয়। স্বাধীনতার পর অবস্থা পাল্টে যায়। পাকিস্তান ও মুসলিম বিরোধিতা ভারতীয় জাতীয়তার মূল টার্গেটে পরিণত হয়।

ভারতের সংবিধানে দেশটিকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং সকল ধর্মের অনুসারীদের সম অধিকারে নিশ্চয়তা দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা গেছে যে মুসলিমরাই সেখানে সবচেয়ে বেশি নিগৃহিত, অচ্যুত বা হরিজনরাও সেখানে যে অধিকার পায় মুসলিমরা তাও পায় না। বলরাজপূরী এর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন-

"In India religious militancy as such is not a major force. But Hindu community identity is, which masquerades as Indian nationalists. Hindu militancy, without much theological religious contest, assumes the form of national Chauvinism which threatens the minorities, particularly the Muslims."

অবশ্য এখানে খুব চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে বৃহৎ ও অপেক্ষাকৃত সক্রিয় হিন্দু সাম্প্রদায়িক দলগুলো তাদের হিন্দু পরিচয় গোপন করে রেখেছে। পুরী তার পর্যালোচনায় এই বিষয়টিও এনেছেন এবং বলেছেন-

"After independence the "other" to define Indian nationalism became Pakistan. A harder line against Pakistan and on Kashmir became the Principal planks of Hindu nationalism. But neither Rastriya Swayam Sevak Sangh (RSS) which means national voluntary service organization nor Bharatiya Jana Sangh, roughly translated as Indian peoples organization which was formed as its political wing in 1951 used the word Hindu in their names"

এখানে একটা কথা বলা দরকার যে উগ্র স্বদেশিকতার সাথে যখন ধর্মীয় গোড়ামী, অহংবোধ এবং নিকৃষ্ট বর্ণবাদ যুক্ত হয় তখন একটি সম্প্রদায় সকল প্রকার নীতি নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ এবং সংযম সহনশীলতা হারিয়ে ফেলে। তারা তখন দেশ প্রেমের একক ইজারাদার হয়ে দাঁড়ায়। অন্য কোনও সম্প্রদায়কে তারা সহ্য করতে পারেনা। ভারতের হিন্দুত্ব ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের অবস্থাও হয়েছে অনেকটা তাই। এর সূচনা হয়েছে দেশ বিভাগের আগে প্রথম ১৯০৫ সালে যখন বৃটিশরা বাংলা ও আসামের বঞ্চিত মুসলিমদের দুর্দশা কিছুটা প্রশাসনের জন্য বাংলা ভাগ করে


www.pathagar.com

মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব বাংলা ও আসামকে নিয়ে একটি প্রদেশ গঠন করেন এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে নব গঠিত প্রদেশের মুসলিমদের সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা প্রদানের সূচনা করেন। হিন্দুরা এই উদ্যোগকে বঙ্গ মাতার দ্বিখণ্ডিতকরণ আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেন এবং দুই বাংলার একত্রিকরণের জন্য দুর্বার আন্দোলন শুরু করেন। তাদের সূচিত স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনেরই অংশ ছিল এবং এই আন্দোলনে তারা ব্যাপকভাবে সহিংসতার আশ্রয়ও নিয়েছিল। তাদের আন্দোলনের মুখে ১৯১১ সালে নতুন প্রদেশ ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং পূর্ব বাংলা পুনরায় পশ্চিম বাংলার সাথে একত্রিত হয়। ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল। মুসলিম লীগ অথবা তার নেতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দেশ ভাগ করতে চাননি। তারা অবিভক্ত ভারতে স্বাধীন নাগরিকের সম মর্যাদা নিয়ে হিন্দুদের সাথে একত্রে বসবাস করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারেননি। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের অধীনে কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনের পর মুসলিমদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের অধীনে স্বাধীন সত্ত্বা এবং সার্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার এবং ধর্মীয় স্বাতন্ত্র নিয়ে তাদের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভবপর নয়। তবুও তারা চেষ্টা করেছেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ চৌদ্দ দফা আপোশ ফর্মূলা দিয়েও কিন্তু সম্মানজনক সহাবস্থানের গ্যারান্টি পাননি। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে আলাদা রাষ্ট্রের দাবী তুলেছেন। কিছু কাল আগে শৈলেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় "জিন্নাহ পাকিস্তান; নতুন ভাবনা" শীর্ষক তার পুস্তকে পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে দেশ বিভাগের জন্য জিন্নাহ দায়ী ছিলেন না, দায়ী ছিলেন নেহরু এবং পাতেলসহ হিন্দু নেতৃবৃন্দ। তিনি এও উল্লেখ করেছেন যে জিন্নাহর ঐক্য প্রয়াসের স্বীকৃতি স্বরূপ সরোজিনী নাইডু তাকে হিন্দু মুসলিম মিলনের অগ্রদূত হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। ভারতের জাতীয় মোহাফেজ খানায় রক্ষিত ঐতিহাসিক দলিলপত্র দিয়ে তিনি হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সৃষ্ট অনৈক্যের কারণগুলো চিহ্নিত করে বলেছেন যে মুসলিমরা ভারত বিভক্তি চায়নি তারা যা চেয়েছে তা হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনায় ন্যায্য অংশীদারিত্ব। হিন্দু নেতৃবৃন্দ তাদের তা দেয়নি। তিনি গান্ধী ও জিন্নাহর একটি কথোপকথন ও তার পুস্তকে উল্লেখ করেছেন তার বর্ণনানুযায়ী জিন্নাহ গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,

"Mr. Gandhi, will the fate of Muslims in the hands of Hindus will be the same as the fate of the Indians in the hands of the British?" গান্ধীর উত্তর ছিল, "No, Mr Jinnah, the Hindus and the Muslims will live like brothers and sisters and you will be the first prime Minister of undivided India, then he turned to Nehru and Said, What do you say?" নেহরু এ প্রশ্নের ইতিবাচক কোনও জবাব


www.pathagar.com

দেননি বরং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। একইভাবে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহসহ শীর্ষস্থানীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ বাংলাকে ভাগ করতে চাননি। বাঙ্গালী মুসলিমরা অবিভক্ত বাংলাকে নিয়ে যুক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতি ছিল। কিন্তু বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে এই যে, যে সমস্ত হিন্দু নেতানেত্রী, কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী ১৯০৫ সালের বাংলা বিভক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনে সোচ্চার হয়েছিলেন এবং স্বদেশী আন্দোলন ও অনুশীলন সমিতির ন্যায় সংগঠনের সন্ত্রাসী তৎপরতাকে উৎসাহিত করে বাংলার বিভক্তি রদ করতে বৃটিশদের বাধ্য করেছিলেন তারাই ৩৬ বছর পর বাংলাকে বিভক্ত করলেন। তাদের আশংকা ছিল মুসলিম আধিপত্যের। অবিভক্ত বাংলায় মুসলিমরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। হিন্দু নেতৃবৃন্দ পরিষ্কার দেখতে পারলেন যে বাংলা যদি অখন্ড থাকে তাহলে সংখ্যালঘু হিন্দুরা মুসলিমদের অধীনেই থাকতে বাধ্য হবে। পশ্চিম বাংলায় ছিল হিন্দুরা প্রান্তিকভাবে সংখ্যাগুরু। কাজেই বাংলা ভাগ করে তারা পশ্চিম বাংলাকে ভারতের অংশে পরিণত করে। তবে কুটিল স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অর্থনৈতিক দিক থেকে অগ্রসর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা মুর্শিদাবাদকে ভারতভুক্ত করে তার বিনিময়ে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ খুলনা জেলাকে পাকিস্তানের হিসসা বানিয়ে নেয়। এক্ষেত্রে লর্ড মাউন্টব্যাটেন তাদের দ্বারা প্রভাবিত হন। মুর্শিদাবাদ রাখার পেছনে তাদের আরেকটি কারণও ছিল এবং তা হচ্ছে ভারতীয় ভূখণ্ডের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে পতিত গঙ্গা নদীর উৎসমুখ নিয়ন্ত্রণ করা। গঙ্গার উপর ফারাক্কা বাধ তৈরির মাধ্যমে বাংলাদেশে পানি প্রবাহে বাধার সৃষ্টি থেকে পরবর্তীকালে তাদের এই উদ্দেশ্য বিশ্ববাসীর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভারতবিভাগের প্রাক্কালে পাঞ্জাব পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা ছিল বর্ণবাদী হিন্দুদের অসহনশীল আচরণেরই বহিঃ প্রকাশ। এর ঢেউ-প্রতিধ্বনী পূর্ব বাংলায়ও দেখা দিয়েছিল। তবে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতীক মোহন লাল গান্ধী হঠাৎ করে অহিংস মূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েও তা রোধ করতে পারেননি। কেননা তার আসল চেহারা তৎকালীন মুসলিমদের কাছে অপরিচিত ছিল না। অনেক মুসলিম নেতা (একে ফজলুল হক, আবুল হাসেম, হামিদুল হক চৌধুরী প্রমুখ) তাকে ভন্ড হিসেবে অভিহিত করতেন এবং সম্ভবতঃ একারণেই কোলকাতা, বিহার ও পাঞ্জাবের রায়ট প্রশমনের সক্রিয় কোনও উদ্যোগ না নিয়ে তিনি ছাগল নিয়ে নোয়াখালীর রামগঞ্জে শান্তি মিশন নিয়ে আসার প্রতিবাদ হিসেবে স্থানীয় লোকজন তার ছাগলটি জবাই করে খেয়ে ফেলেছিল।

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, পূর্ব পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ প্রভৃতি সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে স্বাধীনতার প্রাক্কালে মুসলিম বিরোধী দাঙ্গার যে ভয়াবহ চিত্র বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে তা হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাস ও অসহনশীল আচরণের বহিঃপ্রকাশ ছিল। ভারতীয় হিন্দুরা ভারত বিভক্তিকে মেনে নিতে পারেনি আবার বাংলা বিভক্তিতেও তাদের সম্মতি


www.pathagar.com

ছিল একটি প্রত্যাশা ভিত্তিক এবং তা হচ্ছে নেহেরুর ভাষায় পূর্ববাংলা অচিরেই তাদের কাছে ফিরে যাবে। এই ফেরৎ যাওয়াটাকে ত্বরান্বিত করার জন্য অর্থনৈতিক দিক থেকে তাকে পঙ্গু করে রাখার জন্য তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং নানা ষড়যন্ত্রও ফেঁদেছে।

এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। হিন্দুদের বৈষম্যমূলক আচরণ, আধিপত্যবাদী ধারণা বিশ্বাস, বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং আপোষহীন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে ভারত বর্ষের মুসলিমরা দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হলেও কোটি কোটি মুসলিম যারা বিভিন্ন অঞ্চলে সংখ্যালঘু ছিলেন তাদের বৃহত্তর অংশ সংগত কারণেই পাকিস্তানের অংশ হতে পারেননি। হিন্দু সমাজ এবং অধিকাংশ ভারতীয় রাজনৈতিক দল তাদের এই অবস্থানকে সহজভাবে মেনে নেয়নি। তারা তাদের দেশ প্রেম সন্দেহ করতে শুরু করে এবং পাকিস্তানের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ এনে তাদের যখন তখন হয়রানী ও যে কোনো সন্ত্রাসী ঘটনা দুর্ঘটনার জন্য তাদের দায়ী করে নির্যাতন করতে শুরু করে। তারা যখন প্রতিরোধ করতে গেছে তখনি সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়েছে এবং ভয়াবহ ধর্মীয় দাঙ্গার রূপ নিয়েছে।

এই অবস্থা এখনো অব্যাহত রয়েছে। ভারতে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার প্রকৃত কারণসমূহ বিশ্লেষণের প্রাক্কালে উরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা জরুরী।

এখন আসাম দাঙ্গা সম্পর্কে ভারতীয় ও বিদেশী পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু রিপোর্ট উল্লেখ করা যেতে পারে।

**ভারতীয় পত্রিকায় আসাম দাঙ্গার ভয়াবহতা**

আসামে বাংলাভাষী মুসলিমদের উপর বোড়ো হিন্দুদের অত্যাচার অতীত ইতিহাসের অনেক রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। দিল্লী থেকে প্রকাশিত Radiance Views weekly এই সহিংসতার একটি বিবরণ দিয়েছে 'The Harrowing Tales of Muslim Sufferings in Assam' শীর্ষক এক রিপোর্টে পত্রিকাটি বলেছে যে গত ২০ থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত বোড়ো লিবারেশন ফ্রন্ট এবং অন্যান্য বোড়ো উপজাতিভূক্ত হিন্দু গ্রুপগুলো Bodo Territory Council-এর অন্তর্ভুক্ত চারটি জেলা যথাক্রমে কোকড়াঝর, চিরাং, কাকবাসা, এঙ্গোদলীতে বসবাসকারী মুসলিম পরিবারসমূহের উপর আকস্মিকভাবে হামলা চালায়। তারা তাদের বাড়ীঘর ও সহায়সম্পত্তি পুড়িয়ে দেয়, গবাদি পশু ও উপার্জনের যাবতীয় উপকরণ লুটপাট ও ধ্বংস করে দেয় এবং ঠাণ্ডা মাথায় শত শত লোককে হত্যা করে। অবস্থার এতই অবনিত ঘটে যে প্রায় ৫ লক্ষ লোক বাড়ীঘর হারিয়ে ক্যাম্পে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। শিশু কিশোর যুবক, বৃদ্ধ, গর্ভবতী মা ও যুবতি মেয়ে কেউই তাদের অত্যাচার থেকে রেহাই পায়নি। ভারতীয় পুলিশবাহিনী সহ আসাম সরকারের তরফ থেকে দাঙ্গারোধ, অপরাধীদের গ্রেফতার


www.pathagar.com

এবং ক্ষতিগ্রস্তদের তাৎক্ষনিক সাহায্য ও পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ২৯ জুলাই অর্থাৎ দাঙ্গা শুরুর ৯ দিন পর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণ মাধ্যম সমূহের সমালোচনার মুখে মূখ্যমন্ত্রী তরুন গগৈর সরকার কিছুটা নড়েচড়ে উঠে। তারা রাজ্যব্যাপী ১৭৪টি ক্যাম্প স্থাপন করে। কিন্তু ক্যাম্পগুলোকে বসবাস উপযোগী করার জন্য যে মৌলিক সুযোগ সুবিধা তথা বিদ্যুৎ, পায়খানা, পেশাবখানার ব্যবস্থা, বিছানাপত্র, মশারী, খাবার পানি, রান্না উপকরণ ও চুলার ব্যবস্থা এর কোনটাই ছিলনা। তাদের কাপড় চোপড় ও গোসলের জন্য নারী পুরুষের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা এমন কি প্রাইভেসি রক্ষারও কোনও সুযোগ ক্যাম্পে নেই। স্থানীয় কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এগিয়ে এলেও তাদের সামর্থ হচ্ছে সীমিত। এই অবস্থায় সর্ব ভারতীয় জামায়াতে ইসলামী তাদের আশু সাহায্য ও পুনর্বাসনের জন্য এগিয়ে আসে, সংগঠনটির আমীর মাওলানা সাইয়েদ জালালুদ্দিন উমরীর আহ্বানে তারা সাহায্য সামগ্রী সংগ্রহ ও বিতরণে নেমে পড়েন। জামায়াতের তরফ থেকে ক্ষয়ক্ষতির ধরন প্রকৃতি, ব্যাপকতা, সাহায্য চাহিদা নিরূপন, স্থানীয় রাজনৈতিক দল ও গণ্যমাণ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে যোগাযোগ করে সংকট নিরসন এবং এলাকায় স্থিতিশীলতা আনয়ণ ও স্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাৎক্ষণিকভাবে মাওলানা রফিক আহমদ কাশেমী এবং মুহাম্মদ শাফি মাদানীর সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল আসামে পাঠান। তারা ভারতীয় জামাতের আসাম সার্কেলের নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় ত্রাণ শিবিরের অবস্থা পরিদর্শন করেন এবং ১৬টি ক্যাম্পে প্রয়োজনীয় ত্রাণ ও চিকিৎসা সামগ্রী বিতরণ করেন এবং অন্যান্য ক্যাম্পের অবস্থার উপর ভিত্তি করে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ মুসলিমদের সামগ্রিক দুর্দশা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। জামায়াত প্রতিনিধি দল, বেড়ো সম্প্রদায়ের হিন্দু নেতৃবৃন্দ এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দ ছাড়াও আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী, গণমাধ্যম কর্মী, সাবেক ও বর্তমান আইনসভার সদস্য, আসামের মুখ্য মন্ত্রীর মিডিয়া সেক্রেটারী, গোহাটির বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান ও কর্মকর্তাবৃন্দসহ সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাত করেন এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণ অনুসন্ধান ও তা দূরীকরণের সম্ভাব্য উপায় নিয়েও তারা আলোচনা করেন। তারা আসামের মুখ্যমন্ত্রী তরুন গগই এর সাথে প্রায় পৌনে ১ ঘন্টা ধরে বৈঠক করে মুসলিমদের দুর্দশার চিত্র তার নিকট তুলে ধরেন এবং দাঙ্গা রোধ, ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং অবিলম্বে তাদের পুনর্বাসনেরও দাবী জানান। তদন্তকালে জামায়াত প্রতিনিধিদের কাছে যে বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে ধরা পড়েছে তা হচ্ছে বোড়ো হিন্দুদের অসহিষ্ণুতা এবং বাংলা ভাষাভাষীসহ মুসলিমদের আসাম থেকে উৎখাত প্রবণতাই দাঙ্গার মুল কারণ। তারা মুসলিমদের সেখানে বহিরাগত বলে মনে করে। বিভিন্ন জেলা ও থানায় মুসলিমদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাবার ফলে বোড়োরা নিজেদের সংখ্যালঘুতে পরিণত হবার আশংকা করছে। এছাড়াও ভারতের জাতীয় ও


www.pathagar.com

স্থানীয় নির্বাচনও এক্ষেত্রে একটি কারণ হিসেবে কাজ করেছে। ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সামনের নির্বাচনে ভরাডুবির আশংকা করছে। এ প্রেক্ষিতে তারা আগে থেকেই মুসলিম ভোটারদের ভীত সশস্ত্র করে মুসলিম ভোট ব্যাংক তাদের অনুকূলে নেয়ার চেষ্টা করছে বলেও অনেকে মনে করেন।

Radiance এর খবরানুযায়ী বর্তমানে প্রায় প্রতি মাসেই ভারতের কোথাও না কোথাও দাঙ্গা হচ্ছে। জুলাই মাসে উত্তর প্রদেশে একাধিক দাঙ্গা হয়েছে এবং দাঙ্গার জন্য দায়ী উগ্র হিন্দুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে মুসলিম যুবকদের ধরে নিয়ে জেলে পুরা হয়েছে। মুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার লক্ষ্যে আজমগড় জেলায় কুরআন শরীফের পাতা ছিড়ে Firecracker তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে উসকিয়ে দেয়ার জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে হিন্দুরা ওয়াকফ এর জমি, মাসজিদ এবং এমনকি কবরস্থান পর্যন্ত দখল করেছে। ২০০২ সালে গুজরাটে বাবরী মসজিদ ধ্বংসে ক্ষমতাসীন সরকার, তার মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীবর্গসহ গোটা প্রশাসন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে বলে National Human Rights commission সহ বিভিন্ন তদন্ত সংস্থার রিপোর্টে প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং উচ্চ আদালতের তরফ থেকেও এই অভিযোগ দৃঢ়িকরণ করা হয়েছে। মানবাধিকার কমিশনের অভিযোগ অনুযায়ী দাঙ্গা উত্তর পরিস্থিতিতেও পুলিশ বাহিনী মুসলিমদের নিরাপত্তা প্রদানের পরিবর্তে তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে ২০১১ সালে জাতীয় মানবাধিকার সংস্থা তাদের বিস্তারিত তদন্তের আলোকে গুজরাটের মুখ্যসচিব ও পুলিশের মহাপরিচালকের ব্যাখ্যা তলব করেছে বলে র‍্যাডিয়েন্স জানিয়েছে (১৪.০৭.২০১২ সংখ্যা)।

ভারতীয় এই পত্রিকাটি ছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যম আসামের মুসলিমবিরোধী দাঙ্গার নিন্দা করেছে। এক্ষেত্রে খ্যাতিনামা সাময়িকী টাইম ম্যাগাজিনের মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ। নীচে এর বঙ্গানুবাদ দেয়া হলো ঃ

**টাইম ম্যাগাজিনের মন্তব্য**

"ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু সাম্প্রতিক পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ ও লুণ্ঠন এবং জাতিগত সহিংসতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে ভারতের সমাজ ব্যবস্থা অসহিষ্ণু ও জ্বরাগ্রস্থ। গত সপ্তাহে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে আসামের অভিবাসী বাংলাভাষী মুসলিমদের উপর পরিকল্পিত হামলা চালানো হবে। এরপর দলে দলে লোক আসাম ছেড়ে প্রত্যন্ত এলাকার বাড়ীঘরে যেতে শুরু করলো। একে exodus বা গণহারে এলাকা ত্যাগ শিরোনাম দিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যমে খবর প্রকাশ করা হয়।

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসামে হিন্দু ধর্মাবলম্বী বোড়ো সম্প্রদায় হাজার হাজার মুসলিমকে বাড়ী ছাড়া করেছে। ভারতের প্রযুক্তির রাজধানী বাঙ্গালোরের মত শহরে এসএমএস, ই-মেইল, ফেসবুক ও টুইটারের মাধ্যমে মুসলিমদের নিপীড়নের


www.pathagar.com

হুমকী দেয়া হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের উপর আক্রমনের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। রমাদান মাসের শেষ দিকে এ নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

হিস্টিরিয়ার মতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ায় ভারতের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের চারটি রাজ্য চীন, ভুটান, বার্মা (মিয়ানমার) ও বাংলাদেশ দ্বারা মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। এই রাজ্যগুলো খুবই অনুন্নত এবং এখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে। এখানকার লোকদের চেহারা চীন ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর অধিবাসীদের মতোই। এ কারণে তারা প্রতিনিয়ত বর্ণবৈষম্যের শিকার হয়। পদকজয়ী বক্সার মেরি কমের মতো অ্যাথলেটও ভারতের অন্যান্য অংশে তেমনটা প্রশংসিত হননি।

মনিপুর থেকে উঠে আসা নয়াদিল্লির শিক্ষাবিদ ইয়েংখম জিলাংগাম্বা আক্ষেপ করে বলেন, 'আমি নিজেকে ভারতীয় মনে করি কিনা সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো (ভারতীয়) লোকজন আমাকে ভারতীয় মনে করে কিনা। প্রতি মুহূর্তে আমাকে আমার ভারতীয়ত্ব প্রমাণ করে চলতে হয়। এটা আমাকে আঘাত করে। কখনও কখনও এটা আপনাকে রাগান্বিত করবে। আপনি হয়তো একে এড়িয়ে চলতে চাইবেন। কিন্তু সে আপনার পিছু ছাড়বে না।

ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে ভারতের অপরাপর অংশ থেকে তাদের দূরত্ব উত্তর-পূর্ব ভারতীয়দের এই বিচ্ছিন্নতাবোধের কারণ। নয়াদিল্লির সেন্টার ফর নর্থ ইস্ট স্টাডিজ অ্যান্ড পলিসি রিসার্চের চেয়ারম্যান সঞ্জয় হাজারিকা বলেন, 'এশিয়ার সবচেয়ে জটিল স্থান এই অঞ্চলটি। একটি ক্ষুদ্র করিডোর দ্বারা সংযুক্ত ত্রিকোণাকার আকৃতির এই অঞ্চলটিতে ২২০টি আদিবাসী সম্প্রদায় বাস করে।' তিনি বলেন, দুর্বল শাসনব্যবস্থা ও স্থানীয় সরকার এবং অস্থির ও সহিংস রাজনীতির কারণে এসব রাজ্য ভারতের অন্য অঞ্চল থেকে পিছিয়ে রয়েছে। কাশ্মীরে ভারত সরকার যেভাবে নির্মম সামরিক আইন জারি করে রেখেছে, এই সাতটি রাজ্যেও সশস্ত্র বাহিনীকে সে রকম বিশেষ ক্ষমতা দেয়া আছে। এখানে সশস্ত্র গোষ্ঠিগুলো সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। জীবনের নিরাপত্তার জন্য এখানকার অধিবাসীরা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে কাজের সন্ধানে বসতি স্থাপন করে থাকে।

হাজারিকা বলেন, দিল্লির রাজনীতিক ও আমলাদের অদূরদর্শিতার কারণে জটিলতা দিনদিনই বাড়ছে। আসামের সাম্প্রতিক সহিংসতা নতুন কিছু নয় মন্তব্য করে হাজারিকা বলেন, যুগের পর যুগ আদিবাসী বোড়ো সম্প্রদায় ও মুসলিমদের মধ্যে এ ধরনের সহিংসতা চলে আসছে। আসামের অনেক মুসলিম সম্প্রদায়ের পুরো একটি


www.pathagar.com

প্রজন্মই শরনার্থী শিবিরে জীবন কাটিয়েছে। বোড়ো ও বিজেপি দাবি করে যে, আসামের মুসলিমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছে। এ অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিও উল্লেখযোগ্য। এখানে চীনের বিশাল ছাড় দৃশ্যমান। অরুনাচল প্রদেশের বিশাল অংশ চীন নিজের বলে দাবি করে থাকে। ভারতের অমীমাংসিত এ অঞ্চলে চীন অবকাঠামো উন্নয়নে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করেছে।

চীনের জাতীয়তাবাদী ওয়েবসাইটগুলো সব সময় সরকারকে উসকানি দেয় চীন সরকার যেন ওই অঞ্চল দখল করে নেয়। উলফার মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলো মিয়ানমারের বিদ্রোহী এবং বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহানুভূতি পেয়ে থাকে। অরুনাচল প্রদেশের কংগ্রেসদলীয় এমপি নিপ্পং এরিং বলেন, 'স্কুলে গেলে আমাদের সিন্ধু সভ্যতা ও মহাভারত পড়ানো হয়। কিন্তু আমাদের পাঠ্যসূচীতে এ বিষয়টিও থাকা উচিত যে, উত্তর-পূর্ব ভারতে যেসব লোক বাস করে, তাদের চেহারা চীনা ও কোরীয়দের কিংবা অন্যদের মতো হলেও তারা সবাই ভারতীয়। তাদের ইতিহাস ভারতীয়দেরই ইতিহাস।'

অগাস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত টাইম ম্যাগাজিনের উপরোক্ত রিপোর্টটি ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষ চরিত্রের মুখোশ খুলে দিয়ে তার সাম্প্রদায়িক চেহারাকে তুলে ধরেছে। এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

## উপসংহার

ভারতের সংখ্যালঘু দাঙ্গা হিন্দু ভারতের সাম্প্রদায়িক ও অসহিষ্ণু রাজনীতির প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি। এর বৃহত্তর বলি হচ্ছে সে দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠি। এদের রক্ষা করার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের বর্তমান তৎপরতা শুধু অপর্যাপ্ত নয়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নির্লিপ্ততার সামিল। এক্ষেত্রে মুসলিম দেশগুলোর ভূমিকা ও লক্ষণীয় নয়।

উপরোক্ত অবস্থায় আমার দৃষ্টিতে নির্যাতিত ভারতীয় মুসলিমদের রক্ষার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা জরুরী ঃ

ক) পরিবেশ অনুকূল হোক বা প্রতিকুল সকল অবস্থায় মুসলিমদের নিরাপত্তার দু'টি উৎস রয়েছে। এর একটি হচ্ছে আল কুরআন এবং অন্যটি হচ্ছে রাসূল (সা) এর সুন্নাহ। তারা যদি এই দু'টি উৎস আকড়ে ধরে থাকতে পারেন তাহলে দুনিয়ার কোনও শক্তিই তাদের নির্মূল করতে পারে না। তাদের চরিত্র, আচার আচরণ, লেন দেন, বিশ্বাস যোগ্যতা এবং সামগ্রিকভাবে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যদি কুরআন সুন্নাহর শিক্ষার প্রতিফলন থাকে তা হলে সাময়িক ঝড় ঝাপটা তাদের কোনও ক্ষতিই করতে পারবেনা।

খ) এর পর আসে ঐক্যের প্রশ্নটি। মুসলিম অমুসলিম সকল দেশে মুসলিমদের মধ্যে


www.pathagar.com

এখন ঐক্যের অভাব সবচেয়ে বেশী। এই ঐক্য নিশ্চিত করতে হলে আলিম সমাজকে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে হবে। আলিম সমাজের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় মুসলিম সমাজ এখন ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় আছে এবং তারা আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর হামলার শিকার হচ্ছে।

গ) পাড়া, মহল্লা সর্বত্র যেমন মুসলিমদের ঐক্য প্রয়োজন তেমনি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও তাদের ঐক্যের একটি শক্তিশালী প্লাটফরম থাকা প্রয়োজন। ওআইসি এই ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে যেহেতু বর্তমানে ওআইসি সদস্যভুক্ত মুসলিম দেশ সমূহের বেশিরভাগ সরকার ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী এবং মুসলিম জাতিসত্ত্বা সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন সেহেতু এর অধীনে এমন একটি সেল থাকা প্রয়োজন যে সেলটি গঠিত হবে ইসলামী মুল্যবোধ ও জীবন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী আলিম উলামা এবং প্রতিনিধিদের নিয়ে যারা সংখ্যালঘু মুসলিমদের সমস্যাবলীকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে পৃথিবীর যে প্রান্তেই তাদের উপর হামলা হোক না কেন তার তথ্য উপাত্ত জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক ফোরামসমূহে উপস্থাপন করার এবং তাদের অনুকূলে জনমত গঠন করে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে।

ঘ) শক্তিশালী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া গঠন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহ বিশেষ করে ফেসবুক টুইটার প্রভৃতিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহারের প্রচলন। বর্তমান যুগ প্রযুক্তি ও মিডিয়ার যুগ। প্রচার অপপ্রচারের মাধ্যমে মুসলিম বিরোধী শক্তিগুলো সারা দুনিয়ায় মুসলিমদের সন্ত্রাসী জাতিতে পরিণত করেছে। নিজেরা অপরাধ করে মুসলিমদের উপর তার দোষ চাপাচ্ছে। আমরা এর জবাব দিতে পারছিনা। এর জন্য উপযুক্ত জনবল এবং গণমাধ্যম সৃষ্টি অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আহরণ ও ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই।

---

**লেখক-পরিচিতি :** মোঃ নূরুল আমিন- বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

**লেখা-পরিচিতি :** প্রবন্ধটি ২০ অকটোবর, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত হয়।

**তথ্যপুঞ্জি ঃ**

1. Aiyar, Mani Shankar, Pakistan Papers, New Delhi 1994
2. Akbar, MK Pakistan from Jinnah to sharif, New Delhi 1997
3. Barua, Sanjib, India Against Itself : Assam and the politics of Nationality, Philadelphia 1999
4. Balarajpuri, Religious Militancy in South Asia : Genesis & characteristics.


www.pathagar.com

5. Basu, Apurba Kumar, Assam in the Ahom Age, Calcutta 1970.
6. Chowdhury Nirod. C. Hinduism : A Religion to live By, New York, Oxford University Press, 1979
7. Chowdhury, Pratap chandra, Assam Bengal Relations, 1988
8. Dixit. J. N. Liberation and Beyond, Indo Bangladesh Relations 1999
9. Hazarika, Sanjoy, Rites of Passage : Border crossings, Imagined Homelands, India's East and Bangladesh, New Delhi 2000
10. Hazarika, Sanjoy, Strangers of the mist : Tales of war and Peace from India's East & Bangladesh, Viking, 1994
11. Kar M. Muslims in Assam Politics, Delhi, Qmsons Publications, 1990
12. Omio Kumar Das Institute of Social change & Development, Migration to Assam 2002
13. Sir Edward Gait, A History of Assam, 5th Edition, Guwahati, India Lawyers Book stall 1992
14. Jaideep Saika, Islamic Militancy is North East India, University of Illinois, 2003
15. Trimothy Samuel Shah Lecture for conference on "Religion in a Globalizing world" at Michigan, March 02, 2004
16. Marry T. Titus, Islam in India and Pakistan, Oxford university press.
17. Stephan Neil, Builders of the Christian Church.
18. a) US state department Report on Human Rights position in India (2000-2011)
    b) Asia Human Rights watch Report on India (2005-2011).
    c) Amnesty International Report on India (2010-2011)
    d) National Human Rights Commission on Minority Communities in India, New Delhi (2006-2011)



www.pathagar.com

# পরিশিষ্ট

## সেমিনার-প্রতিবেদন

ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া

# পরাশক্তি আমেরিকার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবক্ষয়

❖

বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, অতীতে ধর্মীয় নির্যাতনের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে যারা এসেছিল তারাই আমেরিকায় রাষ্ট্রগঠন করে। তাছাড়া গণতন্ত্র ও মানুষের সাম্য অধিকার এর উপর আমেরিকার constitution দাঁড়িয়ে। তাই তাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের আলোচনা এখান থেকেই আসতে হবে। কেননা যে কোন সভ্যতার ধ্বংস শুরু হয় তার নিজের ভেতর থেকেই। সুতরাং পরাশক্তি আমেরিকার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবক্ষয় দেখেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

গত ৩০ জুন, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে জনাব আবুল আসাদ উপরোক্ত মন্তব্য করেন।



www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে "পরাশক্তি আমেরিকার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবক্ষয়" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক ড. আহসান হাবীব ইমরোজ।

উপস্থাপিত প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন- ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ, ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া, ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, জনাব মোঃ নূরুল আমীন, জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, ড. মাহফুজ পারভেজ ও জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম।

উক্ত সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক ও মাসিক পৃথিবীর সম্পাদক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ।

**অধ্যাপক এ. কে. এম নাজির আহমদ বলেন:**

অনেক মানুষের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, সব সুখ আর কল্যাণ আমেরিকাতেই। কিন্তু তাদের এ ধারণা বাস্তবসম্মত নয়। তাই এই মানসিকতা পাল্টানোর জন্য সেখানকার বাস্তব অবস্থা প্রবন্ধটিতে আরো স্পষ্ট করে আসা দরকার।

**জনাব মোঃ নূরুল আমীন বলেন:**

প্রবন্ধের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবে তথ্যগুলো আরো update হলে ভাল হত। তাদের অবক্ষয়কে আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য তারা যেসব ক্ষেত্রে অনেকদূর এগিয়েছে তাও উল্লেখ হওয়া প্রয়োজন ছিল।

**ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন:**

পরাশক্তি আসলে কী? এটা কি কেবল জুজু? এ বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার। তবেই একে চ্যালেঞ্জ করার চিন্তা করা যাবে। American philosophy বুঝে সেই নিরিখেই তাদের অবস্থা পর্যালোচনা করতে হবে। প্রবন্ধটি নি:সন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। তবে এতে আমেরিকান সমাজে সভ্যতা ও প্রকৃতির বিপরীতে যা হচ্ছে তা সবই সুস্পষ্ট হওয়া উচিত।

**শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন:**

অবক্ষয়ের আরো কিছু দিক যেমন সমকামিতা সম্পর্কে আসা উচিৎ ছিল। প্রতিটি পয়েন্টেই কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিকোণ আসলে ভাল হত। আমেরিকান সমাজের যেসব ইতিবাচক দিক আছে তন্মধ্যে একটি হলো সেখানে সংখ্যালঘুদের শক্তিবৃদ্ধি।

**জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম বলেন:**

সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও সামাজিক অবক্ষয় দুটো বিষয়ই ব্যাপক আলোচনার দাবি রাখে।


www.pathagar.com

দুটো অবক্ষয়েরই সুস্পষ্ট পরিচয় ও গুরুত্ব তুলে ধরা দরকার। এবং এ দুটো অবক্ষয় কেন হচ্ছে তার কারণও বের করে আনতে হবে।

**ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ বলেন:**

আমেরিকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের সাথে তুলনামূলকভাবে আমাদের অবস্থাও বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। বাজারের বাইরে থেকে মনে হয় যে ভেতরে সবাই বোধ হয় ঝগড়া করছে। কিন্তু আসলে তো তা নয়। আমরা যত কথাই বলি তারা কিন্তু আজ গোটা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাদের এই নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকার পেছনে কোন না কোন Quality অবশ্যই নিহিত আছে। তাই যে কারো ব্যাপারে মন্তব্য লিখনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে আবেগ বর্জনের চেষ্টা করতে হবে।

**ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বলেন:**

আমেরিকা এখন একক পরাশক্তি নয়। Military power এর দিক দিয়েই কেবল তারা শক্তিধর। তাদের উত্থানও হয়েছে অনেক পরে। বর্তমান সময়ে অর্থনীতিতে তাদের কোন কর্তৃত্বই নেই।

**ড. মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ বলেন:**

প্রবন্ধের ভূমিকা ও উপসংহারের মাঝে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। যে কোন বিষয়ের ইতিবাচক আলোচনা দিয়ে শুরু করাই আল কুরআনের রীতি। তাই তাদের ভাল দিকগুলোসহ আসলে সুবিচার হতো। সব শ্রেণি ও পেশার লোকেরাই কেন সেখানে যেতে আগ্রহী? এটিও কিন্তু ভাবনার বিষয়।

**ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া বলেন:**

যুক্তরাষ্ট্র পরাশক্তি তো নয়ই, বরং পরনির্ভরশীল জাতি। পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়াই এদের রীতি। জাতিগত ভিত্তি তাদের নেই বললেই চলে। সেই সাথে নৈতিকতার চরম অবক্ষয় এবং যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা অচিরেই তাদের পতন ডেকে আনবে ইনশাআল্লাহ। তবে মুসলিমদের মাঝে ঐক্যের অভাব এবং সঠিক নেতৃত্ব না থাকায় যুক্তরাষ্ট্রের পতনের পর আবার কোন্ পরাশক্তি এসে তাদের ঘাড়ে সওয়ার হবে তাই ভাবনার বিষয়। কেননা যেই বিশ্ব নেতৃত্বে থাকার কথা ছিল মুসলিমদের, তারাই আজ নিজেদের অনৈক্য ও বিভেদের কারণে চরম বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার হচ্ছে। মহান আল্লাহর কাছে আমাদের প্রার্থনা তিনি যেন আমাদেরকে শিশা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার তৌফিক দেন। তবেই আমরা আবারও বিশ্ব নেতৃত্ব হাতে তুলে নিতে পারব।


www.pathagar.com

# বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় সন্ত্রাস

❖

বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, একটি রাষ্ট্র নিজে শক্তিশালী না হলে যা হবার মূলতঃ বাংলাদেশ সীমান্তে তাই হচ্ছে। কারণ যা পাকিস্তান আমলে ঘটেনি এবং এখনও যা পাকিস্তান বর্ডারে ঘটছে না, তাই প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ বর্ডারে ঘটছে। আসলে আমরা নিজেদেরকে ছোট করে ফেলেছি। React করতে পারিনি। প্রতিবেশী দেশের সাথে সম্পর্ক এবং ক্ষমতায় অসমতাই এক্ষেত্রে কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত বিভাজন না মেনে নেয়াই বিষয়টির মূল। বিভিন্ন সরকারের আমলে সীমান্ত চুক্তিগুলোর তুলনামূলক আলোচনা হওয়া দরকার। এটি ভারতের সীমান্ত নিয়ে রাজনীতি। ভারত ইচ্ছে করেই এ সমস্যা জিইয়ে রাখছে। এটিই ভারতের সীমান্ত রাজনীতি। বাংলাদেশ সরকারের মেরুদণ্ড শক্ত না হলে এ অবস্থা থাকবেই।

গত ২৮ জুলাই, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে জনাব আবুল আসাদ উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে "বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় সন্ত্রাস" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম।



www.pathagar.com

উপস্থাপিত প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন- ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ, ড. মাহফুজ পারভেজ, ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক, জনাব মোঃ নূরুল আমীন, জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ আতহার উদ্দীন ও জনাব ইমতিয়াজ উদ্দীন চৌধুরী প্রমুখ।

উক্ত সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক ও মাসিক পৃথিবীর সম্পাদক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ।

**অধ্যাপক এ. কে. এম নাজির আহমদ বলেন:**

তথ্যবহুল প্রবন্ধ ও সার্থক আলোচনা হয়েছে। সীমান্ত সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা কী হওয়া উচিত তা ফুটিয়ে তুলতে হবে। ১৯৭১ সালে সংঘটিত ঘটনার সঠিক তথ্য তুলে ধরতে হবে। আর এ বিষয়ে ভ্রান্ত তথ্যগুলোকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে।

**ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন:**

বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় সন্ত্রাস উপমহাদেশের একটি বড় সমস্যা। আঞ্চলিক ক্ষেত্রেও এই সমস্যার একটি রক্তাক্ত ঐতিহাসিক দিক রয়েছে। যার ফলে বাংলাদেশের মানুষ প্রতিনিয়ত সন্ত্রাস কবলিত হচ্ছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অব্যাহত আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ এর প্রধান হাতিয়াররূপে ভারত সীমান্ত সন্ত্রাসকে কাজে লাগাচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষদের কাঁটাতারে ঘিরে বন্দুকের নলের নিচে স্থাপন করেছে। এই অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ হওয়া দরকার সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে।

**ড. মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ বলেন:**

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদের যে সংখ্যা বলা হয়, তা সঠিক নয়। এক্ষেত্রে তথ্যভিত্তিক সঠিক চিত্র আসা উচিৎ। ভারত সন্ত্রাসসহ নানা ধরনের চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে যে লক্ষ্য অর্জন করতে চায় তা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন ছিল। তাতে দেশের মানুষ প্রকৃত বিষয় বুঝতে পারতো। মূলতঃ আদর্শিক কারণেই ভারত এটি করছে। বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় সন্ত্রাসের প্রতিকারের জন্য এদেশে শক্তিশালী সরকার গঠন এবং নিজেরা সকল ক্ষেত্রে সাবলম্বী হওয়ার চেষ্টায় প্রত্যয়ী হতে হবে।

**জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম বলেন:**

ভারতীয় সন্ত্রাস শুধু কিছু মানুষ মারা নয়। অর্থনৈতিক আগ্রাসন, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ইত্যাদিও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

**ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ বলেন:**

এ বিষয়ে আমাদের জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। তাদের সাথে আমাদের যে আদর্শিক পার্থক্য তাই আমাদের প্রতি তাদের এই বৈরী আচরণের অন্যতম কারণ।


www.pathagar.com

তাছাড়া আমাদের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণেও তারা এমনটি করার সাহস পাচ্ছে। বাংলাদেশ ছাড়া তাদের আরো যেসব প্রতিবেশী রাষ্ট্র রয়েছে তাদের সাথে কিন্তু তারা এরূপ আচরণ করছে না।

**জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন:**

ষোলো কোটি মানুষের 'মরণফাদ' ফারাক্কা-মিনি ফারাক্কার প্রতিক্রিয়ায় দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তীর্ণ সবুজ-শ্যামল অঞ্চল আধা-মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। বিশাল জলরাশি পদ্মার বুকে 'সোনার তরী'-র বদলে আজ শুষ্ক মওসুমে 'গরুর গাড়ি' চলে। সেচের অভাবে লাখ লাখ একর জমি অনাবাদী পড়ে থাকে। বন, মৎস্য, পশুসম্পদ ও পরিবেশ আজ ধ্বংসের মুখোমুখি। উজানে ভারত সরকারের তৈরি ফারাক্কা বাঁধের কারণে আটত্রিশ বছর ধরে পদ্মার পানি প্রবাহ ভয়াবহভাবে কমে যাওয়ায় বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় জিলাগুলো সমুদ্রের লোনাপানিতে সয়লাব হয়। লোনাপানির কারণে লাখ লাখ একর জমির ফসল বিনষ্ট হয়, মিঠাপানির মৎসসম্পদ ধ্বংস হয়। ফারাক্কার বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় সুন্দরবনের বনাঞ্চলের অনেক অংশ ইতোমধ্যে উজাড় হয়েছে। উত্তরাঞ্চলে নিয়মিত খরা এবং দক্ষিণের বনাঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য মারাত্মকভাবে বিনষ্ট হয়েছে। সীমান্তের ওপারে পদ্মার [গঙ্গার] ওপর ফারাক্কা এবং তার উজানে আরো শত শত ছোট-বড় বাঁধের কারণে বাংলাদেশের প্রায় পাঁচ কোটি মানুষের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন প্রায়।

সিলেট সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করা সাত অভিন্ন নদীতে বাঁধ, ড্যাম ও স্লুইস গেট নির্মাণ করে পানি আগ্রাসন চালাচ্ছে ভারত। ফলে ভারত থেকে আসা নদীগুলো বাংলাদেশে ঢুকে মরা খালে পরিণত হচ্ছে। সর্বশেষ সিলেটের জৈন্তাপুরের সারি নদীর উজানে মাইনথ্রু নদীতে ড্যাম নির্মাণ করে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সিলেট অঞ্চলের অভিন্ন নদীতে ভারত একের পর বাঁধ নির্মাণ করলেও এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেই বাংলাদেশের পানি উন্নয়ন বোর্ড-এর।

ভারতের পানি সন্ত্রাসের এই চিত্রও আলোচ্য প্রবন্ধে স্থান পেলে ভালই হতো।


www.pathagar.com

# ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষানীতি

❖

বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, যে কোন প্রবন্ধকারের অবশ্যই মৌলিক কিছু সংযোজন থাকা চাই। নতুন Contribution না থাকলে সার্থকতা নেই। শিক্ষা প্রয়োজন কেবল মানুষের। কারণ তার একটা জীবন পরিচালনা করতে হয়। তার জন্ম - মৃত্যু আছে। পরে জবাবদিহি আছে। বাঁচার জন্য সে সবকিছু ভোগ করছে। কিন্তু বেঁচে থেকে তার কাজ কী? সেটা জানাই শিক্ষা। আমার কাজ, আমার Destination, আমার জবাবদিহি ইত্যাদি জানার জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষা একটাই, মানবিক শিক্ষা। ইসলামী শিক্ষা বলে আলাদা কোন শিক্ষা নেই। সুতরাং শিক্ষার দুটো মূল বিষয়- মানুষ ও মানুষের জীবনোপকরণ।

গত ১১ অগাস্ট, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে জনাব আবুল আসাদ উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে "ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষানীতি" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট গবেষক জনাব ইমতিয়াজ উদ্দীন চৌধুরী।



www.pathagar.com

উপস্থাপিত প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন- ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, ড. মুহাম্মদ উমার আলী, ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ, ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া, ড. মুহাম্মাদ ছাইদুল হক, ড. মুহাম্মদ ছামিউল হক ফারুকী, ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, জনাব মোঃ নূরুল আমীন, জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ আতহার উদ্দীন, অধ্যাপক আখতার হামিদ খান ও জনাব আতাউর রহমান সরকার প্রমুখ।

উক্ত সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক ও মাসিক পৃথিবীর সম্পাদক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ।

**অধ্যাপক এ. কে. এম নাজির আহমদ বলেন:**

সকলের চিন্তার সমন্বয়ে একজনের চিন্তাকে শানিত করতে হবে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কাঙ্খিত শিক্ষানীতি বিষয়ে আরো অনেক গবেষণা প্রয়োজন। এ বিষয়ে শুধু একটি দুটি প্রবন্ধই যথেষ্ট নয়।

**ইঞ্জিঃ মুহাম্মদ আতহার উদ্দীন বলেনঃ**

ওহীই জ্ঞানের মূল উৎস বিধায় এ নিয়ে আলাদা আলোচনা আসলে ভাল হতো। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী এক নয়। শিক্ষার উৎস নিয়ে আলোচনা করার সময় ওহীকেই প্রথম উৎস হিসেবে দেখানো উচিত। আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা গুলো নিয়ে আরো ব্যাপক আলোচনা হতে হবে। সহ শিক্ষার প্রধান কুফল হলো, এটি পর্দার সুস্পষ্ট লংঘন। সেই সাথে তা নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে উচ্ছৃঙ্খল সামাজিক পরিস্থিতিরও জন্ম দেয়।

**ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক বলেনঃ**

শিক্ষানীতিতে সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরাট প্রভাব রয়েছে। শিক্ষানীতির পরিচয় ও শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য তুলে ধরার মাধ্যমেই এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য অর্জিত হবে।

**জনাব মোঃ নূরুল আমীন বলেনঃ**

শিক্ষা মনুষ্যত্বে উত্তরণের বাহন। শুধু জ্ঞান আহরণই শিক্ষার্থীদের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। মূল্যবোধের অবক্ষয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হতে পারে না। আদর্শ ও জীবনবোধই শিক্ষার মূলনীতি হওয়া উচিত।

**ড. মুহাম্মদ সাইদুল হক বলেনঃ**

অবৈতনিক শিক্ষা শুধু ছাত্রীদের নয় ছাত্রদের বেলায়ও খেয়াল রাখা উচিত। কেননা বিদ্যার্জন করা ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের জন্যই ফরয। হাদীসে ঐ নৈতিক শিক্ষার কথাই


www.pathagar.com

ফরয বলে ঘোষণা করা হয়েছে যা ইহকাল ও পরকাল উভয় কালেই মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ বিদ্যা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন যা কোন উপকার দেয় না।

**ড. ছামিউল হক ফারুকী বলেন:**

মানুষের পরিচয়ের আলোকে তাদের শিক্ষানীতি হতে হবে। আলোচ্য প্রবন্ধে তাই প্রচলিত শিক্ষার কুফল তুলে ধরার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষার সোনালী ইতিহাসও বিবৃত করতে হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। প্রকৃত শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই একজন সুশিক্ষিত শিক্ষকই পারেন শিক্ষার্থীকে সুশিক্ষা দিতে।

**জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন:**

মানব জাতির জন্য কল্যাণকর সব শিক্ষাই ইসলামী শিক্ষা। কাজেই যে শিক্ষায় কল্যাণের সমাবেশ ঘটে সেটিই ইসলামের দৃষ্টিতে কাংখিত শিক্ষানীতি।

**ড. এম. উমার আলী বলেন:**

কাঙ্খিত শিক্ষানীতির উপর প্রবন্ধ লিখা বর্তমান প্রেক্ষিতে প্রকৃত পক্ষে একটি দুরুহ ও জটিল কাজ। বর্তমান পরিস্থিতিতে একমুখী শিক্ষানীতির রূপরেখার কথা চিন্তা করাই যায় না। আমাদের দেশে বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা বিরাজমান। কওমী মাদরাসা, আলিয়া মাদরাসা এবং প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও ইংলিশ মিডিয়াম এবং ন্যাশনাল কারিকুলামের ইংলিশ ভার্শনসহ বহু প্রকার নীতি অবলম্বন করা হয়। এই সবগুলোকে সমন্বয় করে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করা সহজসাধ্য নয়। তবে ইসলামী শিক্ষা বিশেষ কোন ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষা নয়। বরং কল্যাণ ও অকল্যাণ যে শিক্ষার মাধ্যমে পার্থক্য করা যায় তাই ইসলামী শিক্ষা। আর এই ইসলামী শিক্ষা বিশেষ কোন দেশ থেকেও আমদানী করার নয়, বরং জনগণের চিন্তা-চেতনা ও মন মানসিকতার সাথে তাল মিলিয়ে এই কাংখিত শিক্ষানীতি রচিত হতে হবে।

যা আমরা জানি এবং যা জানিনা এই দুই এর সমন্বয়ের নাম যদি জ্ঞান হয় তা হলে তিনটি উপাদান ছাড়া এই জ্ঞান কখনো পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। এর একটি হচ্ছে Social science যা মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক শেখায়, দ্বিতীয়টি হচ্ছে Biological এবং Environmental science যা মানুষের সাথে সৃষ্টি ও জড়ের সম্পর্ক নির্ণয় করে। তৃতীয় উপাদানটি হচ্ছে Spiritual science এটি হচ্ছে এমন এক অভিজ্ঞান যা মানুষ ও সৃষ্টির সংগে স্রষ্টার সম্পর্ক ও দায়দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করে। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এই উপাদান গুলোকে গুরুত্ব দেয়া হয় না। ইংরেজরা আমাদের দেশের শিক্ষাকে দু'ভাগে ভাগ করেছিল। একভাগ কেরানী সৃষ্টির


www.pathagar.com

জন্য, আরেকভাগ জন্ম মৃত্যু, বিয়ে সাদী দেখার জন্য। তাদের দেশের শিক্ষাকে তারা কিন্তু এভাবে বিভক্ত করে ফেলেনি। আদর্শ ও জীবনবোধ শিক্ষা মূলনীতি হওয়া বাঞ্ছনীয়। তা না হলে শিক্ষানীতি জাতির কোন কাজে আসবে না।

বাংলাদেশের শিক্ষানীতিতে জ্ঞান বিজ্ঞানের অনেক দোহাই দেয়া হয়েছে এবং কৌশলে ধর্মীয় শিক্ষা তথা আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানকে বাদ দেয়া হয়েছে। যে দেশের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ ইসলামের অনুসারী, ৯ ভাগ হিন্দু-বৌদ্ধ, খৃস্টান এবং মাত্র এক ভাগ নাস্তিক ও প্রকৃতি পূজারী, সে দেশের শিক্ষানীতিতে ধর্মবিদ্বেষ অমার্জনীয় অপরাধ। যে উন্নয়ন ও প্রযুক্তির দোহাই দিয়ে ধর্মীয় শিক্ষাকে শিক্ষা নীতি থেকে নির্বাসন দেয়া হচ্ছে সে উন্নয়ন ও প্রযুক্তি ধর্মীয় মূল্যাবোধ ছাড়া অর্থহীন।

**ড. মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ বলেন:**

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আলীয়া নিসাবের শিক্ষানীতিই ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার কাছাকাছি। আর তাই এই শিক্ষানীতিকে সামনে রেখেই পরিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষানীতি রচিত হতে হবে।

**ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ বলেন:**

স্রষ্টার পরিচয়, সৃষ্টির উদ্দেশ্য ইত্যাদি জানা শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তাই যে শিক্ষার মাধ্যমে স্রষ্টার পরিচয় ও সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যাবে সেটিই হবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কাংখিত শিক্ষানীতি।


www.pathagar.com

# বাংলাদেশে সংবাদপত্র ও সাংবাদিক দলন

❖

বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ এসেছে। এগুলোকে সমন্বয় করার চেষ্টা করতে হবে। লেখার সঙ্গে পেশার কোন সম্পর্ক নেই। যে কোন পেশার লোকই লিখতে পারেন। তবে আলোচ্য প্রবন্ধে Code of Ethics আলোচনা হলে দলনগুলোর কোন্‌টি সঠিক আর কোন্‌টি সঠিক নয় তা পরিষ্কার হতো। বাংলা ভাষার সংবাদপত্র দলনের কথা বলা হলে আমাদেরকে অনেক পিছনে যেতে হবে। আর বাংলাদেশের সংবাদপত্র হলেও আরেকটু পিছনে যাওয়া উচিত। সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য কী ছিল এবং কী আছে তা পরিষ্কার হতে হবে। পূর্বে সংবাদপত্রগুলো ছিল জনগণের সেবার জন্য। আর এখন তা সবই হয়ে গেছে commercial . লাভ নির্ভর পণ্য হলে আর জনগণের কাজে আসে না। কেবল পত্রিকার কাটতি বাড়াবার উদ্দেশ্যে হলুদ সাংবাদিকতার আশ্রয় নিলে জনগণের বিশাল ক্ষতি হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সংবাদপত্রসেবীদের লক্ষ্যভ্রষ্টতাই মূল বিষয়। আর এসব কারণে সংবাদপত্রসেবীদের উপর নির্যাতনের সুযোগও বেড়ে গেছে।

গত ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে জনাব আবুল আসাদ উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত উক্ত সেমিনারে "বাংলাদেশে সংবাদপত্র ও সাংবাদিক দলন" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট লেখক, কলামিস্ট ও ব্যাংকার ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম।



www.pathagar.com

উপস্থাপিত প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন ড. এম. উমার আলী, ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, ড. মাহফুজ পারভেজ, ড. মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ, জনাব মোঃ নূরুল আমীন, জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক, ড. আহসান হাবীব ইমরোজ, ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ আতহার উদ্দীন, অধ্যাপক আখতার হামিদ খান, জনাব আতাউর রহমান সরকার ও জনাব ইমতিয়াজ উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ।

উক্ত সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক ও মাসিক পৃথিবীর সম্পাদক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ।

**অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ বলেনঃ**

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে বিষয়টিকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। সমসাময়িক এ বিষয়টিতে প্রবন্ধ রচনা ও আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা শেষ করেন।

**ড. মুহাম্মদ উমার আলী বলেনঃ**

জাতিগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো সংবাদপত্রের। আর সংবাদ শিল্পের অন্যতম শিল্পী হলেন সাংবাদিকগণ। তাই জাতীয় জীবনে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবে নীতি নৈতিকতার দিক বিবেচনায় সাংবাদিকদের একটি বিরাট অংশও বাংলাদেশে সংবাদপত্র ও সাংবাদিক দলনের ক্ষেত্রে দায়ী। তাই এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা না থাকলে প্রবন্ধটি একপেশে বলে বিবেচিত হবে।

**ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ বলেনঃ**

সকল সরকারের আমলেই সাংবাদিক দলনের ইতিহাস আসা দরকার ছিল। তা না হলে এটি বিশেষ কোন দলের কিংবা বিশেষ কোন সময়ের ইতিহাস হিসেবেই গণ্য হবে। রাসূলের সময়ে কবিদের মাধ্যমে এই কাজটিই হতো। তখনও হলুদ কাব্য রচনা ছিল।। ইসলাম এক্ষেত্রে সকলেরই লাগাম টেনে ধরেছে। প্রবন্ধে এ দিকটি অবশ্যই আসা উচিত।

**ইঞ্জিঃ মুহাম্মদ আতহার উদ্দীন বলেনঃ**

বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলের উল্লেখ্য করে তারপর বাংলাদেশ চ্যাপ্টারে আসলে ভাল হত। আরো যারা দলনের শিকার হয়েছেন তাদের কথাও পুরোপুরি আসেনি। বিশেষ করে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের আমলের কালো আইনে সংবাদপত্র ও সাংবাদিক দলনের কথা আরো স্পষ্টভাবে আসতে পারতো।


www.pathagar.com

**জনাব মোঃ নূরুল আমীন বলেন:**

৩৬ পৃষ্ঠার এ প্রবন্ধ অনেক তথ্য সমৃদ্ধ। তবে দৈনিক ইত্তেহাদ সহ আরো কিছু পত্রিকার কথা এখানে বাদ পড়েছে। দৈনিক আওয়াজ, পূর্বদেশ, পয়গাম, সংগ্রাম, জাহানে নও, ইং মর্নিং নিউজ, ইয়ং পাকিস্তান ইত্যাদির কথা আসেনি। সাংবাদিকরাও কিন্তু সবাই ফেরেশতা নন। তাই সাংবাদিকতার Ethics নিয়ে কথা থাকা দরকার ছিল। প্রবন্ধটি BIC কর্তৃক হওয়ার কারণে ইসলামের দৃষ্টিকোণে তা আলোচনা হওয়া দরকার ছিল। সাংবাদিকদের জন্য বেশ কিছু মূলনীতি বিবৃত হয়েছে। তবে হলুদ সাংবাদিকতা নিয়ে কথা আসা খুবই দরকার ছিল।

**ড. মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ বলেন:**

BIC-র যে আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তা লালন করেই আমাদেরকে আলোচ্য প্রবন্ধকে বিবেচনায় আনতে হবে। 'সাহীফাহ' যা নবী রাসূলদের উপর নাযিল হয়েছে আধুনিক আরবীতে তাই সংবাদপত্র। আর 'সাহাফী' হলো সাংবাদিক। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে বিষয়টির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আর পবিত্র কুরআনে 'আয-যান' (ধারণা/কল্পনাপ্রসূত মন্তব্য করা) সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছে মূলত তাই হলুদ সাংবাদিকতা। সত্যবাদিতা ও সততা সাংবাদিকতার মূল লক্ষ্য। সূরা আন্ নিসার ৮৩ নং আয়াতে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। হাদীসেও তাই কোন কথা শুনলেই তা (যাচাই বাছাই ছাড়া) বলে বেড়ানোকে মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

**ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন:**

প্রবন্ধটি পুন:লিখন হয়ে আসার পর বিজ্ঞ সাংবাদিক গ্রুপ দিয়ে আবারো দেখাতে হবে। প্রবন্ধটিতে বাংলাদেশে সংবাদপত্র ও সাংবাদিক দলনের যে পরিসংখ্যান এসেছে তার ব্যাপকতা আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ হওয়া প্রয়োজন এবং এক্ষেত্রে যে সকল কারণ রয়েছে তাও বিশ্লেষণ করতে হবে।

**শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন:**

প্রবন্ধটিতে প্রথমে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া এক্ষেত্রে হলুদ সাংবাদিকতার বিষয়টিও প্রাসঙ্গিক। তাই হলুদ সাংবাদিকতার পরিচয়, ইতিহাস এবং পরিণতিও তুলে ধরতে হবে।

**জনাব আতাউর রহমান সরকার বলেন:**

রাজনৈতিক উত্থান পতনে সংবাদপত্রের ভূমিকা অপরিসীম। এ প্রবন্ধে অপ-সংবাদিকতার বিষয়টি আরো স্পষ্ট করলে ভালো হত। আর রাজনৈতিক উত্থান পতনে সংবাদপত্রের ভূমিকা আলাদা শিরোনামে আলোচনা করা দরকার ছিল।


www.pathagar.com

# বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ঃ জন্ম, বিকাশ ও পরিণতি

❖

বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, প্রবন্ধটি কোটেশননির্ভর নয়, দৃষ্টান্তনির্ভর। এটি প্রবন্ধের খুবই ভাল দিক। পড়ার গতি ক্ষুণ্ন হলেও এ পদ্ধতিটি যথেষ্ট ফলপ্রসু। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কোন স্বতন্ত্র মতবাদ নয়। পাশ্চাত্যের উদারনৈতিকতাবাদের একটি অংশ তথা এর ধর্মীয় দিকটা হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। পাশ্চাত্য জীবন দর্শনের আলোকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি শ্লোগান হলো এটি। তারা নিজেরা সেক্যুলার নয়। তবে তারা অন্যদেরকে বোকা সাজিয়ে সেক্যুলার বানাতে চায়। বাংলাদেশ সেক্যুলার রাষ্ট্রব্যবস্থায় মাত্র আট বছর কাটিয়েছে। আর ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রব্যবস্থায় কাটিয়েছে বাকী পুরো সময়টা।

গত ৬ অকটোবর, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে জনাব আবুল আসাদ উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে "বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ঃ জন্ম, বিকাশ ও পরিণতি" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট লেখক ও কলামিস্ট জনাব শেখ মোহাম্মাদ শোয়েব নাজির।



www.pathagar.com

উপস্থাপিত প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন- ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ, ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া, ড. মাহফুজ পারভেজ, ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, জনাব মোঃ নূরুল আমীন, জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক, ড. আহসান হাবীব ইমরোজ, ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ আতহার উদ্দীন, জনাব ইমতিয়াজ উদ্দীন চৌধুরী এবং অধ্যাপক আখতার হামিদ খান প্রমুখ।

উক্ত সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক ও মাসিক পৃথিবীর সম্পাদক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ।

**অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ বলেনঃ**

ইসলাম ও জাহিলিয়্যাতের দ্বন্দ্ব যুগে যুগে চলে এসেছে এবং এখনো চলছে। এর দুটো ফর্ম- ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজবাদ। ১৯৭২ সালে এই মতবাদ প্রথম রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নিয়ে এ দেশে চালু হয়। ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর 'আল্লাহু আকবার'- এর ধ্বনির মর্মকথা রিয়ালাইজ করার কারণেই পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের স্থলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস সংবিধানে প্রতিস্থাপন করতে পেরেছিলেন। সাংস্কৃতিক অঙ্গন এখন পুরোটাই ধর্মনিরপেক্ষতার দখলে। এ বিষয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে আরো বেশি বেশি লেখার মাধ্যমে যুব সমাজকে সচেতন করে তোলা প্রয়োজন।

**ড. মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ বলেনঃ**

যে কোন প্রবন্ধের মাধ্যমেই পাঠকের প্রাপ্তির দিকে বেশি নজর দেয়া প্রয়োজন। নামটি আধুনিক হলেও এর গোড়া অনেক পেছনে। রাসূলকে তাঁর মিশন থেকে ফিরিয়ে রাখার যেসব প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়েছিল তার একটি ছিল- কাফিরদের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাবনা যে, আমরা কিছুদিন আপনার রবের উপাসনা করবো, আর আপনি কিছুদিন আমাদের রবদের উপাসনা করবেন। আর এরই প্রেক্ষিতে আল কুরআনের সূরা আল কাফিরূন নাযিল করে জানিয়ে দেয়া হলো যে, কিছুদিন এক রব আবার কিছুদিন আরেক রব- এর উপাসনা গ্রহণযোগ্য নয়। জীবনের একাংশ একভাবে, আর বাকি অংশ আরেকভাবে চালানো যাবে না। আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে অত্যন্ত স্পষ্ট করে এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আর এ কারণেই ঈমান আনয়নের পর দীন থেকে রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থাকে আলাদা করার কোন সুযোগ নেই। যারা এমনটি করে তারা যে মু'মিন নয় সেকথা সূরা আন নিসার ৬০ নাম্বার আয়াতে অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে সব ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করছে


www.pathagar.com

তা এই প্রবন্ধে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেনি। এতে প্রবন্ধটি তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হবে। আমরা দেখতে পাই যে, খানকাহ-মাজার এর পৃষ্ঠপোষকতা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরাই করে থাকে। সেগুলো ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন কেন পায় পাঠকের মনে আজ এ প্রশ্ন তুলে ধরা প্রয়োজন। একইভাবে দীনকে যারা খণ্ডিতভাবে প্রচার করে তাদের ব্যাপারেও প্রশ্ন থাকা উতিত। তাছাড়া ইসলামী আকীদার সাথে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের বৈপরীত্য কোথায় তাও তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রবন্ধের দাবি হলো, কুরআন, হাদীস ও মুসলিম স্কলারদের বক্তব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করা এবং সবশেষে দেশের মানুষকে সঠিক মতবাদের দিকে নির্দেশনা দেয়া যার মাধ্যমে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ অর্জন হবে।

**ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বলেন:**

ধর্মনিরপেক্ষতার ইতিহাস অনেক পুরাতন। ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ যে একটি কুফরী মতবাদ তা ইসলামী আকীদাহর দৃষ্টিতে তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরী।

**ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন:**

ধর্মনিরপেক্ষতা আদর্শ হিসাবে পৃথিবীতে বিশেষ কোনো কল্যাণ বা সুফল আনতে পারেনি। তথাপি পশ্চিমের অন্ধ অনুসারী একদল লোক বিশ্বের দেশে দেশে বিশেষ করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা চাপিয়ে দেওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই গ্রুপটিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করছে পশ্চিমা খ্রিস্টবাদী, ইহুদীবাদী এবং হিন্দুত্ববাদী শক্তি। অতএব ধর্মনিরপেক্ষতাকে ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য প্রবল ক্ষতিকর একটি আপদ হিসাবে প্রতিয়মান হচ্ছে। ইসলামের আদর্শ, বিশ্বাস সংস্কৃতি ও মূল্যাবোধকে রক্ষা করতে হলে ধর্মনিরপেক্ষতাকে অবশ্যই একটি বাতিল মতবাদ হিসাবে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

**ড. আহসান হাবীব ইমরোজ বলেন:**

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পরিণতিতে আজ পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতার পরিণতি অত্যন্ত নাজুক। পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নতদের মাঝে আজ আত্মহত্যার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। তাই এর ভয়ঙ্কর পরিণতির বিষয়টি বিশ্লেষণ করে নব প্রজন্মের সামনে মহান ইসলামী আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা দরকার।

**ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া বলেন:**

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক মতবাদ। একজন প্রকৃত মুসলিম কখনো ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ হতে পারে না। এটি একটি মারাত্মক অপপ্রচার। এই অপপ্রচার আজ গোটা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এর কুপ্রভাব অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।


www.pathagar.com

একথা আমাদেরকে বুঝতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা আল কুরআনের 'লাকুম দীনুকুম ওয়া লিয়া দীন' আয়াত দিয়ে দলীল উপস্থাপন করে থাকেন। কিন্তু তারা এর মাধ্যমে দীনকে অস্বীকার করে বসেন। অথচ মহান আল্লাহ একথার মাধ্যমে দীনের অনুসরণকে আরো বাধ্যতামূলক করেছেন। এ আয়াতে দীনকে বর্জন করার অনুমতি দেয়া হয়নি, বরং দীনকে আবশ্যিকরূপে গ্রহণ করারই জোর তাকিদ দেয়া হয়েছে।

**ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক বলেন:**

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আদর্শিক বিকাশের আলোচনা আসা দরকার ছিল। অন্যান্য আদর্শিক বিকাশের সাথে এর সম্পর্কেও আলোকপাত হওয়া দরকার ছিল। তাছাড়া ইসলাম যে ফিতরাতের ধর্ম তা প্রমাণিত করলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যে একটি আরোপিত মতবাদ তা প্রমাণিত হত।

**জনাব মোঃ নূরুল আমীন বলেন:**

দুটো কারণে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ গ্রহণের সুযোগ নেই।

* আল কুরআনে ইসলামকে একমাত্র দীন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
* বিচ্যুত ধর্ম বিশ্বাসের কারণে ইউরোপে যে সামাজিক সংকট বিরাজ করছে ইসলামে তার কোন অস্তিত্বই নেই।

বাংলাদেশে আশির দশকে প্রথম 'আলিমগণের একটি অংশ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

**ইঞ্জিঃ মুহাম্মদ আতহার উদ্দীন বলেন:**

ইসলামের সাথে ধর্ম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূল দ্বন্দ্ব কোথায় তা পরিষ্কার করতে হবে। একথা অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথেই বলা যায় যে, সেক্যুলারিজমপন্থীরা দু'রকম ঃ

এক. সচেতন শ্রেণি- যারা চিন্তা- চেতনায়ই সেক্যুলার। অর্থাৎ যারা জেনে-শুনেই এ পথে আছে। তাদেরকে শোধরাবার সুযোগ কম।

দুই. অজ্ঞ শ্রেণি- যারা ইসলাম না জানার কারণেই এ পথ ধরেছে। তাদেরকে ইসলামের সঠিক ধারণা দিতে পারলে হয়ত তারা সত্য পথ গ্রহণ করতেও পারেন।

**ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ বলেন:**

বাংলাদেশে সেক্যুলারিজমের ইতিকথা আরো সুস্পষ্টভাবে আসলে ভাল হত। আকবরের দীনে ইলাহী তো সবচেয়ে বড় সেক্যুলারিজম। কাজেই লুকিয়ে থাকা সেক্যুলারপন্থি অন্যান্যদের কথাও পরিষ্কার হয়ে যাওয়া প্রয়োজন।


www.pathagar.com

# ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঃ একটি বিশ্লেষণ

❖

বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, যখন কোন জাতি পরাধীন হয় তখন তার মধ্যে বিতর্ক ও দ্বন্দ্ব বেশি হয়। আর বিপর্যয়/পরাজয় হলেই ভুল ভ্রান্তি বিশ্লেষণ করা হয়। ৩য় পানিপথের পর জয়ী হলেও কারোই উঠে দাড়ানোর শক্তি ছিল না। তাই উঠলো ইংরেজরা। তখন শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্ দিল্লীতে ফিরে গিয়ে আবার পড়াতে শুরু করলেন এবং মুসলিমদেরকে আবার মুসলিম বানাবার উদ্যোগ নিলেন। তাওহীদে ফিরে এসে সেখান থেকেই যাত্রা শুরু করতে হবে। মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহ্হাবও এভাবেই শুরু করেছেন। হিন্দু পরিবেষ্টিত এলাকায় এমনটি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ইসলামী আন্দোলন ও মুসলিম পুনর্জাগরণের চেষ্টা ও প্রয়োজনীয়তা এখানেই।

আমরা ধর্মনিরপেক্ষ হলে আমাদের সব ছাড়তে হয় কিন্তু তাদের তা করতে হয় না। কারণ তাদের তো ধর্ম কর্ম বলতে কিছু নেই। আর তাই তারা চায় সবাইকে তাদের মত ধর্মনিরপেক্ষ বানাতে। এক লেখক লিখেছেন যে, ৫৪টি দাঙ্গাই মুসলিমদের দ্বারাই শুরু হয়েছে। তার মতে, ভারতের মত কোন দেশ নেই, হিন্দুর মত কোন ধর্ম নেই এবং তাদের মত কোন জাতি নেই। ভারতে তারা ছাড়া আর কারো থাকার অধিকার নেই। কাজেই তাদের কাছ থেকে এর চেয়ে ভাল কিছু আশা করা যায় না। মুসলিম শাসকরা কেবল শাসনই করেছে তাদের কোন মিশন ছিল না। তাই তারা হিন্দুদেরকে ব্যবহার করেই শাসন করেছে। ইসলামের বিস্তার ও শক্তি স্বয়ংক্রিয়। তাই ভারতেও দিন দিন মুসলিম বাড়ছে। এটাকে ভারতের শাসকরা খুব Alarming বলে মনে করে বলেই আজ ভারতে মুসলিমদের উপর এ অবস্থা।



www.pathagar.com

গত ২০ অকটোবর, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে জনাব আবুল আসাদ উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে "ভারতে সাম্প্রদায়িক দাংগা ঃ একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট জনাব মোঃ নূরুল আমীন।

উপস্থাপিত প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন- ড. মুহাম্মদ উমার আলী, ড. ফাহমিদ-উর-রহমান, ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ, ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক, ড. মাহফুজ পারভেজ, ড. আহসান হাবীব ইমরোজ, ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক আখতার হামিদ খান ও ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ আতহার উদ্দীন প্রমুখ।

**ড. মাহফুজ পারভেজ বলেনঃ**

ভারতের জন্ম হয়েছে সম্পদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও রক্তপাতের মাধ্যমে। সাতচল্লিশের ভাগাভাগির সময় প্রায় এক কোটি মানুষ গৃহহীন হন এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সূচনার মতো আজ পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। যে কারণে গুজরাত, কাশ্মির ও আসামে উপর্যুপরি মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা হচ্ছে এবং একদার মুসলিম ঐতিহ্যের গর্ব ভারতের আকাশ-বাতাস আজ মুসলিমদের হাহাকারে ভারী হয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য ক্ষতির কারণ হচ্ছে। এই ধরনের মানবাধিকারবিরোধী আচরণের জন্য ভারত আজ সকলের নিন্দার পাত্র। ভারতের তথাকথিত গণতন্ত্রের নামে যা চলছে তাকে বিশ্লেষণ করে উপমহাদেশের শান্তির ভবিষ্যত রচনা করতে হবে।

**ড. আহসান হাবীব ইমরোজ বলেনঃ**

ভারত জন্মগতভাবেই সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র। মুসলিমদের সুদীর্ঘ কালের রাজত্বই তাদের প্রতি ভারতীয়দের এই প্রতিহিংসার কারণ।

**ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হকঃ**

*এটি কোন একাডেমিক প্রবন্ধ নয়, বিবরণমূলক প্রবন্ধ। তাই এতে একাডেমিক প্রবন্ধের ন্যায় রেফারেন্স উল্লেখ না করলেও দোষের কিছু নেই।

* ভারতের আসামে মুসলিমদেরকে বহিরাগত হিসেবেই ধরা হয়। তাদের সাথে তারা ঐভাবেই আচরণ করে থাকে। এমনকি শত শত বছরের যারা পুরনো অধিবাসী তাদেরও। এটিই সমস্যা।

**ইঞ্জিঃ মুহাম্মদ আতহার উদ্দীন বলেনঃ**

* প্রবন্ধটির নাম সংখ্যালঘু নির্যাতন হলে আরো প্রাসঙ্গিক এবং বাস্তবসম্মত হত।


www.pathagar.com

* আলোচনা আসাম কেন্দ্রিক না হয়ে অন্যান্য এলাকার ব্যাপারেও Data আসলে ভাল হত।

**ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বলেন:**

- দাঙ্গার পরিচয় থাকলে ভাল হত। ভারতের কোন কোন বড় লেখক দাঙ্গাকে সুস্পষ্টভাবে সঙ্গায়িত করেছেন। সেখান থেকে সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।
- আসামের কথা বলতে গিয়ে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের আলোচনা আসা দরকার ছিল।
- আসামে ১৯৫০, ৫৫, ৬০, ৮১, ৮৩, ৯৩, ৯৪, ৯৬ এবং ২০০৮ -এ আরো যেসব ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছিল তার বর্ণনা আসা দরকার ছিল।
- সেখানকার পত্রিকার আরো কোটেশন ও তথ্য নিয়ে আসলে ভাল হত।

**ড. ফাহমিদ উর রহমান বলেন:**

ভারতে সংখ্যালঘু নির্যাতন একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য কথা। এর প্রকৃত তথ্য বা পরিসংখ্যান কোথাও আসে না। এমনকি মুসলিম সম্পর্কিত কোন কিছুই সেখানকার আলোচনায় আসে না। সেখানে মুসলিমরা সংখ্যায় প্রায় চল্লিশ ভাগ। আর দাঙ্গাটা মূলত: এ কারণেই। তাদেরকে পর্যায়ক্রমে উৎখাত করাই বিজেপী সরকারের মূল লক্ষ্য।

**ড. মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ বলেন:**

প্রবন্ধটিতে দাঙ্গার একটি চিত্র থাকা ভাল ছিল। দাঙ্গার কারণগুলোর প্রতি নযর দেয়ার চেয়ে প্রবন্ধকার তার পেছনে ভারতের মনস্তাত্বিক কারণগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তদুপরি আমি মনে করি 'দাঙ্গা' একটি বিরাট রক্তক্ষয়ী বিষয়। তাই সে কারণগুলো আসা দরকার ছিল। বিশেষ করে তা আদর্শিক ছিল কিনা তা পরিষ্কার করা প্রয়োজন ছিল। বাবরী মসজিদকে নাকি মুসলিমগণ আগে থেকেই ছেড়ে দিয়েছিল। গরু/ছাগল নাকি সেখানে চরানো হতো। প্রকৃতপক্ষে এটিই মুসলিমদের অধপতনের মূল কারণ। তারা তাদের নিজেদের কারণে নানাবিধ অপমানজনক অবস্থার মুখোমুখি হবে সেকথা আল্লাহর রাসূল অনেক আগেই বলে গেছেন। যেমন মুসলিমদের অন্যান্য মতবাদ ও কৃষ্টি কালচারের অনুসরণ। অথচ নিজেদের যে ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টি কালচার রয়েছে, তাতে তারা সন্তুষ্ট হতে পারে না। এ কারণেই মহান আল্লাহ শত্রুদের মন থেকে মুসলিমদের ব্যাপারে ভয় তুলে নিয়েছেন। দুনিয়াপূজারী হলে এরূপ অপমানজনক অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে বৈকি? তাই মুসলিম জাতিকে আজ তাদের নিজেদের আদর্শকেই আঁকড়ে ধরতে হবে।

**অধ্যাপক আখতার হামিদ খান বলেন:**

বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিনিয়তই যে দেশটির দ্বারা হুমকির সমুখীন থাকে,


www.pathagar.com

বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি, ধর্ম যে দেশটির দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয় এবং বাংলাদেশে সব ধরনের বিশৃখলা যে দেশটির মদদে সংঘটিত হয়, সেটি হলো ভারত। তাই ভারতের আসল চরিত্র প্রকাশকারী এ ধরনের একটি লেখা জাতিকে অনেকটা উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমার বিশ্বাস। আজকে শুধু ভারতেই নয়, বাংলাদেশের সাথে যেসকল দেশের ভালো সম্পর্ক অতীতে ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে সে দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক নষ্ট করার জন্যে ভারত বাংলাদেশে দাঙ্গা সৃষ্টির উস্কানি দিচ্ছে। অতি সম্প্রতি রামুর ঘটনাটি তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। সীমান্তে অহেতুক বেসামরিক লোক মেরে দু'দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা বললেন, এটা চোরাকারবারের জন্যে হয়েছে।

সারা বিশ্বে আজ ইসলামকে একটি জঙ্গীধর্ম দাঙ্গাবাজ ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য ভারতীয় র' এবং আমেরিকান সি. আই. এ. উঠে পড়ে লেগেছে। যার উদাহরণ অতিসম্প্রতি পাকিস্তানে ঘটে যাওয়া মালালা ইউসুফ জাই এবং যুক্তরাষ্ট্রে বোমা মারার পরিকল্পনা ঘটনায় নাফিস নামের জনৈক যুবককে গ্রেফতার। আর নাফিস নামের ঐ মুসলিম বাংলাদেশী যুবককে গ্রেফতারের মাধ্যমে বাংলাদেশী তথা মুসলিমদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের উপর কড়াকড়ি আরোপের একটা নীলনকশা ছাড়া আর কিছু নয়। আমি মনে করি এ দুটো ঘটনার পেছনেও ভারতের পরোক্ষ মদদ রয়েছে।

**ড. এম. উমার আলী বলেন:**

ভারতীয় মুসলিমদের রক্ষার জন্য আমার suggestion হলো- সেখানকার আলিম সমাজের মাধ্যমে মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ ঐক্য সুদৃঢ় করা। আলিম সমাজের ঐক্য না থাকা-উম্মাহর ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উপনিত হবার অন্যতম বড় কারণ হিসেবে এ প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে। কিন্তু আলিমদের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠার কোন পথ সেখানে দেখানো হয়নি। উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলিম সমাজের পারস্পরিক দুরত্ব কমানো এবং কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধের উপায় খোঁজা এখন জরুরী। কনজারভেটিভ, তথা কথিত আলিমদের একটি গ্রুপ রাজপুরোহিতের মর্যাদার ও ক্ষমতার লোভে ক্ষমতাশীন ইসলাম বিরোধী শক্তির গোলামীতে নিমজ্জিত রয়েছে। অন্য একটি গোঁড়ামীতে আটকে গিয়ে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সামাজিকতা থেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্তভাবে তারা জীবনপাত করছে। সামাজিক এহেন পরিস্থিতিতে আলিমরা মুজতাহিদ হিসেবে ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে এবং একই সাথে তারা ইজতিহাদের দুয়ারকে আগলে রেখে প্রচণ্ড বাধারও সৃষ্টি করছে। আলিমদের যে গ্রুপটি আধুনিক জ্ঞানের inclusion কে গ্রহণ করে সামাজিক সংস্কারের পক্ষপাতী, বস্তুতান্ত্রিক, সমাজ বিবর্তনের বাস্তব জ্ঞানে গুণী, সোসাল সায়েন্স, সোসিওলজী এবং এনভারনমেন্টাল সায়েন্সের উপর সম্যক জ্ঞানের অধিকারী, তাদের বিরুদ্ধে ফতওয়াবাজদের বিভিন্ন প্রকার গালি গালাজ ও আক্রমণ


www.pathagar.com

চলে। এমন অবস্থায় মাত্র গুটি কয়েক বছরের সিলেবাস খতম করেই আলিম হওয়া সম্ভব না। আলিমদের মাঝে এই উপলব্ধি জাগ্রত করা প্রয়োজন।

**জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন:**

বাংলাদেশ সীমান্ত জুড়ে ভারতের বাংলাদেশী নাগরিক হত্যার যেমন শেষ হচ্ছে না; হবেও না। তেমনি ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও শেষ হবে না যতদিন ভারতে একমাত্র হিন্দু সম্প্রদায় ছাড়া আর সব সম্প্রদায় বিলুপ্ত না হবে। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের অর্থ হলো, ধর্ম নির্বিশেষে সব ধর্মের সাথে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরোধ ও সংঘর্ষ এবং দাঙ্গা করা।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা রাজনৈতিক আদর্শের মূল পরিচয়। শিখ, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও মুসলিম প্রত্যেক ধর্ম নির্বিশেষে কারো প্রতি পক্ষপাত না দেখিয়ে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের সাথেই দাঙ্গা করা ভারতের মূল রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য। আসামের সাম্প্রতিক দাঙ্গা ভারতের সে ধর্মনিরপেক্ষতার একটি নির্ভেজাল ও নিখুঁত দৃষ্টান্ত।

এমনকি গনতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক রাষ্ট্র বলে কথিত ভারত তার সাতবোন রাজ্যে যে পরিমাণ রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক নৃশংসতা চালিয়েছে তার সবগুলো তথ্য বিশ্লেষণ করলে ভারতের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীকটি মুখোশে পরিণত হয়। হায়দরাবাদ ও স্বর্ণমন্দিরে নগ্ন আগ্রাসনের ইতিহাস ভারতের গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষতার দাবির অসারতা নগ্নভাবেই উন্মোচন করেছে। এই হিংস্র চরিত্রের দাঙ্গাবাজ ভারত বাংলাদেশের প্রতিবেশী। বিনা বিচারে পাখির মত বাংলাদেশের মানুষ হত্যা করে যারা সীমান্ত উৎসব করে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের ভূমিকার নেপথ্যে রয়েছে. চিরশত্রু পাকিস্তানকে বিভক্ত করে দুর্বল করা, আর ছলে বলে কৌশলে বাংলাদেশকে পদানত করা, ইসলামী জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে পৃষ্ঠপোষকতা করেনি। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ট্রানজিট, করিডোর, টিপাইমুখ বাঁধ, নাম অজানা অসংখ্য চুক্তি নিয়ে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ভারতের কর্পোরেট ভূমিকা এক দাঙ্গাবাজের মতই। শক্তির ভাব দেখিয়ে বাংলাদেশকে পদানত করার এক দূরদর্শী পদক্ষেপ মাত্র। অচিরেই আগামী প্রজন্ম, তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

------- O -------


www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com